আজ বসন্ত

শিবানন্দ পাল

অঙ্কুর পুস্তকালয়
টি/৩১বি, কলেজ রো,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৫১, মাঘ ১৩৫৮

প্রকাশক ঃ সুব্রত দাস
অঙ্কুর পুস্তকালয়
টি/৩১বি, কলেজ রো
কোলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ সুবল সরকার

মুদ্রক ঃ গড়ের মাঠ অফ্‌সেট
২৫, গঙ্গাধরবাবু লেন,
কোলকাতা-৭০০ ০১২

উৎসর্গ

শান্তা চট্টোপাধ্যায়-কে

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

সাহারা
জননীর জন্ম
বড় মাপের মানুষ
কয়লাখনির বৃত্তান্ত
অনুপমা খাজুরাহো
পটভূমি মহীশূর
কোরা কাগজ
আমি শ্রী কবিকঙ্কন

গল্প

লিখাপড়ার লড়াই
অপরাজিতা

গল্প সঙ্কলন

জীবন যুদ্ধের গল্প
বিস্ফোরণ

কবিতা

স্বপ্ন নিয়ে

প্রবন্ধ

সাধারণের গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে
প্রসঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার



——আনন্দ না ? ময়লা আবর্জনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছিস ? কিছু কি হারিয়েছে ?

——হ্যাঁ। হারিয়েছে....না। শহরটাকে দেখছি।

——ময়লা আবর্জনার মধ্যে ? তুই কি পাগল টাগল হয়ে গেলি নাকি ? শুনেছিলাম তুই নাকি দুবাইয়ে থাকিস ? তা এখানে কবে এলি ?

——হ্যাঁ। এই দু-দিন হল এসেছি।

——এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস ?

——শহরটাকে দেখছি।

——দুবাই ঘুরে এসে বর্ধমান শহর দেখছিস ? বেড়ে বলেছিস ভাই। এই শহরে ময়লা জল বাড়ছে। কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ছে। জলাভূমি কমে যাচ্ছে। কমে যাচ্ছে খেলার মাঠ। কারণ শহর এখন বড় হচ্ছে। শহর হয়ে উঠছে ঘিঞ্জি। রাস্তা ঘাটে জমে যাচ্ছে জঞ্জালের পাহাড়। ফুটপাথ চলে যাচ্ছে হকারদের দখলে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কর্জনগেট সাজানো হয়েছে দ্যাখ। সামনে সুলভ শৌচালয় গড়া হয়েছে। ওই দ্যাখ, লোকেরা পেচ্ছাপ করছে, গড়িয়ে রাস্তায় চলে যাচ্ছে। এটা হেরিটেজ প্লেস। এই রাস্তার ওপর দিয়ে দুবেলা ডি এম, সভাধিপতি, এস ডি ও, অন্যান্য অফিসাররা যাতায়াত করছে। কেউ দ্যাখে না।

——শহরটা অনেক পাল্টে গেছে।

——এই শহরে জীবন যাপন এক যন্ত্রণা। তুই এখন কোথায় আছিস ?

——বর্ধমানে।

——সে তো দেখতেই পাচ্ছি। মানে তোর চাকরিস্থল এখন কোথায় ?

——জানি না।

——মানে ? অমন হেঁয়ালি করে কথা বলছিস কেন ?

——আপাতত দুবাই থেকে আসছি।

——তাই বল ? অনেক টাকা, সোনার বিস্কুট নিয়ে এসেছিস না ? দুবাই তো শুনেছি চোরাচালান, মাফিয়া, অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য। লোকে বলে বিশ্ব মাফিয়াদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তুই কি দেখে এলি ?

——ওই রকমই।

——হ্যাঁ রে তুইও ওদের সঙ্গে ভিড়ে ছিলিস নাকি ?

——হ্যাঁ। তা বলতে পার।

——কি বলছিস কি রে ? আমার তো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সত্যি নাকি ?

——যা বাবা ! তুমি জানতে চাইলে ? এখন বলছ সত্যি নাকি ?

——ইয়ার্কি তো বললাম।

——তাহলে এখানে যা শুনি সব সত্যি ?

——অপরাধমূলক কাজকর্ম বিশ্বের নামী দামী শহরের তুলনায় বেশি হয়না ওখানে।

——তাহলে লোকে যে বলে ?

——ভুল বলে।

——কি রকম ?

——আনন্দ ও ভোগের জন্য বিনোদনের যা কিছু বিশ্বের সব জায়গাতে পাওয়া যায়, ওখানে তার চেয়ে কম কিছু নয়। তবে তা অনেক বেশি ধনতান্ত্রিক এবং উত্তর আধুনিক। ওই শহরে দুর্নীতি প্রায় নেই বললেই চলে।

——বলিস কি রে ? দুর্নীতি মানে তো স্বর্গ রে ?

——কথাটা জেনে প্রথমে আমিও অবাক হয়েছিলাম। বিশাল বিশাল ঝাঁ চকচকে বাড়ি। তার সঙ্গে মানানসই চওড়া রাস্তা। রাস্তায় রাস্তায় সবচেয়ে নতুন মডেলের গাড়ি। প্রচুর ফ্লাইওভার, শপিংমল, যার কোনোটার সাথেই আমাদের দেশের কোনো শহরের মিল নেই। ওখানকার বাড়ি ঘর সব সেন্ট্রাল এসি সিসটেমের। দরজা জানলার পর্দা এত উঁচু যে ওঠা নামা করানোর জন্য রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করতে হয়। দোকান বাড়ির বিস্তৃতি এবং উচ্চতা এত বিশাল যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলে ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়।

——চাষবাস কি হয় ওখানে ?

——ফুঃ। ওখানকার মানুষ চাষ বলতে ঠিক কি বোঝায় তাই জানে না। ওখানে শহর বা তার আশে পাশে কোথাও চাষ সংক্রান্ত কোনো কাজ হয় না। আছে মস্ত মস্ত কারখানা।

——শুধু কারখানা ?

——কারখানা মানে তেলের কূপ। আর আছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। বড় বড় নানান ডিজাইনের বানিজ্যকেন্দ্রআছে সেগুলোকে দেখে কারখানা ভেবে ভ্রম

হতে পারে। নতুন করে কোথাও শহর ভাঙ্গা হচ্ছে। কোথাও তৈরি হচ্ছে। আছে বাড়ি তৈরির কারখানা। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। ভারী ভারী যন্ত্রপাতি, পে-লোডার রাতদিন কাজ করছে। সবাই কাজ করছে একেবারে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ওখানে ফ্লাইওভার ছাড়া রাস্তা ভাবাই যায় না। ফ্লাইওভার ছাড়া শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাওয়াও যায় না। ফ্লাইওভারই ওখানকার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। ভাবতে পারেন ১৫৬ তলা বাড়ি তৈরি করেছে ওরা! পৃথিবীর সর্বোচ্চ ইমারত। আরও উপরে উঠবে। ভবিষ্যতে ইচ্ছা হলে তাকে আরও উপরে তোলার ফাউন্ডেশন থাকবে। পৃথিবীর, দীর্ঘতম ও শ্রেষ্ঠ এই ইমারত এর নাম 'বুর্জ এল দুবাই'। পরিবারের সকলকে নিয়ে ঘোরা যায় দুবাইয়ের মলগুলোয়। মল অব এমিরেটাস দুবাইয়ে বিশাল সপিং প্লাজা। তার ভেতরে আল্পসের অনুকরনে একটা স্কিইং স্লোপ আছে। এক্কেবারে আসল বরফ। বিদ্যুৎ খরচা করে তৈরি। প্রতি বছর এপ্রিল মাস নাগাদ দুবাই সপিং ফেস্টিভ্যাল হয়। সারা পৃথিবীর মানুষ উপচে পড়ে দুবাইয়ে। তবে ওরা অতি মাত্রায় পরিবেশ সচেতন।

——রীতিমতো ময়দানবের কর্মযজ্ঞ চলছে বল।

——কর্মকাণ্ড বলতে বিশাল কর্মকাণ্ড। সারা পৃথিবীর মধ্যে দ্রুততম সম্প্রসারণ হচ্ছে যে শহরের তার নাম দুবাই। ১৯১৫ সালে এ শহরে ১৩ হাজারের বেশি হোটেলের কক্ষ ছিল না। এসেছিলেন সাড়ে সতেরো লক্ষ পর্যটক। ১৯১৫ সালে পর্যটকের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে চুয়ান্ন লক্ষেরও বেশি। হোটেলের ঘর বেড়েছে তিন গুন। ওরা হিসেব করে দেখেছে ১৯১৫ সালে দুবাইয়ে এক কোটি পর্যটক আসবেন। দুবাইয়ের জনসংখ্যা কিন্তু মাত্র ১৫ লাখ। দুবাই শহরের তিনটে ভাগ ভেইরা, বড় দুবাই আর জুমাইরা। রাস্তা তৈরি করে সমুদ্রের কয়েক কিলোমিটার গভীরে ঢুকে গিয়ে জলের ওপরে ওরা শহর তৈরি করছে। জলের মধ্যে পাথর, বালি ফেলে জমি তৈরি করছে। সেই জমির ওপরে কংক্রিট গেঁথে মরুদ্যানের মতো সবুজ উপনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে। তার নাম দিয়েছে 'পাম নগরী'। পরিকল্পনা করা হয়েছে এমনভাবে যেন চাঁদ থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

——তুই তো রূপকথার গল্প শোনাচ্ছিস মনে হচ্ছে। আমাদের এখানে এসব ভাবাই যায় না।

——ঠিক ভাবা যায় না। ওরা করে দেখাচ্ছে। ওরা ভাবতে পারে। এই

ভাবনার জন্য হিম্মত দরকার হয়। মহাকাশ থেকে উপগ্রহ মারফত ওই কর্মকাণ্ডের ছবি তুলে খতিয়ে দেখা হয় কাজের অগ্রগতি। ভাবতে পারিস ? ওই ছবি অ্যানালিসিস করে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা হচ্ছে। মহাকাশ থেকে টোটাল পরিকল্পনা দেখে মনে হবে যেন সত্যি একটা খেজুর গাছ জলের মধ্যে শুয়ে আছে। চীনের বিখ্যাত প্রাচীর যেমন চাঁদ থেকে খালি চোখে ধরা পড়ে তেমনি এখানকার শেখরা দাবি করছে তাদের এই স্বপ্ন নগরী চাঁদ থেকে খালি চোখেই দেখা যাবে। ওখানকরা টিভিতে রাতদিন কেবলই এইসব খবর উন্নয়ণের কথা প্রচার করছে।

——ওখানে তৃণমূল নেই ? খেজুরী, নন্দীগ্রাম নেই ? সিঙ্গুর নেই ?

——না নেই। হাসালে ! ওখানে এসব থাকার কোন অবকাশ নেই।

——ওদের অনেক টাকা। আমাদের গরিব দেশ।

——ওরাও একদিন গরিব ছিল। ওদের দেশে কেউ যেত না। খাদ্যের সন্ধানে ওই দেশের মানুষ চলে আসতো এই সোনার দেশ ভারতের বঙ্গাল মুলূকে। ওরাই অর্থ পরমার্থ উভয়ের সন্ধানে এদেশের অন্বেষণ পাড়ি জমাত। আমাদের পীরবাহারাম ওদেশেরই মানুষ। তিনি পরমার্থের সন্ধানে এখানে এসেছিলেন। সন্ধান পেয়ে আর ফেরেন নি। শুয়ে আছেন বর্ধমানের মাটিতে। তেলের জন্য আজ ওরা মনে করে গোটা দুনিয়াটাকে কিনে নেবে। আজ ওরা লন্ডন নিউইয়র্ক ছাড়া অন্য দুনিয়ার সাত-পাঁচ ঝামেলার কোন খবর রাখার প্রয়োজন মনে করে না। জানবার কোনো আগ্রহ নেই। হাতের কাছে ইরাকে যুদ্ধ চলছে, সাদ্দামের ফাঁসী হয়ে গেল ওরা কিন্তু নির্বিকার। কাগজে খবর সেভাবেই প্রকাশ হচ্ছে। আমরা এখানে মাঠে ঘাটে ফাটাফাটি করি। ওদের এসব না জানলেও চলে যায়।

——সংযুক্ত আরব আমিরসাহী। দুবাই আর আবুধাবির কথাই জানতাম। শারজার কথা জেনেছি কয়েক বছর আগে ক্রিকেট খেলার জন্য।

——হ্যাঁ। দুবাই এখন আন্তর্জাতিক টেনিসের আসর বসাচ্ছে। আমাদের সানিয়া মির্জা'ও ম্যাচ খেলে এসেছে। সানিয়াকে নিয়ে ওখানেও ক্রেজ আছে। সেটা যে ওর শরীরীভাষার জন্য তা টের পাওয়া যায়।

——ওখানে গরিব লোক দেখতে পেলি নাকি ?

——গরিব লোক ? ওদের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজসাধ্য নয়। আমাদের দেশে যেটা খুব স্বাভাবিক, কোনো জায়গায় মজুরি বাড়লে,

চাকচিক্য বাড়লে, নতুন নতুন বাড়িঘর রাস্তাঘাট তৈরি হলে কাজের প্রয়োজনে আশেপাশের যত গরিব মানুষ এসে ভিড় করে। তারা কাজ চায়, কাজ পায়ও।

——হ্যাঁ। আমাদের এখানে যেমন নয়ডাতে হয়েছে, ওদিকে নবী মুম্বাইয়ে। তারপর ধর বেঙ্গালুরু, চেন্নাই তো আছেই। ওখানে সেরকম কিছু নেই ?

——ওখানে শেখরা সকলেই বিত্তশালী। বাকিরা সকলে আশ্রিত, এসেছে কাজের প্রয়োজনে। ওখানে গরিব মানুষ থাকলে তারা কোথায় আছে কেউ জানে না। আদৌ আছে কিনা তাও জানি না। গ্রাম থেকে দলে দলে লোক কাজের খোঁজে শহরে আসছে এমন প্রবণতা ওখানে দেখার সুযোগ নেই। ওই দেশ, ওখানকার শহর, ওখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থা, আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মতো নয়। একেবারেই আলাদা।

——এখন মাস খানেক থাকবি নিশ্চয় ?

——আছি।

——যাক বাবা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছিস দেখলেও ভাল লাগে।

——দেশে ফিরে এলাম মাটির টানে কিনা বলতে পারব না। জীবনটাকে খুব বড় করে উপভোগ করবার ইচ্ছে ছিল, পূর্ণ হল না।

——মানে ?

——কিছু না। দেশে ফিরলাম। প্লেনটা যখন দেশের মাটিতে দাঁড়াল, মনে হল দেশে ফেরার আনন্দটাই আলাদা। আলাদা একটা চার্ম আছে। এখানকার জল, মাটি, গাছপালার জন্য মনটা যেন কাঁদছিল। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কথা একশ শতাংশ ঠিক। আমাদের লিমিটেশন আমরা বাঙালি। বিদেশের মাটিতে থেকেও আমি আধুনিক মানুষ হতে পারিনি। খাওয়া পরা থাকার নিশ্চয়তাটুকুই তো জীবনের সব নয়।

——একদিন বাড়ি আয় ?

——যাব। এখন তো আমার অফুরন্ত সময়। বাড়িতে সবাই ভাল আছে তো ?

——ওই চলে যাচ্ছে একরকম।

রবিদা চলে গেল। লাইট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রবিদা। বাইরে কাজ করার প্রচুর সুযোগ ছিল। বাড়ির গণ্ডির বাইরে না যেতে পারার জন্য বেকারই থাকতে হল। বিরাট যৌথ পরিবার ওদের। এখন শুধু বাড়ি ভাড়া আর চাষ

সম্বল। দেশে ফেরার পর পরিচিতজনদের মধ্যে রবিদার সঙ্গেই প্রথম দেখা হল।

রবিদা বয়সে প্রায় দশ বারো বছরের বড়। দাদা বলে বটে। তবে আলোচনা, কথাবার্তা সব চলে বন্ধুর মতো।

ভদ্রভাবে জীবনটাকে উপভোগ করতে চেয়েছিল আনন্দ। হঠাৎ যোগাযোগ হওয়ায় চলে গিয়েছিল দুবাই। ল-গ্রাজুয়েট ও, কিন্তু কাজ করছিল হোটেলে। মন বসল না। ফিরে এল। দুবাইয়ে চাকরি ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে দেশে ফিরতে হয়েছে। এমন নয় যে ওগো আর তো আসা যাবে না সুতরাং আরো দুটো দিন থেকে যাই, দেশটাকে দেখে যাই। উঁ হুঁ! আন্তর্জাতিক ভিসা আইন অত্যন্ত কড়া। ও একজন কাজের লোক হিসাবে ওদেশে গিয়েছিল। যতক্ষণ কর্মী হিসাবে ছিল, ওরা ওর খাতির যত্ন করেছে। যেই কাজ ছেড়ে দিয়েছে অর্থাৎ আর কর্মী নয়, আবার ট্যুরিস্টও নয় ও। সুতরাং অহেতুক ওকে ওরা থাকতে দেবে না। ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরতে হয়েছে।

দেশে ফেরার পর চার পাঁচটা দিন আনন্দ শুধু ঘরে বসে বসে টিভি দেখল। টিভি দেখে একটা লাভ হল। এদেশের হালচাল সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে উঠল। আনন্দ প্রথমে ফিরে আসতে বাড়ির লোকেরা খুব খুশি হয়েছিল। ও যে কোনো শেখের বিটিকে নিকে করে দেশে নিয়ে আসেনি, সেটা ওর সাতপুরুষের পুণ্যফল বলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করল সকলে। তারপর যখন সবাই জেনে গেল যে ও আর কোনোদিন সেদেশে যাবে না। দেখল বাড়ির খুশীর হাওয়া ধীরে ধীরে ফিকে হতে শুরু করেছে।

বোঝা গেল একজন বেকারকে ঘাড়ে বসিয়ে কেউ শুধু শুধু খাতির যত্ন করে না। শেখের দেশে যে কাজ ও করত সেই অভিজ্ঞতায় এখানে ওকে কে কাজ দেবে? হাতে কিছু টাকা আছে। এর মধ্যেই কিছু একটা যোগাড় করে ফেলতে হবে। বসে বসে খেলে রাজার ধনও একদিন ফুরিয়ে যায়। বাড়ির এই আবহাওয়ায় বোরড হল। কথায় বলে, যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে। শুধু বসে না থেকে তাই যা থাকে কপালে, ছেঁড়া কাঁথা বগলে করে আনন্দ একদিন পথে বেরিয়ে পড়ল।

এতদিন যা ভেবেছে, যা করেছে তাতে ঠকেনি। সব সময় বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে অঙ্ক কষেছে। তারজন্য অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে ওকে। গায়ে দাগ পড়তে দেয় নি। সমাজে একটা দাগ কাটতে চেয়েছে। শহরের পুরনো রাস্তাগুলো ঘুরে বেড়ায় আর আনন্দ এইসব ভাবে। এটা একটা নস্টালজিয়া বলা

যেতে পারে। একদিন যেখানে যেখানে আড্ডা ছিল, সেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। যাদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল, তাদের খুঁজে বেড়ায়। নস্টালজিয়া ওর ঘাড়ে আরো চেপে বসে।

বহুদিন আগে ছেড়ে আসা কলেজটা দূর থেকে দেখে। শ্যাম সায়রের পূব পাড়ে ঈশানেশ্বর শিব মন্দিরের চাতালে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেখান থেকে দেখে। হাসপাতালে রুগী আসছে, আবার কেউ এ জীবনের মায়া কাটিয়েছে, তাকে চৌদোলায় কাঁধে নিয়ে প্রিয়জনেরা হরিবোল দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। মস্ত বড় পুকুর, ঘাটে ঘাটে স্নান করছে কত মানুষজন। দেখে দলে দলে ছেলে মেয়েরা কলেজে ঢুকছে বেরুচ্ছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব কত চৌকস। এক সময়ে আনন্দ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, কলেজের দিকে এগিয়ে আসে। কলেজ বাড়িটা যেন ওকে ডাকে। ও কলেজের ভিতরে ঢুকে যায়। নিশির ডাকের মতো কলেজটা ওকে টানে।

এই কলেজে ও একদিন পড়েছে। দেখে কলেজ বাড়িটার চেহারা মোটামুটি সেই রকমই আছে। পাশে আরো কটা বিল্ডিং হয়েছে। পুরনো বিল্ডিংয়ের কয়েক জায়গায় বয়েস ধরা পড়েছে। রং চটেছে, দেওয়াল ফেটেছে। পলেস্তারা খসে পড়েছে কোথাও কোথাও। ভিতরের দেওয়াল পরে চুনকাম করা হয়েছে কিন্তু বাইরের দেওয়াল আগের মতো নোনা ধরা।

ওদিকে পুকুর পাড়ের হস্টেলটা তেমনই আছে। পাশে বিশাল একটা বিল্ডিং হয়েছে। কলেজে নতুন নতুন ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব বাড়ি উঠেছে। হস্টেলের দোতলার কোণের ঘরটাকে দেখে তেমনিই আছে। ওই ঘরটার একটা গল্প আছে।

কালো শ্যাওলা ধরা দেওয়াল। দেওয়ালগুলো যেন কথা বলতে চায়। দোতলার কোণের ঘরে ওরা সাধুচরণকে পিটিয়েছিল। সাধুচরণ চাঁদনি রেস্টুরেন্টের মালিক সুশান্ত ঘোষকে মার্ডার করে দেবে বলে শাসিয়ে ছিল। ওর কথা শুনে ওরা খুব হেসেছিল। এমনিতে সাধু ছিল খুব ভীতু স্বভাবের ছেলে, সুশান্তবাবুর মেয়ের সঙ্গে সাধু প্রেম করবার চেষ্টা করছিল। সুশান্তবাবু সাধুকে রাস্তার মধ্যে একটি চড় মেরে কড়কে দিয়েছিল। ও তার উত্তরে বলেছিল, যদি এক বাপের ব্যাটা হই তো তোমার চাঁদনি-র নাম নিশানা আমি চটকে দেব। কিন্তু সাধু নিজেই ছিটকে গিয়েছিল।

আনন্দ-দের সঙ্গে তর্কাতর্কির সময় কে ওর মাথায় হঠাৎ লাঠি মেরেছিল।

মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছিল। গোটা চারেক সেলাই দিতে হয়েছিল। চেঁচামেচি হাত চালাচালির মধ্যে আনন্দ ওদের থামাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সেই সময় একটা ঘুঁষি আনন্দ-র ডান চোখের নিচে লেগেছিল। চোখে তখন অন্ধকার দেখেছিল আনন্দ। মিনিট দশেকের কাণ্ডে পুলিশি হুজজোত এড়াতে সাধুচরণকে চাংদোলা করে পাঁচিলের ওপাশে নার্স কোয়ার্টারের দিকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

সাধুচরণ নকশাল করতো। সকলে জানত ওর কাছে একটা চেম্বার থাকে। সেটা আবার মাঝে মাঝে ভাড়ায় খাটতো। একদিন ওটা আলোক গেঁড়িয়ে দিয়েছিল। ফ্যাসফ্যাসে গলায় সাধু ওকে তখন কিছু বলেছিল। আলোক বলেছিল, শালা বো.....। বেশি কিছু বলবি তো তোকেই স্পট করে দেব। সময়টা ছিল দূরন্ত। কলেজ তো কলেজ ছিল না, ছিল যেন কুরুক্ষেত্র।

কলেজের নাইট গার্ড সাধুচরণকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করেছিল। বর্ধমান হাসপাতালের স্টাফেরা কলেজের ছাত্রদের স্পেশাল কেয়ার নিত। সাধুচরণ তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

মলিন এইসব ছবিগুলো আনন্দ-র মনের মধ্যে জেগে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ। দেখল আগে হস্টেলের পিছন দিকটা জঙ্গলের মতো ছিল। এখন হয়েছে লোকালয়, একটা পাড়া গজিয়ে উঠেছে। সাধুচরণ এখন কোথায়, কেমন আছে, কি করে ও জানে না। কলেজের সামনে পাম্ গাছগুলো তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামসায়রটাকে মোটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ভিতরে ফুলের গাছ লাগিয়ে বাগান করা হয়েছে। প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টারের পাশের লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ের দিকে আরো একটা বিল্ডিং উঠেছে। হাসপাতালের দিকে কমার্স বিল্ডিং অনেক বড় হয়েছে। অনেক নতুন নতুন বিভাগ নিয়ে কলেজের কলেবর বেড়ে গেছে। বেড়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা।

এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন অবন্তী সান্যাল, হরশঙ্কর ভট্টাচার্য। হরশঙ্করবাবু বিধায়ক হয়ে পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন। এখনকার মেয়েদের মধ্যে শাড়ি ব্লাউজের চলন কমে গেছে। তখন এত সালোয়ার কামিজ দেখে নি। ছেলেরাও দেখছে প্যান্টের সঙ্গে গেঞ্জি পড়ে কলেজে এসেছে। গেঞ্জি গায়ে কলেজে আসা ওরা ভাবতেই পারত না। ধুতির ব্যবহার ওদের সময় বেশ ভালই ছিল। অবশ্য পাজামা পাঞ্জাবীর চলন ছিল বেশি। এখন যা ওর চোখে পড়ল না।

আনন্দ দেখল এখনকার অধ্যাপকদের আলাদা করে চেনাই মুশকিল।

সকলেরই প্যান্ট শার্ট। আর এত কম বয়স যে ছাত্রদের থেকে আলাদা করাই যায় না। নতুন প্রিন্সিপ্যালকেও দেখল প্যান্ট শার্টে। অনেক কম বয়েস। এই বয়সের প্রিন্সিপ্যাল ওরা দেখেনি। নোট নেবার জন্য মোটা একটা বাঁধানো খাতা নিয়ে ওরা কলেজে যেত। ছাত্রীদের আপনি বলতে হতো। কারো সঙ্গে কোনো অ্যাফায়ার তৈরি হলে তবে 'তুই' বা 'তুমি' দিয়ে শুরু হতো। নইলে ওরা সকলেই কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হলে 'আপনি' বলত।

কলেজে ছাত্র সংসদের কোনো অস্তিত্ব না থাকলেও ছাত্রদের মধ্যে বাম রাজনীতির সুর খুব চড়া সুরেই বাঁধা ছিল। পুঁজিতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সোভিয়েত ছিল বিকল্পহীন, ওদিকে মাওয়ের নেতৃত্বে চীন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। আর তাই নিয়ে চলছিল কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে চাপান উতোর। শেষ পর্যন্ত নকশাল আন্দোলনের জন্ম হল। দুনিয়া কাঁপানো দশটা দিনের মতো শুরু হয়ে গেল মুক্তির দশকের হাতছানি। আর এদিকে বাংলা দেশের জন্ম দিয়ে এশিয়ার মুক্তি সূর্য হাসতে শুরু করলেন তখন। তাঁর হাসিতে ঝরে পড়ল এমার্জেন্সীর সুর। অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারী হল দেশে। 'দেশকে গঠন করতে সাহায্য কর, নয় নির্বিকল্প সমাধি নাও' ইত্যাদি ইত্যাদি কোটেশনে ভরে গেল দেশ।

'ইয়ে রেডিও পিকিং হ্যায়'—প্রতি সন্ধ্যায় তখন একটা আলাদা আকর্ষণ। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ভয়ংকরের কেন্দ্রভূমি। সময় বড় অস্থির, বড় অস্থির সেই সময়। বোলপুর লাভপুর কীর্ণাহার উত্তরবঙ্গ একে একে মুক্তাঞ্চল হচ্ছে। বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে উঠছে। সারি সারি উদ্বাস্তুর মিছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় আর ত্রিপুরায় ঢুকছে প্রতিদিন। এমন হল ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছাপিয়ে গেল আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা। এক শনিবার স্পেশাল বিনাকা গীতমালার দিন বর্ধমান সিনেমায় রাজেন্দ্রকুমারের 'গোরা আউর কালা' দেখে বাইরে বেরিয়ে এসেছে আনন্দ, দেখে শহর থমথম করছে। শুনল থানার কাছেই কে একজন মার্ডার হয়েছে। কালো চৌধুরী না কি যেন নাম। থানার এত কাছে? অবিশ্বাস্য! বাড়ি ফিরবে এবার কোন পথে? সিনেমা হলের পিছনে গলি, গলির মধ্যে অন্ধ গলি, তস্য গলি দিয়ে বহিলা পাড়া হয়ে ঘুরে বাড়ি ফিরল। দু চারটে লোক আচমকা সামনে পড়ে ভয়ে যে যেদিকে পারল সটকে পড়ল। মধু পণ্ডিত এরা সব তখন শহরের সেরা মস্তান। ওদের কাছে আর্মস থাকে, ছুরি থাকে। দুমদাম চালিয়েও দেয় যেখানে সেখানে যখন তখন।

এমনি একদিন মধু ভ্রমরের পেটে ছুরি চালিয়ে দিল। দুজনে ছিল জিগরী দোস্ত, অথচ কি যে হল ?

ভ্রমরের কাছেও আমর্স ছিল। দুম করে চালিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু ব্যাটার কপাল এমনিই খারাপ যে মালটা ফেটে গেল নিজেরই হাতে। হাতটাও গেল আবার পেটে মধুর ছুরিটাও বিঁধল। জীবনে এক টিপে একটা টিউব লাইট ভাঙ্গতে পারে নি যে কোনো দিন। সে চালাতো ছড়রা। বিকাশ ওই সন্ধ্যায় বংশীর দোকানে বসে ছিল। ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়েছিল। ও আবার রাতে ভাল দেখতে পেত না, রাতকানা ছিল। শহরের সব আলো তখন নিভে গিয়েছিল। মলয় ঘরে বসে বিনাকা গীতমালার গান শুনছিল।

অন্ধকারে রাস্তার ড্রেনে পড়েছিল বিকাশ। কাঁচে তার পা কাটে। প্রচুর রক্ত বের হয়। বংশীর কাছ থেকে রবিদা খবর পেয়ে ডাক্তারখানায় এসেছিল। অলোক চোলাই মেরে গ্যাঁট হয়ে পড়ে ছিল গ্যাঁজারে শিবের আড্ডায়। গ্যাঁজারে শিব তখন সবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাদামতলার মোড়ে তার রমরমা দিনদিন বাড়ছিল। বাবা বর্ধমানেশ্বরের আবির্ভাব ঘটলেও, তিনি তখনও কুলীন হন নি।

টাউন হলের বেঞ্চে বসে স্কুল বাড়িটাকে দেখে আনন্দ। স্কুলজীবনটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দময়। টাউন স্কুল শহরের সেরা স্কুল। কি পড়াশুনাতে, কি খেলাধুলাতে। ফুটবল ছাড়াও এনসিসি'তে নাম ছিল। স্কাউট, সাঁতার, ভলিবল, বাস্কেটবলের আলাদা আলাদা। কোচিং হতো এই স্কুলে। আনন্দ এই স্কুলে পড়ত। বিরাট এলাকা নিয়ে এই স্কুল। ফুটবল মাঠ, সাঁতার কাটার পুকুর; টেকনিক্যাল ওয়ার্কশপ এত বড় স্কুল প্রাঙ্গন শহরে আর কোনো স্কুলের নেই। এই স্কুলে শুধু মা সরস্বতী নয়, বাবা বিশ্বকর্মারও আরাধনা হতো। একটা ভাল লাইব্রেরী ছিল। সারি সারি আলমারি ভরতি নানান ধরণের বই থাকতো। ওরা পড়ত।

অজিত স্যার ওদের বই নির্দিষ্ট করে দিতেন। একে একে নামগুলো উচ্চারণ করে যেতেন—সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর, অবন ঠাকুর, ঠাকুমার ঝুলি, নালক, ক্ষীরের পুতুল, স্বপনবুড়ো ইত্যাদি। ওরা এসব গো-গ্রাসে গিলত। আবার পড়া বই ফেরত দেবার আগে নিজেদের মধ্যে অদলবদল করে পড়ে নিত। কারণ নির্দিষ্ট দিন ছাড়া লাইব্রেরির বই পাল্টানো যেতো না। যত উপরের দিকে উঠেছে বড়দের বই পড়ার নেশা ওদের মাথায় ঢুকেছে। শরৎ, বঙ্কিম পড়তে পড়তে ওরা অ্যাডাল্ট হয়েছে।

রবিদার উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি। ছুটির দিনে সবাই মিলে অমরেশবাবুর বাড়িতে পড়তে যেত। উনি ফিজিক্স পড়াতেন। তবু ওদের পাঠ্য তালিকার বাইরের বই পড়তে উৎসাহ দিতেন। মাঝে মাঝে নিজেই কিছু কিছু বই যোগাড় করে দিতেন ওদের পড়বার জন্য। একবার জানাজানি হয়ে গেল যে ওরা নবোকভের নোলিটা পড়েছে। কি করে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যেন। আনন্দ একটু ভয় পেয়েছিল, কী জানি অমরেশ স্যার আর যদি পড়াতে না চান ! যদি বলেন, কাল থেকে আর তোদের আসতে হবে না। তোরা তো এখন বড় হয়ে গেছিস, বাড়ি যা।

না। অমরেশবাবু ওদের শাস্তি দেন নি।

বলেছিলেন, অনুবাদ পড়লে ক্ষতি নেই। তবে আসল বইটা তোদের পড়ে নেওয়া উচিত। এই আসকারায় সব চাইতে বেশি উৎসাহিত হয়েছিল আনন্দ। এইভাবে কত বই যে পড়েছে তার আর হিসাব রাখা হয় নি। বই আনন্দ-র বড় বন্ধু।

ইলেভেন প্রথম সিগারেট খেয়েছিল। লাউয়ের শুকনো ডাঁটায় বিড়ি টেনেছিল স্কুলে। কেশেছে খুব। এই সব কথা মনে পড়ছে আর মনে মনে হাসছে আনন্দ। মনে পড়ল, স্কুল পালিয়ে যেদিন ডক্টর জিভাগো দেখতে গিয়েছিল সেই দিনটা। ওমা ! বিশাল ছবি। শেষই হয় না, শেষই হয় না। তিনবার হাফ টাইম হল। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে বইটা না চালানোর জন্য পোস্টারিং হয়েছিল। সেই জন্যই দেখতে গিয়েছিল ওরা। নিষিদ্ধ যা কিছু তাতেই তো আকর্ষণবেশি থাকে। দেখতে গিয়ে সে এক বিপদ। ছবি আর শেষ হচ্ছে না। ছবি শেষ না হলে বাড়ি যেতেও পারছে না। এদিকে সন্ধ্যের পড়া কামাই হবে। শেষে বাড়ি ফিরে মিথ্যে কথা বলতে হল। সন্ধ্যার পর বাড়ি ঢোকায় আনন্দ-র বাবা ওকে আবাসিক স্কুলে ভর্তি করে দেবার হুমকি দিলেন। যেন ওই সব জায়গাতেই ভাল পড়াশোনা হয়। বলেও দিলেন, ওখানে গিয়ে দু চার ঘা বেতের বাড়ি খেলে আনন্দ ঠিক সিধে হয়ে যাবে।

রবিদা সব কথা শুনে বলেছিল, বাড়িতে বেশি এডুকেশন হলে এরকমই হয়।



দুপুরে খেয়েদেয়ে লম্বা ঘুম দিল আনন্দ। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে গড়াচ্ছে

তখনও ঘুমোচ্ছে। সনাতন এসে ডাকল। বলল, দাদা রবিদা এসেছিল, তোমায় ডাকছিল।

চোখে মুখে জল দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখল বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে মাটির সোঁদা গন্ধ আর ঝিঁঝিঁ-র ডাক ওপরে উঠে আসছে। মাথার ওপরে একটা বিচিত্র শব্দ হতেই ওপরে তাকাল। দেখতে পেল, জানলার ওপরে বসে আছে ছোট্ট একটা পাখি। পাখিটাকে চিনতে পারল না, বৃষ্টিতে ভিজেছে। ডানা ঝাপটিয়ে পাখার জল ঝাড়ছে।

গায়ে পাঞ্জাবী চড়িয়ে বের হল। রবিদার বাড়ি যাবে। বাড়ি থেকে বের হচ্ছে দরজার বাইরে আসবার সময় মার আদুরে গলা শুনতে পেল, দেরি করিস না খোকা।

হাসল আনন্দ। মা'র কাছে ও যেন সেই শিশুটিই রয়ে গেল। খোকা!

রবিদার বাড়িতে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই পরিচিত গলার আওয়াজ পেল, দেখ দেখ। কে এসেছে?

মমতা ছুটে এসে জানতে চাইল, কবে এসেছেন?

আনন্দ উত্তর দিল, এক সপ্তাহ হল।

——এক সপ্তাহ? মমতা অবাক হল খুব।

——হ্যাঁ।

——ও। আর কে এসেছে? মমতা খুব ধীর ভাবে জানতে চাইল আনন্দ-র কাছে।

আনন্দ অবাক হল। বলল, মানে? আবার কে আসবে?

মমতা বলল, কেন বৌদি?

আনন্দ দেখল রবিদার সঙ্গে অন্যরাও উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে তার উত্তরের অপেক্ষায়। ওরা সবাই শুনতে চাইছে আনন্দ-র জীবনের গত কয়েক-বছরের যাবতীয় টাটকা গোপন খবরগুলো। ও বিয়ে করেছে কিনা? করলে বউ কেমন দেখতে?

কিন্তু আনন্দ কি বলবে ওদের?

মনে মনে ভাবছিল আনন্দ। আশ্চর্য! মাত্র আট বছর বিদেশে থেকে ও ওদের চোখে কত আলাদা হয়ে গেছে!

কী করে বোঝাবে ওদের? ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দ মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে তোলে। গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর আনার চেষ্টা করে। বলে,

না। কেউ আসে নি আমার সঙ্গে। আমি এখনো বিয়ে করি নি।

কিন্তু ওর নিজের কানেই কথাগুলো কেমন বেসুরো শোনায়। তাই আরো একবার স্বাভাবিক গলায় বলবার চেষ্টা করে, আমি একাই এসেছি। আমার সাথে আর কেউ আসে নি। কী এবার বিশ্বাস হল তো? কিন্তু এবারও ওর কণ্ঠস্বর কানে বেসুরো বাজল।

এরপর কথাবার্তাগুলো তিনশো ষাট ডিগ্রী ঘুরে গেল। এই ক-বছরে কে কে মারা গেছে। কে কোন রোগে ভুগেছে। কার কটা স্ট্রোক হয়েছে। এই সব জল্পনা কল্পনার মধ্যেই মৃতবন্ধুদের স্মৃতিচারণ শুরু হয়ে গেল। তারপর আবার প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হল। জীবিতরা কে বেশি সফল হয়েছে, কে কম, কে বেশি সুখী? এসব প্রসঙ্গগুলোও এল। শেষে আলোচনার সারবস্তু হল——বাঙ্গালুরু ভাল, হায়দরাবাদ ভাল, বাংলা একেবারে রসাতলে গেছে। বাংলার ভবিষ্যত অন্ধকার।

আনন্দ-র কেবলই মনে হয় এধরণের আলোচনায় ফালতু সময় নষ্ট হয়। এসময়টায় কোনো ক্রিয়েটিভ কাজ হয় না। অথচ এসময়টা ভাল কাজে ভাল চিন্তায় ব্যয় করা যেত। বাঙালিরা আড্ডা বাজ, আড্ডা মেরে মেরে সময় নষ্ট করে। এই আড্ডা ছোটদের মাথাগুলো চিবিয়ে খাচ্ছে। ওদের মধ্যে নিজেদের কূপমণ্ডুক ধারণাগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বাংলায় মার্কিশ পুঁজির ওকালতি করছে। ওদের সামনে লালসার অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। শুরু সেই বাহাত্তর সাল থেকে। বাংলার যৌবনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দাও, তারা যেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। নিজেরাও ছুটেছে, এখন জুনিয়ারদের সেই ভাবনায় ছোটাতে চাইছে।

বোঝাতে চাইছে, ওরা যেন সমাজ পরিবর্তনের জন্য সর্বস্ব পণ না করে। ওরা যা করবে তা যেন নিজেদের লাভের কথা মাথায় রেখে করে। এখন জীবনটা ভোগের, সেক্সুয়াল প্লেজারের, ইন্দ্রিয় সুখ ছাড়া সুখম নাস্তি।

সব দেখে শুনে আনন্দ-র কান্না পায়। কিন্তু কাঁদতে পারে না, চুপি চুপি কান্না বয়ে বেড়ায়। ওর দুঃখ, যৌবনকে বাক্সবন্দী করার এই অভিযানকে কেউ চিনতে পারে না। আইডেনটিফাই করতে পারে না। সবাই ভেসে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে——গড্ডালিকা স্রোতে। এরা বাংলার বাইরে যায় না। এরা শুধু খবরের কাগজের হেডলাইনের মধ্যে নিজেরা মগ্ন থাকে।

ওদের আড্ডার মাঝে ঘরের এক কোণায় আনন্দ দেখে রবিদার ছোট্ট মেয়ে হাতে রিমোট নিয়ে টিভি দেখছে। পটাপট চ্যানেল পাল্টাচ্ছে। একবার ন্যাশনাল

জিওগ্রাফীতে হাঙরদের অনুষ্ঠান দেখছে তো, পরক্ষণেই চলে যাচ্ছে কার্টুন চ্যানেল। তার পাশে মেসোমশাই আগের মতো চুপ করে বসে আছেন। মেশোমশাইও এক মনে দেখছেন ছোট্ট ওই মেয়ের টিভি চ্যানেল সার্ফিং। এদিকে এত হৈ হুল্লোড় আর ওরা এক মনে ছবি দেখে যাচ্ছে। ওইটুকু মেয়ে এখন থেকেই বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছে। আনন্দ একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে মেশোমশাইয়ের পাশে গিয়ে বসল। ওর মনে হল মেসোমশাই যেন ওকে দেখেও দেখলেন না।

মেশোমশাই কোন কথা বললেন না। আনন্দ-র মনে হল বয়স্ক মানুষটার বুঝি, অভিমান হয়েছে। তাই আস্তে আস্তে বলল, মেশোমশাই, চিনতে পারছেন আমাকে ? তারপর প্রণাম করল।

——কে ? বলে মেসোমশাই আশীর্বাদ করলেন। বললেন, চিনতে পারব না কেন বাবা ? তুমি তো এখন মস্ত মানুষ।

তারপর একটু থেমে বললেন, আমি যখন খুব অসুস্থ ছিলাম, তখন কি তুমি দেখতে এসেছিলে ?

——না মেসোমশাই। আমি বেশ কিছুদিন দেশের বাইরে ছিলাম। কয়েকদিন হল এসেছি। আনন্দ উত্তর দিল।

——আরে বাবা, আমি বুঝি ! তোমরা হলে ব্যস্ত মানুষ। তোমাদের হাতে সময় কোথায় ? অবশ্য না এসে ভালই করেছ। আমি তখন কাউকেই চিনতে পারতাম না। দেখ আমরা পুরনো হয়ে গেছি। তা বলে বাতিল করে দেবে তোমরা ? আমাদের কি এই সংসারে কোনও প্রয়োজন নেই ?

মেসোমশাই আনন্দ-র হাত ধরলেন। ওর হাতে চাপ দিলেন। যেন মস্করা করলেন, এইভাবে বললেন কথাগুলো।

আনন্দ বুঝল একটা বাজে সময় পার করে এসেছেন উনি। ভেতরে ভেতরে একটা অভিমান জমা হয়ে আছে। কানেও কিছুটা কম শুনছেন। আনন্দ-র কথায় বুঝি কিছুটা অভিমান গলে জল হল।

মেসোমশাইয়ের ইচ্ছে ছিল আনন্দ-র সঙ্গে বীথির বিয়ে হোক। মাসীমাকে চাপও দিয়েছিলেন। রবিদাকে বলেছিলেন। রবিদা রাজী হননি। মেসোমশাইকে রবিদা বুঝিয়েছিল, আনন্দদের জাত নিচু। ওর সঙ্গে বীথির বিয়ের কথা ভাবা উচিত নয়।

আনন্দ জানতে পেরেছিল সেই কথা। তাছাড়া মাসীমা এবং রবিদা জানত,

বীথি একজনকে গোলাপ ফুল পাঠায় নিয়মিত। শুধু মেসোমশাই ব্যাপারটা বুঝতে চান নি। বাড়িতে এই নিয়ে চেঁচামেচি করেছিলেন।

আনন্দ ওই বাড়িতে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিল বীথির ব্যবহারে। বীথি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিল। বীথি সকলকে বিভ্রান্ত করেছিল। সকলে আনন্দকে ভুল বুঝেছিল। ভেবেছিল আনন্দ ওকে সত্যিই অবহেলা করছে। বীথি একদিন ওর সামনে এসে বুকের আঁচল সরিয়ে জানতে চেয়েছিল, আমার মধ্যে কী এমন জিনিষ নেই যে আপনি আমাকে অগ্রাহ্য করছেন ?

আনন্দ অবাক হয়েছিল বীথির এই ধরণের ব্যবহারে। ওর প্রতি একটা রাগ তখন থেকেই ওর মধ্যে জমে গিয়েছিল। আসলে বীথির বয়সটাও ছিল তখন অত্যন্ত কম ! জীবনে এধরনের ভুল সবাই করে। ওর এরকম ভুল কত হল। তার হিসেব রাখলে মনে হয় একটা মহাভারত হয়ে যেত বলে হা হা করে হেসেছিল বিকাশ।

তারপর আনন্দ রবিদার বাড়ি যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিল। গেলে কারো সঙ্গে তেমন কথা বলতো না। ঝগড়া ঝাঁটিতো নয়, এমনিই ভালো লাগতো না। বেশির ভাগ সময়ই চুপ করে থাকতো। কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটল। তার জন্যে মোটেই তৈরি ছিল না। বীথির গোলাপ ফুল উধাও হল। বাড়ির পছন্দ করা এক পাত্রের গলায় মালা দিয়ে বীথি হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

রবিদার বাড়িতে আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল। মাসীমা আনন্দকে রাত্রে খেয়ে যাবার কথা বললেন। ভেতরের ঘর থেকে মমতা এসে আনন্দ-র হাতে একটা চিরকূট ধরিয়ে দিল। তাতে লেখা,

"আমি মরে গেছি না বেঁচে আছি একবার খোঁজ নিতে ইচ্ছে করে না ?
কিছু কথা ছিল। পাঁচ মিনিট সময় হবে ?—বীথি।"

বীথি এ বাড়িতে ? আনন্দ উৎসুক হয়ে জানতে চাইল, ও কোথায় ?

মমতা নিচু গলায় বলল, পিসী তাঁর নিজের ঘরে।

নিজের ঘরে ? বীথি।

মমতা রবিদার বড় মেয়ে। আনন্দ-র মনে হল, সে আর ছোটটি নেই। মেয়েরা বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। ওর মনে পড়ল, সত্যিই তো। এটা তো বীথির বাপের বাড়ি। এ বাড়িতে বীথির নিজস্ব একটা ঘর থাকতেই

পারে।

মমতার কাছে আনন্দ জানতে চাইল, তোমাদের পুরনো ফোন নম্বরটা কি ঠিক আছে ?

মমতা বলল, এ বাড়ির সব কিছুই আগের মতো ঠিক আছে। শুধু ফোন নম্বরটা ছাড়া। পুরনো নম্বরের আগে প্রথমে দুই, তারপর একটা পাঁচ যোগ হয়েছে।

মমতা এমনভাবে হাসল যেন ও বড়দের অনেক গোপন ব্যাপার স্যাপার জেনে গেছে।

আনন্দ বলল, ঠিক আছে। আজ আমার দেরী হয়ে গেছে। অনেকটা পথ যেতে হবে। এখন উঠব। কালই ফোন করব পিসীকে। তুমি একথাটা পিসীকে বলে দিও।

উঠে পড়ল আনন্দ।

মমতা আর্তনাদ করার মতো জানতে চাইল, আপনি ওপরে একবার যাবেন না ?

——না। আনন্দ আবার বলল, আজ নয়।

রবিদাকে বলল, আজ উঠি। অনেক রাত হয়ে গেছে। আবার কাল আসব।

মাসীমা অন্তঃক্ষ্যে থেকে বললেন, দুটো খেয়ে যেতে বললাম যে ?

——আজ নয় মাসীমা। অন্য দিন খাব। বলে বেরিয়ে এল আনন্দ।

এমন কিছু নয়। খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা। বর্ষার এই দিনে এই দুটি অপূর্ব খাদ্যবস্তুর লোভ সংবরণ করল আনন্দ। মেসোমশাই মাসীমা বীথি, বৌদি ছাড়া রবিদার সংসারে মমতা আর ছুটকী দুই মেয়ে। রবিদার দুই মেয়ের বয়সের ব্যবধান অনেক। এক কালের বিশাল যৌথ পরিবার। বদলে যাওয়া অর্থনৈতিক জীবনের চাহিদাগুলো জোরাল হচ্ছে আর একে একে যৌথ পরিবারের বন্ধনগুলো শিথিল হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন স্বপ্ন। শপিং মলের স্বপ্ন, মাল্টিপ্লেক্সের স্বপ্ন। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে সমকাম, ফ্যাশান শো, ডেটিং, আর নিশি নিলয়ের উল্লাস। আজকের প্রজন্ম ভাবে না, চিঠি লেখে না। চিঠি লেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে আধুনিক জীবন থেকে। আজকের মানুষ সবাই এস এম এস পাঠায়। গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড বদলায় সাবান চেঞ্জ করার মতো। কেরিয়ারের জন্য ছোটে সকলে, প্রয়োজনে নরক অব্দি।

রবিদার বাড়ি থেকে বেরোতে যাবে, কালো পঞ্চাশ সালের রঙচটা ফিয়াট

গাড়িটার দিকে চোখ পড়তেই আনন্দ-র দুচোখ পরম মমতায় স্নিগ্ধ হয়ে গেল। পুরনো এই গাড়িটাকে দেখল রবিদা যত্নে রেখেছে। রবিদার যত্ন বয়সের ছাপ খুব একটা পড়েনি গাড়িটায়। অবশ্য ছাপ পড়েনি একেবারে এমন বলা যাবে না। এখানে ওখানে রঙটা চটেছে। আগের সেই গ্লেজটা নেই। যৌবনের স্বাভাবিক জেল্লাটা কমেছে। রঙ করা হয়েছে নতুন করে, বয়েসটা ধরা পড়ে যাচ্ছে। আসলে মডেলটাও পুরনো হয়ে গেছে অনেক। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে গাড়িটাকে। মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয় নিশ্চয়। এজন্যে মোটা টাকা খরচ করতে হয়, বোঝা যাচ্ছে। পুরনো গাড়ির জন্য এই টান, পুরনো আভিজাত্যের অহংকারকেই উসকে দেয়। মোলায়েম একটা বিষাদের ছোঁয়া লেগে আছে। এই হাসির দাম দেওয়া যায় না। আনন্দ-র খুব খারাপ লাগছিল। এইভাবে চলে আসাতে। কিন্তু কি করা যাবে, ওই পরিবেশটা ওর একেবারে ভাল লাগছিল না।

—দেখ স্বাধীনতা মানে নৈরাজ্য নয়। স্বেচ্ছায় নিয়ম মানতে হয় সকলকে। যে নিয়ম নির্মাণের সকলেই এক একজন অংশীদার।

—প্রত্যেকেই তো যে যার নিয়ম মেনে চলে রবিদা। আর তাই তো তৈরি হয় নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরের মতো ঘটনা। এ তো যুবভারতীতে মোহনবাগান মহমেডান স্পোর্টিং-এর ম্যাচ খেলা নয়।

—ইস্যুটা খামোখা গুলিয়ে দিস না আনন্দ। তিরিশ বছর ধরে মাটি কুপিয়েছে বামফ্রন্ট। এবার শিল্প গড়বে। কেউ আটকাতে পারবে না। আই টি সেক্টর চলে এসেছে হাতের মুঠোয়। সাইবার সিটিকে কাত করে দিয়েছি আমরা। এখন....দু একটা ভারী শিল্প, দু একটা বড় কারখানা, দু চাকা-চার চাকা-দশ চাকার গাড়ি বা পৃথিবীর বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা.....যদি লাগিয়ে দেওয়া যায়....দেখবি আরো তিরিশ বছর নিশ্চিন্ত....কেউ আটকাতে পারবে না। তোদের ওই দিদির লম্ফ ঝম্ফ সব বন্ধ হয়ে যাবে।

—রবিদা, সোভিয়েত টিকে ছিল মাত্র সত্তর বছর। এখানে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়েছে প্রায় নয় দশক আগে। ভুলে যাচ্ছ ?

—তুই কিছু বুঝবি না। কেবল এঁড়ে তক্ক করবি। শান্তি চাই। এই অশান্তি শিল্প না করতে দেবার জন্য। বামফ্রন্টকে অপসারণের জন্য তৈরি করা হচ্ছে।

—সিঙ্গুর তো আপনাদের শান্তি দিয়েছে। তাহলে তাপসী মালিক মরল

কেন ?

——ওটা সত্যিই একটা রহস্য। বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সিবিআই সত্যি ঘটনা না বের করে গল্প সাজাচ্ছে। শুধু সিঙ্গুর হলেই চলবে না। আরো চাই।

——তবে কি আপনারা শশ্মানের শান্তি চাইছেন ?

——শশ্মানের শান্তি ? হাসালি আনন্দ। শশ্মানের শান্তি ভুলে গেছিস ? অবশ্য অনেক দিন হল। ভুলে যাবারই কথা। বাহাত্তরের দিনগুলোর কথা ভুলে গেলি ? কংগ্রেসের কাছে এসব তো ছেলে মানুষী রে ! তারপর একটু থেমে কি ভেবে রবিদা বললেন, তবে ঠিকই বলেছিস। প্রয়োজন হলে তাও চাইতে হবে। ক্যাপিটেল না এলে এত শিক্ষিত বেকার ছেলে মেয়ে সবাই চাকরি পাবে কোথায় ?

——সবার চাহিদা মেটাতে পারবেন আপনারা ?

——চেষ্টা তো করতেই হবে। সরোজ মুখার্জী বলেছিলেন, আন-ট্রাভেলড পাথ।

——কলকাতা সিঙ্গাপুর হলে আপনার ভাল লাগবে ?

——সব্বার ভাল লাগবে। দেখছিস না আজকাল কথায় কথায় সবাই সিঙ্গাপুর ছুটছে ? হিন্দী সিনেমাগুলো এখন আর মুম্বাইতে শুটিং করছে না। টিম নিয়ে সবাই দৌড়চ্ছে সিঙ্গাপুর, হংকং। সিঙ্গাপুর তো এখন একটা আদর্শ স্টেট। আর পাবলিক সেক্টর এখন দেখতে পাচ্ছিস না কত শক্তিশালী !

——হ্যাঁ। আরো ফ্লাইওভার। আরো ঝাঁ চকচকে রাস্তা। আরো সুপার হাইরাইজ বিল্ডিং, আরো সুপার মল, আরো মেট্রো, আরো মদ, আরো মেয়েছেলে, আরো ম ম ম....। যা আমাদের বেদে'ও আছে। হাসল আনন্দ।

——দ্যাখ আনন্দ, তোকে পারা যাবে না। তুই বলে এত কথা বললাম। অন্য কেউ হলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতাম। ওসব ম ম ম করে সমালোচনা করলে হবে না। বিকল্প কি আছে তাহলে রাস্তা বল ?

——রাত এগারোটা বাজে। এরপর আলোচনা চালালে মাসীমা বাড়ি যেতে দেবে না। আজ উঠি ? আনন্দ উঠে পড়ল।

——হ্যাঁ যা। কাউকে বল দরজাটা বন্ধ করে দিতে। আমার একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। রবিদা মেঝেতেই শুয়ে পড়ল।

বাড়ির দিকে হাঁটছিল আনন্দ। রবিার সঙ্গে রোজ আড্ডা মারাটা এখন একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর। বিথী আর ওর সামনে আসে নি। ও ওকে

আলাদা করে টেলিফোন করে নি। কি ভেবেছে কে জানে ? বীথির বোধহয় অভিমান হয়েছে।

ভারী বৃষ্টিতে রাস্তার এখানে সেখানে জল জমেছে। রাণীগঞ্জের মোড়ে এসে রাধানগরের রাস্তাটাকে দেখল, নির্জন শুনসান। এই পাড়ার ভেতর দিকে একটা বড়িতে থাকত অসীমা অঞ্জলি। আনন্দদের নাট্যবেলার দুই নায়িকা। শয়তানের পা, একগুচ্ছ রজনীগন্ধা, টাকার রঙ কালো, পরাণ মণ্ডলের ঘর গেরস্থি, দেবরাজের মৃত্যু, বিজনদার গোত্রান্তর——দেবীগর্জন এই সব নাটক করেছে ওরা। নাটকে ওদের অভিনয় যারা দেখেছে, তারা কোনোদিন ভুলবে না। অ্যামেচার থিয়েটারে ওরকম অভিনেত্রী বিরল। রবিদা, নরোত্তোমদা, সমরদা, অজিতদা, শ্যামলেন্দু, সুখেন্দু, অলোক, বিকাশ, দেবাশীষ, রনা, আফসার, শিবেন্দু.....আরো কত জনা মিলে ওদের নট্যবেলার সাথী সবাই। সকলে কে কোথায় চলে গেল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ভাবল আনন্দ। মঞ্চাভিনয় ছেড়ে সবাই যে যার জীবন মঞ্চে অভিনয় করে চলেছে। কেউ কেউ চলে গেছে যবনিকার অন্তরালে।

অনেক রাতে টেলিফোনটা বেজে উঠল। ওটা আছে মেঝের ঘরে। রাত্রে ও ঘরে কেউ শোয় না। এত রাত্রে ফোন ? নিশ্চয় কোনো দুসংবাদ। ধড়ফড় করে ওঠে আনন্দ। কোথা থেকে ফোনটা এল কে জানে ? ছুটে গিয়ে রিসিভাল তোলে। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন শুনতে পায়, হ্যালো ? এটা কি টু ফাইভ ফাইভ ওয়ান ওয়ান ফাইভ সেভেন ?

——হ্যাঁ। কে বলছেন ?

ওদিক থেকে গম্ভীর গলায় জবাব আসে, আনন্দকে চাই।

——বলছি। আপনি কে বলছেন ?

——বাঃ। খুব ভাল। কাল সকাল এগারোটায় দেখা করবি।

——আপনি কে বলছেন ? কোথা থেকে.....বলছেন ?

ওদিক থেকে বিরক্ত জবাব ভেসে এল, কেন এখনও গলাটা চিনতে পারলি না ? দেখ ভেবে, ভাব সারারাত। তবে আমার বাড়িতে নয়, অফিসে দেখা করবি। বলে তিনি ফোন নামিয়ে রেখে দিলেন।

এ রকম রসিকতার কোনো মানে আছে ? বিরক্ত হল আনন্দ। মাঝরাতে ফোন, তাও আবার একটা ফালতু কথা বলার জন্য ! আশ্চর্য। পরিচয় দিলেন না। কিন্তু যেরকম রাসভারি গলায় কথা বললেন খুবই পরিচিত কণ্ঠস্বর মনে

হয়। কিন্তু কে ? কাল সকাল এগারোটায়....বাড়ি নয় অফিস....কোন অফিস ? সে অফিস কোথায় ? আনন্দের ঘুমের বারোটা বেজে গেল।



ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল আনন্দ। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। বাইরে এসে দেখে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। ইলশেগুঁড়ি আবহাওয়ায় মনে হচ্ছে দার্জিলিং-এ ঘুম থেকে উঠল।

কর্জন গেটের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে আনন্দ ছাতা মাথায় দিয়ে। গেটটা নতুন করে সংস্কার করা হচ্ছে। রং করা হবে। শহরে আভিজাত্যের ছোঁয়া লাগছে। এক সময়ে এই গেটটার রং করা হয়েছিল লাল। যেমন শহীদ মিনারকে করা হয়েছিল। লাল রং কমিউনিস্টদের প্রিয় রং। রাজ্যে ক্ষমতায় বামফ্রন্ট, পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী তখন যতীন চক্রবর্তী। ওদিকে দেশ থেকে এই লাল রং চোখের আড়াল করতেই বুঝি রেলের কামরা থেকে সরকারি বাড়ি ঘর সব লাল রং মুছে অন্য রঙের করা হল। আরো আগে এক সময়ে লাল রং মানে ম্যাপে বোঝানো হতো ব্রিটিশ উপনিবেশ। ম্যাপ বইয়ে সারা পৃথিবীর এক চতুর্থাংশই ছিল এক সময় লাল। তারপর সোভিয়েত হল, হল চীন। ভিয়েতনাম ধীরে ধীরে মাথা তুলতে শুরু করল। লাল রংয়ের ওই কনসেপ্ট বর্জন করা শুরু হল। তখন থেকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা লাল রংটার মধ্যে কমিউনিজমের ভূত দেখতে শুরু করল। কর্জন গেটের এই মোড়ে শহরের বাসস্ট্যান্ড ছিল এক সময়। আনন্দ এইসব দেখছে আর ভাবছে, লাল রঙের ইতিবৃত্ত। মনের মধ্যে খচখচ করছে রাতের টেলিফোনের ব্যাপারটা।

কাগজের স্টলের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষজনের চলাফেরা দেখছে। সবকটা কাগজের হেডলাইন 'রণক্ষেত্র নন্দীগ্রাম'। চোদ্দজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে বহু। হঠাৎ আনন্দ সামনে দেখে দীপ্তিকাকু এসে দাঁড়িয়েছে।

—আরে তাইতো ? একেবারেই মনে ছিল না। আনন্দ লাফিয়ে কর্জন গেটের মাথাটা ছুঁতে চাইল যেন। বৃষ্টি ততক্ষণে ধরে গেছে। মাঝরাতে ওরকম রসিকতা এই একজন মানুষই করবার স্পর্ধা রাখে।

সেই একমাথা কাঁচা পাকা চুল। মুখে সরু গোঁফের রেখায় নিচে সকৌতুক হাসি। পড়নে আকাশি বুশ শার্ট আর ছাই রঙা ট্রাউজার। দীপ্তিকাকু আনন্দকে দেখেই বললেন, এগারোটা বাজতে এখনো একুশ মিনিট বাকি। চল কোথাও

বসা যাক।

——চলুন। বলে আনন্দ ওঁর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু বসবে কোথায় ? এই শহরে দু একটা রেস্টুরেন্ট আছে নামে। কিন্তু এই সকালে সেখানে গিয়ে বসা যাবে না। চায়ের দোকান যা আছে সেখানে ওঁর মতো মানুষকে নিয়ে বসার মতো নয়। অগত্যা বলল, চলুন বংশীর দোকানে যাই।

——এই শহরে ভাল করে বসে একটু চা খাব। সে জায়গাও নেই। কলকাতা হলে তোকে বলতাম, চল তন্ত্রে গিয়ে বসি। দীপ্তিকাকু হাসলেন।

——বংশী চা খুব ভাল করে। তবে ওর ওখানে আপনাকে বসাবার মতো জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হবে। কথা বলা যাবে অবশ্য। জায়গাটা একটু নিরিবিলি। সকালে ফাঁকাই পাওয়া যাবে।

——চল দেখি তবে। তোদের বংশীধারী বাজায় কেমন ?

——না বাঁশী বাজাতে সে জানে না।

——ভাল চা করতে পারে বলছিস !

——তা পারে। গ্যারান্টি দিতে পারি।

——তবে সেখানেই চল।

মাথার বেশির ভাগ চুল সাদা হয়ে যাওয়া মানুষটি হাঁটতে লাগলেন। আনন্দ জানতে চাইল, দুধের সর দিয়ে টোস্ট খাবেন ? বংশী ওটা খুব ভাল করে।

——বংশী আর কি কি ভাল করে ? দীপ্তিকাকু জিজ্ঞেস করে হাসলেন।

বংশীকে স্পেশাল চা করতে বলল আনন্দ। দীপ্তিকাকুকে জিজ্ঞেস করল, টোস্ট বলি ?

উনি বললেন, আমি ভাত খেয়ে এসেছি। তুই মনে হচ্ছে খালি পেটে আছিস।

——তাহলে চা খাবেন এখন ?

——এভরি টাইম ইজ টি টাইম। বোস তোর সঙ্গে কথা সেরে নিই আগে।

বংশীর দোকানে বসল দুজনে। আনন্দ জানতে চাইল, কাকিমা কেমন আছেন ?

——ভাল। তুই কেমন আছিস বল ? বাড়ির খবর দে।

——বাড়ির খবর আর কি ? চলে যাচ্ছে।

—রাস্তায় একদিন দেখলাম তোকে। কবে এলি ? কদিন থাকবি এখানে ?

—কোনো ঠিক নেই।

—মানে ?

—চাকরিটা আমি ছেড়ে এসেছি।

—কেন ? এখন তাহলে কি করবি ? কিছু পেয়েছিস ?

—দেখি। পরীক্ষা টরিক্ষা দেব। কিছু একটা করতে হবে। নইলে কালো কোট আর বটগাছ তো আছেই।

'হুম' দীপ্তিকাকু গলা ঝাড়লেন।

বললেন, বেশ। এমনিই একটা কিছু ভেবেছিলাম। তা আজকের প্রোগ্রাম কি, এখন কোথায় যাবি ?

—কোনো উদ্দেশ্য নেই।

—আমি একটা কোম্পানি করেছি জানিস ?

—না।

—আমার কোম্পানিতে জয়েন করবি ?

—দেখি কিছু দিন ভেবে। পরে বলব।

—বেশ। আমার অফিসটা মনে আছে তো ?

—মনে থাকবে না ? আপনার অফিস হবার আগে ওটা একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। ওখানে আমাদের অনেক সন্ধ্যে কেটেছে।

বংশীর দোকান থেকে বেরিয়ে আবার দুজনে হাঁটতে শুরু করল। দীপ্তিকাকুর চেহারাটা তেমনিই আছে। ষাট পার হয়ে গেছেন কবে মনেই হয় না। এক সময় ছিলেন 'অ্যালামবিকে'র ডাকসাইটে অফিসার। ইংরাজীটা বলতেন ইংরেজদের থেকেও ভাল। ওদের দেশে গিয়ে ওদের কোম্পানির সর্বোচ্চ পদে বসেছিলেন। ডিরেক্টরদের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় রেজিগনেশান লেটারটা ওদের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে এসেছেন। চাকরি ছেড়ে চলে আসার পর নিজেই কোম্পানি করেছেন। প্রেসিডেন্সীর ছাত্র। এই শহরের যত পুরাকীর্তি আছে, তার ইতিহাস ওঁর নখদর্পণে। ইন্টারেস্টেড কাউকে পেলেই ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য পাগল হয়ে যান। বলেন, শুধু শিকড়ের সন্ধানে বই পড়লেই হবে ? এগুলো ঘুরে দেখতে হবে না ? চল্ তোকে আজ খাজা আনোয়ার বেড়ে নিয়ে যাই !

অফিস ছেড়ে নিজের পকেট খরচা করে দেখাবেন। বোঝাবেন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর কেন ভালবাসতেন মেহের-কে। কেন তাঁর নাম দিয়েছিলেন নূরজাঁহা। নূর এ জাহান! মর্তলোকে যার মতো সুন্দরী ছিল না। এত সুন্দরী ছিলেন যে কোনো রঙীন পাণীয় যখন গলার নলী দিয়ে পাকস্থলীর দিকে নেমে যেত তার রঙ দেখা যেত বাইরে থেকে। তারপর বলবেন, শোনা কথা, গল্প কথা। ইতিহাসে একটু রং থাকে। তাকে নিংড়ে শুদ্ধ করে নিতে হয়।

বললেন, দ্যাখ্ শাহজাদা সেলিম কিন্তু ভুলতে পারে নি, তাঁর যৌবনের প্রথম ফোটা ভালবাসার কলিকে। সিংহাসনে বসেই মনে পড়ে গিয়েছিল সুদূর কোন বঙ্গাল মুলুকের সেলিমাবাদ পরগণায় পড়ে আছে তাঁর নূর। প্রথম সুযোগেই তিনি তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ততদিনে তাঁর নূর কি তাঁর জন্য প্রতীক্ষায় তিয়াষা নিয়ে বসেছিলেন ? না। নিশ্চয় কিছু সমস্যা হয়েছিল। নূর বিধবা হয়ে দিল্লি ফিরে যাবার পর দুজনের বিবাহ হয়েছে আরো কয়েক বৎসর পর। তখন কি স্বেচ্ছায় তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের ওল্টাতে হবে ইতিহাসের পাতা।

দীপ্তিকাকু অফিসে ঢুকলেন।

আনন্দ বিদায় নিয়ে চলতে শুরু করল।

মোড়ের বড় ঘড়িটাতে দেখে বারোটা বাজতে এক মিনিট দেরি। ভাবল, আমারও কী তাই ?

গীর্জার সামনে হঠাৎ বাস থেকে নেমে একটি মেয়ে এগিয়ে এএস আনন্দ'কে জিজ্ঞেস করলে, ভালো আছেন মাস্টারমশাই ? আনন্দ তাকিয়ে দেখে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও ওই উদ্ভিন্ন-যৌবনার মধ্যে বহু-বছর আগেকার গলার হাড় বের করা রোগা টিউশানীতে পড়া তার ছাত্রীটিকে সে খুঁজে পেল না। মনে মনে হাসল। কী এত ভাবছে সে ? মেয়েটি তাকে প্রণাম করে বিদায় নিল। জীবনের কী আশ্চর্য রূপান্তর! মেয়েটিকে চিনতে এত সময় লাগল! এত মানুষ ফিরছে হাঁটছে, সকলেরই নিজস্ব একটা ছন্দ আছে। সকলেই নিজের নিজের কাজে ঘুরছে। কেবল ওরই কোনো কাজ নেই। কাজের মানুষ সকলে। ওই কেবল অকেজো লোক। ওর মনে হল কে যেন ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলছে, 'ধাঁন্দা হ্যায়, ধান্দা ? এ ক্যায়সা ধান্দা হ্যায় ?' চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আনন্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, না তো। কেউ কোথাও নেই। মানে ওর কানে কানে কথা বলার মতো কেউ নেই।

রাস্তায় অজস্র লোক চলাচল করছে। হঠাৎ দেখে রাস্তা পার হয়ে আসছেন 'এস বি' মানে সলিলবাবু। এই শহরের বিখ্যাত আবৃত্তিকার। বুদ্ধিজীবী মহলে ভাল নাম ডাক আছে। ওকে দেখেই কপাল চাপড়ে বললেন, কী আপদ! আপনি আবার এখানে কেন ?

হেসে উঠল আনন্দ। ওকে আশ্বস্ত করে বলল, ভয় নেই, আবৃত্তি করা আমি ছেড়ে দিয়েছি অনেক দিন আগে।

'এস বি' জিজ্ঞেস করলেন, আর লেখা লেখি ?

আনন্দ বলল, সে পাট কবেই চুকে বুকে গেছে।

——ভালই হয়েছে। দুটোর কোনোটাই আপনার দ্বারা হতো না। নাকের ওপরে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বললেন, আরে এ সব কি ছেলে খেলা ? এসবের জন্য পড়াশেনা করতে হয়। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী লাগে।

'এস বি' রাবীন্দ্রিক ছন্দে তাঁর ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়িতে হাত বুলিয়ে কিছু চিন্তা করে এবার বললেন, তা আপনার দেখছি ভাল উন্নতি হয়েছে। কবে থেকে এই উন্নতি হল ?

আনন্দ বলল, মনে আছে, আপনি একদিন 'মন্থনে'র সাহিত্য সভায় বলেছিলেন, 'কোরা কাগজে'র মতো পরকীয়া উপন্যাস বছরে দশ-বারোটা লিখে দিতে পারেন ? সেই দিন ঠিক করলাম, এই সব ট্যাশ উপন্যাস আর লিখব না। কিন্তু তারপর থেকে মাথায় কিছু আসছে না। তা এখন যে কি লিখি ছাই বুঝেও উঠতে পারছি না। আপনি কিছু টিপস্ দেবেন নাকি।

——বাঃ খুব ভাল কথা। 'এস বি' ব্যস্তসমস্ত হয়ে রেলিং ঘেরা ফুটপাথ টপকে ওপারে চলে যেতে পা বাড়ালেন।

আনন্দ ওঁর হাত ধরে জানতে চাইল, চলে যাচ্ছেন যে ? ভাল আছেন তো ?

উনি ওপারে যেতে যেতে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই বলেছিলাম নাকি ? কই মনে পড়ছে না। আচ্ছা এখন চললাম। পরে দেখা হবে। একদিন 'সায়েরি'তে আসুন!

বলে 'এস বি' হনহন করে চলে গেলেন।

——হ্যাঁ। দেখা তো আমাদেরই হবেই। পৃথিবীটা যে গোল। দেখা হতেই হবে।

আনন্দ-র কপালের দুপাশে ঘাম। রগ দুটো দপদপ করছে। আজ এত বছর

পরও দিনটাকে ভুলতে পারেনি। রাস্তা পার হল। জি টি রোড মানে গ্রান্ড ট্যাঙ্ক রোড ধরে হাঁটছে মানুষ। দু পাশ দিয়ে অজস্র মানুষের স্রোত পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। উল্টোদিক থেকে বহু মানুষ আসছে। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই ওর। প্রতি সন্ধ্যায় কৃষ্ণসায়র পার্কে 'সায়েরি' রেস্টুরেন্টে 'এস বি'দের একটা রঙীন আড্ডা বসে। শহরের আঁতেলরা সেখানে জমায়েত হয়। মদিরার নেশায় কৃষ্ণসায়রের জল সেখানে দোল খায়। আচমকা একদিন রবাহুত হয়ে হাজির হয়েছিল সেখানে। তারপর আর কোনোদিন আকর্ষণবোধ করে নি। ইচ্ছে করে নি। ও মনে করে ওই উচ্চকোটির জলসায় প্রবেশ করতে জো-হুজরি করার হিম্মৎ লাগে তা ওর মধ্যে নেই। তাই হ্যাংলামি করতে পারে না। 'মন্থন' সাহিত্য বাসর তাই ওকে ছাড়তে হয়েছে। ওদের ধারণা নেশা না করলে ভাল সাহিত্য করা যায় না। ভাল সাহিত্য, ভাল সংস্কৃতি উঠে এসেছে নেশার মধ্যে থেকে, এটা ওদের কথা। আনন্দের নয়।

আনন্দ বলেছিল, ওটা তাহলে আপনারাই করুন। আপনারাই এই শহরের সাহিত্য সমাজের সমাজপতি থাকুন। ওই সমাজের নিচে যারা আমার বাস তাদের সাথে। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। ভয় নেই। কোনোদিন আপনাদের সাঁকো নাড়াতে যাব না। আমি জানি, আমার কোনো পেডিগ্রী নেই, নেই আমার কোনো খুঁটি বা মামা। সুতরাং আপনারা আপনাদের জায়গায় নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

——দুনিয়ার এস বি-দের নিকুচি করি আমি। বলে আনন্দ গজগজ করে উঠে পড়েছিল।

সকাল থেকে পেটে একটা দানা পড়েনি। এতক্ষণে বুঝল পেটে ছুঁচোর ডন মারছে। কাপ চার পাঁচ চা খাওয়া হয়ে গেছে সকাল থেকে। মাথার ওপর কর্কট রোদ। নিতাইয়ের চায়ের দোকানের সামনে এসে দেখে খুব ভিড়। চাল গদির ছেলেগুলো টিফিন খেতে এসেছে। এসময়টা ওদের টিফিনের সময়। কয়েকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। নিতাই কে বলল, দুধের সর দিয়ে টোস্ট খাওয়াতে পারবি ? খুব খিদে পেয়েছে।

নিতাই এক গাল হাসল। বলল, বসুন, করে দিচ্ছি।

বাড়ি ফিরে ঘরে গিয়ে বিছানায় সটান শুয়ে পড়ল আনন্দ। স্নান হল না। না হোক, এ অসময়ে খেতে চাওয়া মানে মা'র কাছে অহেতুক বকুনি খাওয়া। ঘুম ভাঙল পায়ের শুড়শুড়িতে। চোখ মেলে দেখল সামনে সনাতন দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ। দাঁত বার করে হাসছে।

বলল, কটা বাজে খেয়াল আছে ? সারাদিন নাওয়া খাওয়া নেই। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াও ? চেহারাটা একবার দেখেছ আয়নায় ? এদিকে.....বীথি দিদি সকাল থেকে বারবার তোমাকে টেলিফোনে খুঁজছে। মা কিন্তু জানে না তুমি ঘরে ফিরেছ। আমি কিছু বলিনি।

——ভাল করেছিস।

ধড়মড় করে উঠে বসল। দেখল সত্যিই সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চায়ের কাপটা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে প্লেটে ঢেলে চুমুক দিতে শুরু করল। বংশীকে কথা দিয়েছে, আজ ওর দোকানে যাবেই সে।

সনাতন বলল, এই তো ঘুমুচ্ছিলে, হঠাৎ আবার এত তাড়া লেগে গেল কেন ? মুখ পুড়বে যে !

——ও তুই বুঝবি না। আমাকে বেরোতে হবে।

——নাক ডেকে ঘুমুচ্ছিলে তো বাবা। যদি ডেকে না দিতাম ?

——তাহলে, তুই ঘুম ভাঙালি কেন ?

——ও ! এখন আমার দোষ হল ?

——এই নে চায়ের কাপ। তুই এখন পালা। ডিস্টার্ব করিস না।

——কী ব্যাপার বলো তো ? আমাকে এভাবে তাড়াতে চাইছ ? বিশেষ কোনো ব্যাপার মনে হচ্ছে ?

চায়ের কাপ নিয়ে হাসতে হাসতে সনাতন চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, মা খুঁজছিল। একবার দেখা করে যেও।

——মা, আবার খোঁজ করে কেন ?

মায়ের সামনে যেতে অস্বস্তি করে আনন্দ-র। মিথ্যে বলতে পারে না। আবার সব সত্যিগুলো মা-কে বলাও যায় না। কিন্তু মা'রা সব মিথ্যে টের পেয়ে যান।

সনাতন ওদের বাড়িতে ঠিক কাজের লোক নয়। আবার কাজের লোক। ওকে নইলে এবাড়ি চলবে না। আনন্দ-র মা-ও চোখে অন্ধকার দেখবেন। আনন্দ আলমারি খুলে দেখল তার গরম জামা কাপড়গুলো গুছিয়েই রাখা আছে। একটা হাফ হাতা সোয়েটার চাপিয়ে তার ওপর পাঞ্জাবী চড়াল। অনেকদিন পাঞ্জাবী পড়েনি সে। সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী ওর খুব ফেভারিট।

সেপ্টেম্বর মাস। সন্ধ্যেবেলায় শীতের আমেজ আছে। নিচে নেমে দেখে, মা সন্ধ্যা আহ্নিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যাক বাবা বাঁচা গেল। দুর্গা দুর্গা বসে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এল।

সনাতনের পুচকে ছেলেটা ওর মাকে তখন দেখাচ্ছে শাহরুখ খান কিভাবে ডায়লগ বলে। আমির খান কিভাবে হাসে, গোবিন্দা কিভাবে নাচে, অজয় দেবগন কিভাবে টিসুম টিসুম মারামারি করে। ওইটুকু ছেলে, কেমন সব নকল করেছে। বলছে, আমি আর হাফ প্যান্ট পড়ব না। আমার ফুল প্যান্ট চাই। আমাকে কালো ফুল প্যান্ট কিনে দিতে হবে।

সনাতনের বউ ওকে দেখে লজ্জা পেল। হেসে কুটিকুটি। ওদিকে ছেলে বলছে, কালো প্যান্ট পড়লে ওকে নাকি দেখাবে অনিল কাপুরের মতো। দেখ মজা।

সনাতনের বউ কয়েকদিনের জন্য এসেছে। ওরা গ্রামেই থাকে। সনাতন মাঝে মাঝে যায় গিয়ে টাকা দিয়ে আসে। ওর ছেলের কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে রাস্তায় বের হল আনন্দ।

রাস্তার বাতিগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। সাড়ে ছ-টা অথবা সাতটা বাজে। বংশীর দোকানে যাবে দেখল রাস্তার ধারে দোকান পাট সব আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। পুজোর বাজার চলছে, তাই খদ্দেরদের ধরার কত কৌশল। কেউ সেজেছে মিকি মাউস, কেউ সেজেছে ডোনাল্ড ডাক। ওই রকম সেজে খদ্দেরদের তারা ডাকছে। বিশ্বায়ন কত নতুন নতুন রঙীন পেশা তৈরি করে দিয়েছে। দোকানগুলো নতুন সাজে সেজে উঠেছে। রাস্তায় তবু খুব একটা ভিড় নেই। সাইকেল মোটর সাইকেল মন্থর গতিতে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। এই শহরে রিক্সার সংখ্যা বেড়ে গেছে অত্যাধিক। রিক্সার জন্য, হকারের জন্য রাস্তায় ভাল করে হাঁটা যায় না। দিন দিন রিক্সা বাড়ছে। আশে পাশের গ্রামগুলো থেকেও বহু মানুষ রিক্সা, ভ্যান রিক্সা নিয়ে শহরে চলে আসছে জীবিকার সন্ধানে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা নয়, গ্রামের মানুষ এসেছে শহরে বাজার হাট করতে ভীড় জমাতে।

রাণীগঞ্জের মোড়ে এসে দেখা হল মলয়ের সঙ্গে। আনন্দ দেখল ও ওর পুরনো জায়গাতেই বসে আছে। বই, খাতাপত্রের একটা দোকান। কোনো রকমে চলে। বামপন্থী মানসিকতায় মলয় বরাবর একটু তেজী। এই তেজ ওর অনেক ক্ষতিও করেছে। ওর মধ্যে কোয়ালিটি আছে। কিন্তু তা কোনো কাজে লাগল না।

মলয় ওকে দোকানে বসতে বলল, আনন্দ দেখল মলয়ের দোকানটা এত ছোট যে ও বসলে মলয়কে আবার দাঁড়াতে হবে। আনন্দ তাই মলয়ের অনুরোধ এড়িয়ে দু চারটে মামুলি কথা বলে বিচিত্রা সিনেমার দিকে এগিয়ে গেল। মলয় বলল, আবার আসিস।

কমলালয় দোকানটার নাম পরিবর্তন হয়েছে। হয়েছে নতুন ঝকঝকে একটা কাপড়ের দোকান। কাচের শোরুমের ভিতরে রং বেরঙের শাড়ি, শাল, সোয়েটার ঝুলছে। একটি নারীর স্ট্যাচু দাঁড়িয়ে রয়েছে সেজেগুজে। রাণীগঞ্জের মোড়ে নতুন ট্রাফিক আইল্যান্ড বসেছে। ওদিকে ট্রাফিক পুলিশ পাউরুটির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। যার যে দিকে যাবার চলে যাচ্ছে। একটা গরুর গাড়ি ঢুকল তেঁতুলতলা বাজারের দিক থেকে। পুলিশের চা খাওয়া মাথায় উঠল। লাঠি উঁচিয়ে ছুটল ওই দিকে।

বিচিত্রার গলিতে ঢুকল আনন্দ। গলিটা এখন অনেক চওড়া। ইভিনীং সো শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ তাই কোনো ভিড় নেই। বংশীর দোকানে আসর জমজমাট। সবাই চলে এসেছে। নরক গুলজার হবে আজ।

কাঠের বেঞ্চে বসে আলোক চা খাচ্ছিল। আনন্দকে দেখতে পেয়ে বলল, ওরে দ্যাখ দ্যাখ কে এসেছে ?

সবুজ রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবীর ওপরে একটা ছোট্ট শাল গায়ে শ্যামলেন্দু হাসল। ওর দিকে একটা ভাঙ্গা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বংশীকে বলল, অ্যাই চা দে।

শ্যামলেন্দুর হাতে বেশ জোর। আনন্দ ওই চেয়ারে বসতে গিয়ে দেখে চেয়ারটা অসম্ভব ভারি। একটা পায়া তার ছোট, ভেঙ্গে গেছে। ভারসাম্য খেয়াল রেখে বসতে হয়। এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত লড়াই, ভারসাম্য রক্ষার লড়াই চলছে। চেয়ারে বসতে বসতে মনে পড়ল কথাটা। শ্যামলেন্দু ওর দিকে কটমট করে চেয়ে বলল, নিজেকে খুব চালাক মনে করিস না ?

——এরকম কেন বলছিস ? আনন্দ অবাক হল।

——ভেবেছিস আমরা কোনো খবর পাই না ?

——তার মানে ? জানতে চাইল আনন্দ।

শ্যামলেন্দু সেই একই ভঙ্গীতে বলল, এখানে এসেছিস এক মাস হতে চলল। আর আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলি আজ ? খুব বড় লোক হয়ে গেছিস না ? আমাদের গরিবদের কথা একেবারে ভুলে গেলি তুই ?

আনন্দ বলল, আচ্ছা মুশকিল তো ? তোরা সব কে কোথায় আছিস তা আমি জানব কি করে ? রবিদার সঙ্গে দেখা হল বলে....।

——ও সব মজাকি ছাড়। পয়সা হলে এরকমই হয়। বিচিত্রার গলিতে এই চায়ের ঠেকটা তুই ভুলে গেলি ?

মুখ নিচু করেই বলল আনন্দ কথাটা, না। বংশীর দোকানে ঘুরে গেছি। আসলে.....।

——আসলে কী ? আসলে তুই আমাদের ভুলে যেত চাস !

স্কুল মাষ্টারের মতো আলোক শ্যামলেন্দুকে ধমক দিয়ে উঠল। বলল, থাক থাক অনেক হয়েছে। এবার ওকে একটু চা খেতে দে।

শ্যামলেন্দু আলোককে বলল, তোকে আর বাহানা দিতে হবে না। আমরা জানি তোরও এখন অনেক টাকা হয়েছে। আমাদের মতো গরিবদের সঙ্গে মিশবি কেন ? অনেক উঁচু জায়গায় তোর এখন চলাফেরা। কানে সব খবরই আসে।

——যাঃ বাবা ! তুই আমাকেও এক ফ্রেমে বাইন্ডিং করে দিচ্ছিস শ্যামল ? খেয়াল থাকে যেন ? সুযোগ পেয়েছিস আজকে অমনি ঝেড়ে দিলি। ভাল করছিস না কিন্তু। আলোক রেগে গেল।

——তোরা কি যে বলছিস ? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না ?

আনন্দ ওদের অভিমান ভাঙাবার চেষ্টা করে। বলে, কান ধরছি বাবা। আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আর কখনো হবে না। যে কদিন আছি রোজ একবার করে বংশীর দোকান ঘুরে যাব। হল তো তোরা এবার ক্ষমা কর।

ওর কথা শেষ হবার আগেই সবাই হৈ হৈ করে উঠল। আনন্দর পিঠে একটা চাপড় পড়ল। তাকিয়ে দেখল বিকাশ। বিকাশ হেসে বলল, কবে এলি ? দুবাইয়ের গল্প বল ? মাফিয়া ডন দাউদ, আবু সালেম এদের দেখেছিস ?

এরপর সবাই মিলে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সিনেমার আলোচনায় প্রবেশ করল।

মাঝপথে পুর্ণেন্দু এসে হাজির হল। সেই আগেকার মতো ব্যস্ত গম্ভীর। ওরা সবাই যখন পুরোপুরি বেকার, তখন পুর্ণেন্দু ছিল একমাত্র সাকার, রোজগেরে। ওর পয়সাতেই সবাই চা খেত, সিনেমা দেখত তখন।

পূর্ণেন্দু বলল, কাল সন্ধ্যায় বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান আছে। তোরা সবাই মিলে আসিস।

কিসের অনুষ্ঠান কিছু ভেঙ্গে বলল না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসাও করল না। সবাই মাথা নাড়ল কেমন যেন। আরো কাজ আছে বলে, পূর্ণেন্দু খুব ব্যস্ততার মধ্যে চলে গেল। দাঁড়াল না একদম। এতদিন পরে দেখা আনন্দ-র সব দেখেশুনে কেমন যেন খটকা লাগল।

ও চলে গেলে তাই জানতে চাইল, কিসের অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ করে গেল রে ?

——ওই আছে একটা ইয়ে। আলোক কেমন আমতা আমতা করে বলল।

আনন্দর উৎসুক্য আরো বেড়ে গেল। বলল, ইয়ে মানে ? আমাকে বলতে তোদের অসুবিধা আছে ?

শ্যামলেন্দু বলল, সোজা করে বল না ?

তারপর শ্যামলেন্দু আমার দিকে ঘুরে বলল, পূর্ণেন্দু বিয়ে করছে ?

——বিয়ে করছে পূর্ণেন্দু ? সে তো খুব ভাল কথা ! আর তোরা চুপ করে আছিস ?

সবাই তখনও চুপ করে আছে।

আনন্দ আরো অবাক হল। জানতে চাইল, আশ্চর্য ! কী ব্যাপার বলতো ? তোরা সবাই চুপ করে আছিস কেন ?

——পূর্ণেন্দু একজন 'উইডো'কে বিয়ে করছে।

——উইডো ? অ ! তোরা সেইজন্য চুপ করে আছিস ?

——হ্যাঁ।

——তা অসুবিধার কি ?

——আর মেয়ে পেল না ? শ্যামলেন্দু গর্জে উঠল।

শ্যামলেন্দুর কথায় অবাক হল আনন্দ। বলল, তোরা অবাক করলি মাইরি। একবিংশ শতকে বাস করছিস আর মনটাকে ফেলে রেখেছিস মধ্যযুগে। বিয়ে করবে পূর্ণেন্দু। আর তোদের অসুবিধা হচ্ছে। ওদের ছেলেপুলে হলে তোদের মানুষ করতে হবে না কি ? না, তোদের কাছে বিয়ের খরচা চেয়েছে ?

——বেশি লেকচার দিস না আনন্দ। তুই কিচ্ছু জানিস না।

——কি জানি না ?

——দেখ ভাল মন্দ এটা আপেক্ষিক। তোর কাছে যেটা মন্দ। পূর্ণেন্দুর কাছে সেটা ভাল এবং গ্রহনযোগ্য। তোরা কিন্তু এটা ঠিক করছিস না।

——জ্ঞান দিস না তুই। এতদিন বাইরে থেকে তোর হাবভাব সাহেবদের মতো হয়ে গেছে।

——যা বুঝিস। তোদের কিন্তু সমর্থন করতে পারলাম না। পূর্ণেন্দর বিয়েতে আমি যাব। উঠলাম আজ। আনন্দ বিচিত্রার গলি থেকে বেরিয়ে এল।

পরের দিন পূর্ণেন্দুর বিয়েতে এল আনন্দ। পূর্ণেন্দু খুব খুশী ওকে দেখে। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ওর নব পরিণীতা স্ত্রী ভাল সেতার বাজাতে জানে সে কথা জানাতে ভুলল না। ওর স্ত্রী-র নামটাও খুব সুন্দর। পরিণীতা। পূর্ণেন্দু পরিণীতা ওদের বাড়ি যাবার নিমন্ত্রণ করল আনন্দকে।

আনন্দ বলল, যাবে। শুধু যাবে না ওকে সেতার শোনাতে হবে। পরিণীতা সানন্দে রাজী হল। বয়সে একটু ভারী হলেও আনন্দ দেখল ওদের দুজনকে মানিয়েছে খুউব।

পূর্ণেন্দুর বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। হঠাৎ বাঁ দিক থেকে কে যেন ডাকল, এই আনন্দ ? এদিকে......।

বাঁ দিকে চেয়ে আনন্দ দেখল, জানলার কোল ঘেঁষে একটা টেবিল দখল করে বসে আছে রবিদা। রবিদা বললেন, আয়, বোস এখানে।

টেবিলের ওপরে এক গাদা প্রুফের কপি। প্রুপ দেখছিলেন রবিদা। আনন্দ বলল, এখনোও বদ রোগটা রয়ে গেছে দেখছি। তা এবারে 'বসন্তউৎসবে' শান্তিনিকেতন যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে নাকি ?

——জানিস তো 'স্বভাব যায় না মলে....' বাংলায় একটা কথা আছে ? রবিদা হেসে বললেন, তবে কয়েক বছর যেতে পারি নি। এবার যাব ভাবছি। তুই তো যাবি নিশ্চয় ?

——হ্যাঁ যাব ভাবছি।

——দেখি সাহিত্য পত্রিকার কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেলে হয়তো যেতে পারি।

——তা এবারের বিশেষ সংখ্যা কিসের ওপরে ?

——'যা লৌকিক নয়'।

——মানে, অলৌকিক ?

——না। 'যা লৌকিক নয়'। দ্যাখ আনন্দ, বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছিলাম আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কোনো না কোনোও সময় এমন কোনও ঘটনা ঘটেছে যাকে আমরা আমাদের সীমায়িত বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারি না। আমি বিশিষ্ট কিছু মানুষকে অনুরোধ করেছিলাম সেই রকম কোনো ঘটনা যদি তাঁদের জীবনে ঘটে থাকে, তাহলে তা লিখে দিতে। একচুয়েলি মলয় এই টপিক্সটা আমার মাথায় ঢুকিয়েছে।

——আপনি আবার শেষমেষ এইসব নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করলেন ? আনন্দ বলল।

——গবেষণা নয়। একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি।

——কাজটা কতটা এগিয়েছে ?

——দারুন। ভীষণ সাড়া পাচ্ছি রে ! ভেবেছিলাম হয়তো এধরণের সংখ্যা

বের করা যাবে না। কিন্তু এখন যা সাড়া মিলছে, তাতে বুঝতে পারছি একটা আস্ত থান ইঁট হয়ে যাবে। এই লেখাটা দ্যাখ, কে লিখেছে জানিস ? অবশ্য মলয়ই সব লেখাপত্র যোগাড় করে আনছে। আমি শুধু বসে বসে.....

আনন্দ জানতে চাইল, লেখাটা দিয়েছে কে ?

রবিদা হঠাৎ বাড়িয়ে ধরা হাতটা সরিয়ে নিলেন। বললেন, উঁহু। থাক এখন। মলয় রাগ করতে পারে।

দাদা সুলভ হাসি হেসে রবিদা বললেন, না থাক। এখন বলবনা। এটা টপ সিক্রেট থাক। সংখ্যাটা বের হোক আগে, তখন দেখবি।

——বেশ দেখিও না।

বলল, তাহলে উঠি আজকে। পূর্ণেন্দুকে ভিড়ের মধ্যে কোথায় দেখতে পাচ্ছি না, ওকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। এখন আর দেখা করছি না, আসছি।

বলে আনন্দ বেরিয়ে আসছিল। রবিদা বললেন, ঠিক আছে। কাল বংশীর দোকানে দেখা হবে।

——আসব।

——কাল একটু আগে আসিস। দুজনে একসাথে সাধনা প্রেসে যাব। ওখানে প্রুফগুলো দিয়ে নতুন এক জায়গায় তোকে নিয়ে যাব। খুব ভাল লাল চা হয সেখানে, দুজনে লাল চা খেতে যাব। দারুন চা ! ঠিক আসিস কিন্তু !

——বেশ তাই হবে। আনন্দ বুঝতে পারল, রবিদা আসলে ওকে একটু তেল দিল। অভিমান ভাঙাবার চেষ্টা ! শালা ভন্ড মার্ক্সবাদী। আবার অলৌকিকত্বে বিশ্বাস ! আনন্দ রাস্তায় পড়ে থাকা একটা প্লাস্টিকের হাওয়া ভরা প্যাকেটে জোরে লাথি মারল। প্যাকেটটা সামান্য দুলে আবার স্থির হয়ে গেল।

সাধনা প্রেস নামটা সার্থক। শহরের রেড লাইট এরিয়ায় এই প্রেসের নামটা যাঁরা রেখেছিলেন তাঁদের দূরদৃষ্টি ছিল বলতে হবে। সাধনারই জায়গা এটা। সমাজ পরিবর্তনের সাধনা করতে গেলে তা সব থেকে পচনশীল জায়গা থেকেই করা উচিত। পঙ্কজের সুবাস, সৌন্দর্য বুঝতে গেলে পাঁকের কাছে যেতেই হবে। সরু রাস্তাটার ঘুপচি দুপাশের বাড়িগুলোর দরজায় রঙ মেখে বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাক মেয়েগুলোকে দেখে আনন্দ এইসব কথাই ভাবছিল।

সাধনা প্রেসে প্রুফগুলো দিয়ে রবিদার সাথে বেরিয়ে এল। টিম টিম করে রাস্তার লাইটগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। রেডলাইট এই অঞ্চলের ঘুম এবার ভাঙতে শুরু করেছে। মেয়েগুলো একে একে সেজেগুজে ভাঙাচোরা ঘরগুলো থেকে বের হচ্ছে। ভাঙাচোরা ঘরগুলোতে ভাঙাচোরা কপাল নিয়ে ভাঙাচোরা মানুষ এরা। মুখের ওপর রঙ চাপিয়েছে। গায়ে রঙ, ঠোঁটে রঙ মেখেছে। চামড়ার ভাঁজের ওপর ম্যাসাজ অয়েল। ঝুলে পড়া স্তন, চুপসে যাওয়া নিতম্ব সব ঢাকা দিয়ে বের হয়েছে নতুন সাজে। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে, 'দুর্গা দুর্গা' বলে। পাশের পাড়া খোসবাগানে ডাক্তারবাবুরাও এসময়ে চেম্বারে গণেশ মূর্তিকে ধূপ ধুনো দিয়ে মনে প্রাণে ঠাকুরকে বলছে, ঠাকুর লাইন দিয়ে খদ্দের পাঠাও। এই মেয়েগুলোও ওই একই কথা বলছে, মা দুর্গা খদ্দের পাঠাও। ডাক্তাররা চাইছে, এই শহর, শহরের আশেপাশের গ্রামগুলোর মানুষগুলো অসুস্থ হোক, ডাইরিয়া ডিসেন্ট্রি বাড়ুক আর ওদের বাড়বাড়ন্ত হোক। ওই মেয়েগুলো চাইছে, শহরের মানুষগুলো বা এই শহরে নতুন আসা মানুষগুলো তাদের সতী সাবিত্রী স্ত্রীদের কথা ভুলে গিয়ে ওদের ঘরে এসে আনন্দ লুটুক। এই সমাজ জীবনের দুই অঙ্গে কত মিল ! আনন্দের হাসি পেল।

——সাড়ে সাতটা বাজতে চলল। কেউ এখনো এসে পৌঁছল না। চল তোকে নিয়েই যাই। বাঙালির টাইম জ্ঞান কোনোদিন হল না। রবিদার গলায় আক্ষেপের সুর।

——কোথায় যাবেন বলছিলেন ? জানতে চাইল আনন্দ।

——কেন ? রাধানগর পাড়ার সেই বাড়িটাকে তোর মনে নেই ?

কথাটা যেন ঝটকা দিয়ে স্মৃতিটাকে নেড়ে দিল আনন্দ-র।

রাধানগর পাড়ার সেই বাড়ি ! যে বাড়িতে ওদের কত আড্ডা, কত বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে সময় কেটেছে। যে ঘরে জমায়েত হয়েছে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা। বিজন ভট্টাচার্য, তাপস সেন, পূর্ণেন্দু পত্রী, কালী ব্যানার্জী, বেলা দাশগুপ্ত......আরো কত বিশিষ্ট নামী দামী মানুষ যাদের সান্নিধ্যে পেয়েছে ওরা ওখানে। ওদের জীবনের একটা অমূল্য সময় কেটেছে ওই বাড়িতে। কেটেছে কত মধুর সন্ধ্যা।

রবিদা ওর মনের অবস্থা কিছুটা বোধহয় আন্দাজ করলেন।

বললেন, তুই তো অনেকদিন যাসনি ওই বাড়িতে। আজকে চল তোর ভাল লাগবে।

আনন্দ কী একটা বলতে যাচ্ছিল। দেখে সামনে অসীমা কোথা থেকে হন হন করে এসে দাঁড়াল। কী বিচ্ছিরী চেহারা হয়েছে অসীমার। চোখের নিচে কালি। দু-গাল ভর্তি ব্রনো। গাল দুটো লাল হয়ে গেছে। মুখের হনু প্রকট হয়ে পড়েছে। অথচ ওর কি দারুণ ফিগার ছিল ! এই শহরের নাটকের দলগুলো ওকে বেশি টাকা দিয়ে অভিনয় করাবার জন্য টানবার চেষ্টা করতো। ও কিন্তু ওদের ছেড়ে যায় নি কোনদিন।

অসীমা আনন্দকে দেখে বলল, কবে এলে আনন্দ ?

রবিদা বললেন, অসীমা, তোকে কতগুলো কথা বলবার আছে।

অসীমা ওর ঠোঁটে অদ্ভুত হাসির টান এনে বলল, রবিদা অনেক দেরি হয়ে গেছে। কথাগুলো আরো আগে বলতে পারলে বোধহয় ভালো করতে।

আনন্দ কিছু বুঝতে পারল না। ওদের মধ্যে কী এত সিরিয়াস কথাবার্তা হচ্ছে ? দেখল কথা যত এগোচ্ছে দুজনে আরো সিরিয়াস হয়ে পড়ছে।

অবস্থা সামাল দেবার জন্য আনন্দ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। অসীমা বাধা দিয়ে একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে এল।

বলল, আনন্দ, রবিদা বোধহয় বলেছে তোমায়, আবার আমরা নাটক নামাচ্ছি ?

আনন্দ জানতে চাইল, কোন নাটক ?

অসীমা খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, বিজন'দার দেবীগর্জন।

——দেবীগর্জন ? এখন ? আনন্দ কিছুটা হতাশ হল।

——হ্যাঁ। অসীমা মুচকি হেসে বলল, তুমি তো এই নাটকে অভিনয় করতে ?

——হ্যাঁ।

——তাহলে এবারও কর না ? তুমি তো এখন আছ !

——কিন্তু এখন এই নাটক কে নেবে ?

——বিজন-দার নাটক কেউ নেবে না বলছ ?

——না তা নয়। আনন্দ আমতা আমতা করে বলে, আসলে কৃষক সংগ্রামের নাটক তো সময়টা তেভাগার। এখন তো অন্য সময়।

——অন্য সময় ঠিকই। তবে....।

অসীমা রবিদাকে উদ্দেশ্য করে বলল, রবিদা, আমাকে একবার খোসবাগান যেতে হবে। খোসবাগান ঘুরে আমি আসছি। চলে যেওনা, যাব আর

আসব। ডাক্তার দত্ত-র কাছে যাব, কথা বলা আছে। খুব বেশি দেরী হবে না। তোমরা এগোও। আনন্দ, চলে যেওনা যেন।

অসীমা পাক মারা গলি দিয়ে খোসবাগানের দিকে চলে গেল।

বি সি রোড ধরে রবিদা আর আনন্দ পাশাপাশি হাঁটছে। কালিতলার কাছে এসে দেখে, রূপমহল সিনেমা হলটা উধাও হয়ে গেছে। রবিদা বললেন, ওটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ওখানে ফ্ল্যাট হবে শুনছি। বিশ্বায়নের হাওয়ায় এই শহরে যে সব পরিবর্তন হচ্ছে তার মধ্যে এটা অন্যতম।

আনন্দ রবিদার কাছে জানতে চাইল, এখন দেবীগর্জন করার কোনো মানে হয় ?

রবিদা বললেন, বিজন-দার স্মরণে এই নাটক নামানো হচ্ছে। বিজন-দার নবান্ন, গোত্রান্তর যতটা নাম কিনেছে, দেবীগর্জন সেই তুলনায় পারে নি। এ নাটকে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলা হয়েছিল, বাংলার তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজ এই নাটক গ্রহণ করতে ভয় পেয়েছিল।

——তা তো নয় হল। কিন্তু এখন এই শিল্পায়নের আবহাওয়ায় এই নাটক আমার মনে হয়, কেউ নেবে না। উল্টে রাজনৈতিক বিতর্ক তুলতে পারে।

——রিহার্সালই শুরু হয় নি। দ্যাখ হবে কি না ?

——না হলেই ভাল। এই নাটক নতুন করে বিতর্ক তুলবে।

——মেয়েটা একেবারে শেষ হয়ে গেল আনন্দ। একটা কিছু নিয়ে থাকে, তাই আমি প্রতিবাদ করিনি।

——অসীমা শেষ হয়ে গেল।

রবিদার কথাটা ঠিক ধরতে পারল না আনন্দ। ওর মনে পড়ল, অসীমা 'বসন্তউৎসব' দেখবে বলে একবার ওর সঙ্গে শান্তিনিকেতন গিয়েছিল। হঠাৎ ও অসুস্থবোধ করায় আনন্দ একটা হোটেলে ঘর নিতে বাধ্য হয়েছিল। বসন্তউৎসবের দরুন শান্তিনিকেতনে ভীষণ ভিড় থাকায় কোনো ভাল হোটেলে ঘর পাওয়া যাচ্ছিল না। কোনো রকমে লজে ছোট্ট একফালি একটা ঘর পেয়েছিল ওরা। লজের ছোট্ট সেই ঘর, ঘর না বলে খোপ বলাই ভাল। নোংরা বাথরুম। শান্তিনিকেতনে যাবে আর ফিরে আসবে বলে দুজনের কেউই এক্সট্রা জামাকাপড় নিয়ে যায় নি। বাথরুমে যাবে বলে হঠাৎ আনন্দ দেখে অসীমা ওর সামনেই তার পোষাক ছাড়তে সুরু করেছে। আনন্দ চিৎকার করে উঠেছিল, অ্যাই অ্যাই কী হচ্ছে ? কী করছ কী ? দাঁড়াও আমি বাইরে যাই।

অসীমা বলেছিল, তুমি ভিতরেই থাক। আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ছোটবেলা থেকে আমরা একটাই ঘরে মানুষ হয়েছি। অভ্যেস হয়ে গেছে।

আনন্দ-র খুব খারাপ লেগেছিল। বলেছিল, আমাদের বাড়িতেও বেশি ঘর ছিল না। কিন্তু আমাদের বাড়িতে কেউ এমন করে না। একটা ঘর থাকলেও, সবাই বাথরুমে গিয়েই জামাকাপড় ছাড়ে।

অসীমা বিন্দুমাত্র বিরক্ত হয়নি। বলেছিল, একটা ঘরে মানুষ হওয়ার যন্ত্রণা কি তা তুমি জান না আনন্দ, তাই এরকম কথা বলছ।

——হয়তো তাই। আনন্দ বিরক্তি প্রকাশ করেছিল।

অসীমা। বর্ধমান হাসপাতালের নার্সের চাকরি করে। বাড়ি চন্দননগরের দিকে। কিন্তু বর্ধমানেই থাকে। ওদের সঙ্গে নাটক করে। বর্ধমানের অফিস ক্লাবের নাটকের দলগুলো ফিমেল হিসাবে ওকে ব্যবহার করতে চায়। ভাল টাকার অফার দেয়। ও যায় না। এজন্য অনেক সমালোচনা শুনতে হয় ওকে। নাটক করে সমাজটাকে পাল্টাবার দুঃস্বপ্ন দেখে। সেই অসীমা খারাপ হয়ে যাচ্ছে শুনে আনন্দর ভীষণ খারাপ লাগল।

শীত পড়তে শুরু করেছে। গায়ে নানারকম গরম জামাকাপড় চাপিয়ে মানুষ জন হাঁটছে। বিকট আওয়াজ করে একটা নতুন বাইক ওদের শরীর প্রায় স্পর্শ করে চলে গেল। তিনজন ছেলে এমনভাবে বাইকটা চালিয়ে নিয় গেল যেন আর একটু হলেই ওরা ধরাশায়ী হয়েছিল আর কি।

——আর একটু হলেই। চমকে উঠল আনন্দ।

বলল, এদের কী মরনের ভয়ও নেই ? লাগলে আমাদেরই বা কী হতো ?

——কি আর হতো ? বুড়ো বয়সে ঠ্যাং ভাঙতো। রবিদা ভেংচি কাটার মতো করে বললেন।

——বুড়ো বয়সে ঠ্যাং ভাঙলে......। আশ্চর্য ! ওদের কেউ ভদ্রতাও শেখায় না।

আনন্দের কথায় রবিদা বললেন, '..ছিঃ ভোগবাদী হয়ো না। তোমরা উচ্ছৃঙ্খল, কোনো কথা শুনতে চাও না। এতে তোমাদের ভাল হবে না।' এসব কথা আজকাল আর কে শেখাবে ?

বলেই 'ওই দ্যাখ' বলে রবিদা আনন্দকে কনুইয়ের গুঁতো মারলেন।

আনন্দ দেখল, একদল কলেজ পড়ুয়া মেয়ে শার্ট প্যান্ট পড়নে গল্প করতে করতে এমনভাবে এগিয়ে আসছে যে দুপাশের মানুষ, দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের।

আনন্দরাও দাঁড়িয়ে গেল। এই শহর তো লন্ডন নিউইয়র্ক দূরের কথা মুম্বাই বা হাতের কাছে কলকাতা হয়ে ওঠে নি। তবে ? কিন্তু ওরা ডোন্ট কেয়ার। ওদের তাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে ওরা পড়ে নিশ্চয়। স্বচ্ছন্দে ধাবনে মিছিলের সারিতে গোটা রাস্তা জুড়ে হাঁটছে ওরা। হেসে খলখল করতে করতে চলেছে। সেই তালে তালে নিতম্ব দুলছে প্রকটভাবে। দুম্বা দুম্বা ! দুয়ো দিচ্ছে স্কুল কলেজের পড়ুয়া ছেলেগুলো। জিনসের ওপরে টপ এত শর্ট সাইজ যে নাভি কুন্ডলী দেখা যাচ্ছে।

আঠারো বছর বয়স জীবনকে গড়ে তোলবার সময়। অথচ এই সময়ের মধ্যে মা বাবা ছেলে-মেয়েকে শেখাচ্ছে, এক নম্বর হতে হবে। বাবা মাকে প্রতিনিয়ত শেখাতে হচ্ছে। নইলে বাবা মা জানে ছেলে আমার পিছিয়ে পড়বে। প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। চাকরি পাবে না, জীবনে দাঁড়াতে পারবে না।

আমাদের বাবা মা আমাদের শেখাতেন, নিজে নিজে কর। ভুল করবি, তবেই তো শিখতে পারবি। ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড। আর এদের বলা হয় ভুল করবি কেন ? ভুল করলে শিখবি কি করে ? ভয়ের দৈত্য চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন ওদের ঘাড়ে। ভয়ে ওরা কুঁকড়ে যাচ্ছে। হয়ে যাচ্ছে অতি সাবধানী। এইভাবে পার হয়ে যাচ্ছে ওদের জীবনের দু-দুটো দশক। এইভাবে একসময় ইঁদুর দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে ভীরু ভদ্রলোক হয়ে যাচ্ছে ওরা। তারপর ছেলে মেয়ের বাবা অথবা মা হয়ে ছা-পোষা ভদ্রলোকের মতো নিরীহ জীবন যাপন করছে। লোকে এক কথায় ওদের বলছে কৃতী জন।

ওরা কোনো স্বপ্ন দেখে না। ওরা পক্ষীরাজে চড়ে সাত সমুদ্র পার হওয়ার গল্প শোনে নি কোনোদিন। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে দৈত্য দানবের দেশে গিয়ে তাদের প্রাণভোমরাকে মেরে রাজকন্যাকে মুক্ত করার সাহস ওদের নেই। ওরা সাত সমুদ্র পাড়ি দেয় দৈত্য দানবের গোলাম হতে। পৃথিবীর আরও আরও জনপদকে মৃত্যুপুরী করে দিতে। ওরা কৃতী, ওরা সার্থক—বলে আমরা ওদের আশীর্বাদ করি। কৃতী ছেলে মেয়ের বাবা হিসাবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। কিন্তু কোনও মৃত্যুপুরীকে জনপদে রূপান্তরিত করার কথা কল্পনাতেও আনতে পারে না ওরা।

এদেরই মধ্যে আবার একদল আছে যারা পাঁজরার নিচে হৃদয়টাকে এখনও অক্ষত রেখেছে।

ওরা এখনও স্পর্শকাতর, সংবেদনশীল। বয়সের ডাকে ওরা এখনও

সাড়া দেয় কল কল করে। আঠারো থেকে পঁচিশ ওরা সকলে একসাথে গর্জন করে। ওদের চোখে স্বপ্ন, শরীরে বল, মনে সাধ। সাধ মেটানোর উদগ্র বাসনায় তৈরি শক্তিতে ওরা বলীয়ান। বিদ্রোহ করাটাই যেন ওদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার। ভুল করে হোক, ঠিক হোক, করে ওরা ছুটছে। ওরা ছুটছে গ্রামে গঞ্জে শহরে প্রান্তরে। দেশে দেশে শত্রুর বুককে চাঁদমারি করে কখনও কখনও ওরা উগরে দিচ্ছে উত্তেজনা। সেই সঙ্গে নিজেরাও হচ্ছে ক্ষত-বিক্ষত। ছুটছে। ওরা প্রকৃতির বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে ওরা প্রতিমুহূর্তে ছুটছে। স্রোতের বিরুদ্ধে ছুটছে ওরা। ওদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, কোনও উত্তেজনা প্রশমন অথবা নিষ্ক্রমণ নয়। নতুবা নতুন কৃতিত্বের হাতছানির মোহ নয়। ওরা ছুটছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে। ওরা ছুটছে লাতিন আমেরিকা, ওরা ছুটছে রাশিয়া চীনে, ওরা ছুটছে ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়ায়। ওরা ছুটছে ভারতের বুকে। ওরা গান গায় শান্তিনিকেতনে গাছের নীচে। ওদের এই ছুটে চলা, গান গাওয়ার মধ্যে কোনো খাদ নেই।

একটা অন্ধকার ঘুপচি বাড়ির মধ্যে আনন্দ ঢুকল রবিদার সঙ্গে। এই বাড়িটাকে আগে কোনদিন দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।

——খুদু ! খুদু আছিস না কি ?

রবিদার ডাকে কেউ সাড়া দিল না। একতলার ঘুপচি ঘরের দরজায় পুরনো একটা তালা ঝুলছে।

——নাঃ তোকে চা খাওয়াতে পারলাম না। দোতলা ভেঙ্গে পড়েছে। এ বাড়ি এখন মানুষ বাসের অযোগ্য। খুদু তাই অন্য কোথাও চলে গেছে।

রবিদা আপসেট। আনন্দ বলল——চলুন বাড়ি ফিরি।

‘বসন্তউৎসব’ নামটা শুনলেই শান্তিনিকেতনের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। লালমাটি, রক্ত পলাশের সাজে চোখের সামনে নাচে বর্ণময় খোয়াই। অভাবের সংসারে ভ্রমণ বিলাসের স্বপ্ন দেখাটাই হঠকারিতা। কিন্তু শান্তিনিকেতন বর্ধমানের হাতের কাছে। বসন্তউৎসব আনন্দ-র প্রাণের আনন্দ উৎসব, মনের আনন্দ উৎসব। আনন্দ তাই ট্রেনে চেপে বসে। লুপ লাইনের ট্রেন চলে ধীর গতিতে। লর্ড ডালহৌসী কবে কোন কালে এই লাইনে ট্রেন চলাচল উদ্বোধন করেছিলেন তারপর দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে রেলপথের যোগাযোগের ভরসা এই একমাত্র রেললাইন। অধুনা বোলপুর থেকে নির্বাচিত

সাংসদ লোকসভার স্পীকার সোমনাথ চ্যাটার্জীর উদ্যোগে সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন ডাবল লাইন হয়েছে। তবে গতি বাড়েনি। হাল্কা হাল্কা শীত লাগে আনন্দ-র। এই পথে এতবার এসেছে চোখ বুজে বলে দিতে পারে কোথায় কী আছে। রেললাইনের পাশে পাশে সবুজ ধানের ক্ষেত, ফাঁকা জমি ছুটে চলে। দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো সরে সরে যায় সিনেমার ছবির মতো। একের পর এক পার হয়ে যায় ঝাপটের ঢাল, বনপাস, গুসকরা স্টেশন।

আনন্দের চোখের সামনে ভেসে ওঠে আম্রকুঞ্জ, সংগীতভবন, বিশাল জীর্ণ ও দীর্ণ বট গাছের গুঁড়ি, গাছ-গাছালির মধ্যে মিশে থাকা রামকিঙ্করের সুজাতা——সাঁওতাল পরিবার। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত গাড়ি। তবে লজ্জার কথা তাঁর নোবেল প্রাইজ এখান থেকেই চুরি গেছে। দেশের জাঁদরেল প্রতিষ্ঠান সিবিআই দপ্তর ওই চুরির তদন্ত কেস থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। তার মানে ওটা আর পাওয়া যাবার কোনো আশা নেই। দোল ফাগুনে রাঙা শান্তিনিকেতনের চেহারাই আলাদা। বৈতালিকের দল আজ গান গাইবে, নৃত্য পরিবেশন করবে। আজ শুধু নাচ আর গানের দিন। 'গৃহবাসী দ্বার খোল' বলে তারা গান গাইবে, নৃত্য করবে। দুয়ার সে তো ঘরের নয়, মনের। সেই দুয়ার খুলে দাও, ডাক দিয়েছে বসন্তরাজ। তোমরা সবাই এসো, সমবেত হও আম্রকুঞ্জে। দেখ, বাসন্তী রঙের নাচের স্রোত ভাঙ্গা ঢেউয়ের মতো ছুটে ছুটে আসছে। এমনি করে বেদীর ওপর একের পর এক দলের গান, নাচ চলবে সেই দুপুর অব্দি।

অশোক পলাশে ভরে আছে শান্তিনিকেতনের আকাশ। আবিরে সবার রঙে রঙ মিলিয়ে শেষ হবে বেদীর ওপরে ছকে বাঁধা অনুষ্ঠান। তারপর ছোট ছোট দলে, উপদলে বৈতালিকের দল ছড়িয়ে পড়বে শান্তিনিকেতনের সব গাছের নিচে। ওরা জড়ো হবে এক বা একাধিক বৃত্ত তৈরি করে। এইভাবে আবার সারা দুপুর ওরা গান গাইবে, নাচবে কখনো একা, কখনো যৌথভাবে। গোটা শান্তিনিকেতন সুরের ঝর্ণা ধারায় ধুয়ে যাবে। অনেক রাতে ভাঙবে এই আসর। চাঁদ তখন ঝকঝকে থালার মতো মাথার ওপরে আলো দেবে। ছাত্রাবাসে ছাত্রাবাসে হৈ হুল্লোড় চলবে তখনও।

আকাশটা আজ ভারি সুন্দর। নীল আকাশে মেঘের স্তূপ মহাদেবের জটার মতো সেজে বসে আছে দূরে। দূর থেকে ওরা অবলোকন করছে ফাগ উৎসব'কে। বকের পাখার থেকেও সাদা ধবধবে মেঘের ওই কুন্ডলী। সারা আকাশ জুড়ে

গভীর নীল আকাশে চিলের ডাক শোনা যায়। আকাশ আমার শান্তিনিকেতনের আকাশ, আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তোমার প্রেমে মাতোয়ারা, তাই তো কাছে ছুটে আসি। ভালবাসি তোমায় বড় ভালবাসি। চিলের ওই ডাক বসন্তউৎসবের শান্তিনিকেতনকে উদাসী করে দেয়।

সকালের ঝকঝকে রোদে শঙ্খ চিল খেলা করছে। পাখনা মেলে ভাসছে। অফুরন্ত নীলের মাঝে সাদা বকের পাখনার মতো পেঁজা তুলোর ওমের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে ওই চিল মাঝে মাঝে। মেঘের সাথে এই মুহূর্তে ও লুকোচুরি খেলছে।

ট্রেনটা হু হু করে স্টেশনে ঢোকে। হলদে সাইনবোর্ডে আলকাতরা রঙ দিয়ে নামটা লেখা——'বোলপুর' নিচে ছোট করে লেখা 'শান্তিনিকেতনের জন্য বিখ্যাত'। আনন্দ স্টেশনে নামল। নামল ওর মতো বসন্তের সাথীরা যারা এসেছে কলকাতার দিক থেকে। দলে দলে এই স্টেশনে নামল মানুষ বসন্তকে ভালবেসে। স্টেশন ঘরের থামগুলো মনে হল বসন্ত উৎসবের জন্যই যেন নীল রঙ করা হয়েছে। অফিস ঘরের জানলা দরজাগুলোও নীল। যেন নীল ভুবনের পারে এসে পৌঁছিয়েছে সকলে। ধীরে ধীরে জনস্রোতের মধ্যে দিয়ে আলুথালু সাঁতরে স্টেশনের বাইরে আসে আনন্দ। গাড়ির আওয়াজ, প্যাঁক প্যাঁক রিক্সার আওয়াজ। রাস্তার দুপাশে চায়ের স্টল, ফুলুরির দোকান, মুদির দোকান সব পার হয়ে সুপরিচিত পিচের রাস্তায় এসে দাঁড়ায় সে। এবার একটু চা খেতে হবে। চায়ের জন্য মনটা আনচান করছে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর হাঁটবে। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে ভুবনডাঙ্গার মাঠের দিকে। সরু এই পথ, আগে ধূ ধূ করত। কিছুক্ষণ হাঁটার পর চোখে পড়ল গাছগুলোর আড়ালে খড়ে ছাওয়া মাটির সেই ঘরটা আর নেই। ওখানে একটা দালান বাড়ি গজিয়েছে। উঠেছে লজ। ওইখানে বাবলুর বাড়ি ছিল। নবীন ওকে নিয়ে এসেছিল। আজ থেকে সে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা।

বুকের মধ্যে অনেক যন্ত্রণা, জ্বালা চাপা পড়ে আছে। শান্তিনিকেতনের কত সমব্যথী, সুখ দুঃখের অন্তরঙ্গ সঙ্গী, সহযোগী সকলে আজ কে কোথায় ছড়িয়ে গেছে! মন উজাড় করে সব কথা বলার জন্য এখন আর সামনে কাউকে পাওয়া যায় না। এই যে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে গাছ, ওরা নিজেরাও জানে না কেন দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কি কোনো দুঃখ আছে? কেউ জানতে চায় না, কারো এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই। ওদের দাঁড়িয়ে থাকার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা,

ওদের কোনো অসুবিধা আছে কিনা, তা নিয়েও কেউ ভাবে না, মাথা ঘামায় না। কোনো প্রশ্ন করে না কেউ। বলে না, ওগো গাছ, তুমি যে এমন নিখুঁত সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে আছ। তোমায় দেখতে ভারি ভাল লাগছে। কিন্তু তুমি কেন শুধু দাঁড়িয়ে আছ ঝাঁকিয়ে মাথা ? বলতে পারো ? না, কেউ জানতে চায় না। কিন্তু গাছ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ অনেক কথা বলে।

ঋতুর পর ঋতু কাটে, বছরের পর বছর পার হয়, গাছ দাঁড়িয়ে থাকে একই জায়গায় চার পাশের ঘটে যাওয়া ঘটনার সাক্ষী হয়ে। আনন্দ-র মনে পড়ে এমনি দুটো গাছ দেখেছিল, চক্রধরপুরে। চাইবাসা যাবার রাস্তার ধারে। পাশাপাশি দুটো বিশাল অর্জুন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। অথচ ওদের দুটো ডাল মিলে গেছে একসাথে। তার মাঝখানে মাথা উঁচু করে উঠেছে নতুন একখানি ডাল। যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওদের সন্তান। আদিবাসীরা বলে একটা পুরুষ গাছ, একটা নারী গাছ মিলিত হয়েছে। মাঝখানের নতুন ডালটি ওদের সন্তান। ছেলেকে কাঁধে নিয়ে যেন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দুজন। আনন্দর মনে হয়, ওর জীবনটাও এই গাছের মতো। মানুষ তো সংস্কারকে ডিঙ্গিয়ে পিছুটানের বন্ধনকে ছিন্ন করে, সব কিছুকে পদদলিত করে উন্নত জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। গাছ পারে না, কিন্তু আমাকে পারতেই হবে, নিজের মনেই বলল আনন্দ।

ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে, নিঝুম দুপুরে বৈতালিকের দল গাছের নিচে বসে গান গায়। শুধু বনে নয়, মনেও ফাগুনের গান গুন গুনিয়ে ওঠে। খরখর বাতাসে গায়ের ওপর ঝরে পড়ে পলাশের শুকনো পাতা। কাছেই কোথাও কোকিল ডাকে। মন উচাটন হয়। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে গাছও ভাবে এইসব কথা। গাছ ডাল পালা ফুল পাতা বাড়িয়ে দেয় নাচের ছন্দে, গান গায় বৈতালিকের দলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, 'আহা আজি এ বসন্তে.....' অথবা 'আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা'। আমরা সে গান শুনতে পাই না। ওই গান শোনার মতো কান আমাদের তৈরি হয় নি।

সন্ধ্যেবেলায় বেদীর ওপর 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের খেলা শুরু হয়। পূর্ণিমার আলোয় তখন আবিষ্ট দশা। কেবলই মনে হয় এই মাটির সাথে মোর প্রাণের কথা প্রতিটি অণু পরমাণুতে। ওদিকে সঙ্গীতভবনের উঠোনে চলছে কবিতা পাঠের আসর। নামী এবং দামী কবির দল একে একে কবিতা পাঠ করছে। আনন্দ ঘুরে বেড়ায় উদাসী বাউলের মন নিয়ে। কিছু কিছু আধুনিক

কবিতা শুনে মনে হয়, বুদ্ধির জালে শব্দেরা বন্দি হয়ে হাঁসফাঁস করছে। তারা মুক্তির আশায় ছটফট করছে। ভারী শেকলে বাঁধা থাকায় মুক্ত হতে পারছে না। ওদের দম বন্ধ হয়ে আসছে। ওদের এবার মৃত্যু ঘটবে।

কারু কৌশলের উৎকর্ষতায় মাথার উপরে বায়ুমন্ডল ভারী হয়ে ওঠে। কবিতার আবেগ আর ভালবাসাকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ উঠে পড়ে একসময়। ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে থাকে সেই গোপন পথের ওপর দিয়ে। যেখানে শুধু সবুজ ঘাসের বুক চিরে পথ আঁকা আছে। তার ওপর দিয়ে চলে। এই পথে অতিক্রম করেছে ওর জীবনের বহু বসন্ত। নিরালা নির্জন এই পথের উপান্তে এলেই ওর স্মৃতির পাতাগুলো উড়ে এসে জড়ো হয় এক ঝাঁক পায়রার মতো। তখন স্মৃতির পাতা ওল্টাতে থাকে, কেবলই ওল্টাতে থাকে। কষ্ট হয় বুকের মধ্যে, ভীষণ কষ্ট হয়। স্মৃতিকে আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে আসে ওপরে। বুকের খাঁচার ভেতর থেকে রক্তাক্ত হৃদপিন্ডটা যেন বাইরে বেরিয়ে আসে, ধক ধক করতে থাকে, কেবলই ধক ধক করতে থাকে।

বসন্তউৎসবে প্রতি বছর আসাটা এক সময়ে নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আনন্দর। শুধু বসন্তউৎসব তো নয়, একজনের সঙ্গে দেখা হওয়া। প্রতিবছর এই দিনে তাঁর সাথে দেখাও হতো। দূর থেকে শুধু চোখের দেখা। মুখ ফুটে কোনদিন কথা হয়নি কখনো। তাঁর পরিচয় ও জানে না। পরিচয় অজ্ঞাত বলে সেই রহস্যময়ী আজও তার মানসপটে ছবি হয়ে আছেন।

খুব টকটকে গায়ের রঙ। গায়ে ছিল শ্বেতী। কিন্তু বসন্তের রঙে ওই শ্বেতীও রঙীন হয়ে উঠতো। ঢাকা পড়ে যেত। পড়নে চওড়া সবুজ পাড়ের বাসন্তী শাড়ি। বয়স তখন চব্বিশ কি পঁচিশ হবে। তাঁর হাতে থাকতো অনন্ত হলুদ পলাশের বালা, চুলের বিনুনীতে জড়ানো থাকতো হলুদ পলাশের মালা। হলুদ পলাশের একখানি মালা তাঁর গলায় দুলতো। ছন্দে আনন্দে মনে হতো শান্তিনিকেতনের রঙীন এই বসন্তউৎসবের প্রতীক ওঁর গলার ওই মালাখানি। বৈতালিকের নাচের দলগুলোকে তিনি নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর নাচের ছন্দে পলাশ দুলতো।

ঘন কেয়ার ঝোপে লম্বা ডাঁটার মতো সাদা ফুলের দল হাওয়ায় দুলে উঠতো। টুপটাপ জল ঝরে পড়তো ওদের পাপড়ি থেকে। ঘন কেয়ার গন্ধ ভেসে আসতো। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ওর মাথায় তখন সাহিত্য আর সিনেমায় নায়িকারা ঘুরে বেড়াতো। তাঁর ওই সুশ্রী তরুণী ফুলের বালা আর মালা পড়া

অনন্ত রূপ, অনাবৃত দুটি হাতের সুঠাম সৌন্দর্য নাচের ছন্দে শান্তিনিকেতন যেমন মুগ্ধ ও অভিভূত হতো। তেমনি মুগ্ধ হত আনন্দ। ওর বুকের রক্তে একটা নতুন স্পন্দনের জন্ম হতো। ওই টানেই প্রতি বসন্ত উৎসবের সময় অন্য কোথাও থাকতে পারত না। পলাশ ফুটলেই শান্তিনিকেতনের ডাক পেত মনের গভীরে। আর বসন্তউৎসবকে ঘিরে তখন ওদের সাহিত্যপত্রের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হতো। ভুবনডাঙার মাঠে সেই বুড়ো বট গাছের নিচে গোল হয়ে বসত সকলে। সারাটা দুপুর চিৎকার করে পাঠ করত একে একে নিজেদের কবিতাগুলো।

এমন একটা দুপুরে মলয় পড়েছিল তার কবিতা——

'পূবের আকাশে রূপালী চাঁদের মায়া
ছড়িয়ে গেছে জীবনের সীমানা।
বিজ্ঞাপনে আপ্লুত আমার জীবন,
মানুষের পদপিষ্ট চাঁদের ওই
অংশ দেখে উত্তেজিত মন।
সান্ধ্য শিশিরে শব্দ ফোটাতে চায়
যেমন
হায় হায়,
স্বপ্নগুলো বর্ধিত উদাসীনতায় উড়ে যায়।
উড়ে যায় মহাকাশে
কোনো এক বর্ণময় ছাতার চাতালে।
যেখানে কেউ নেই
তুমি নেই,
আমি নেই,
অথচ সে আছে।'

ওদের মধ্যে যে অনুপস্থিত থাকতো, তার কবিতা পড়ে দিত অন্য কেউ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতো, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে। এক সময় খেলা সাঙ্গ হতো ওদের। সকলে উঠে পড়তো। আর সঙ্গে সঙ্গে তখন মনে হতো ওদের খিদে পেয়েছে। ওদের তৃষ্ণার গলা শুকিয়ে গেছে। আশ্চর্য এতক্ষণ কেউ ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনে করতে পারে নি। বাবলুর বাড়িতে তখন রান্না হয়ে যেত, খিঁচুড়ি ডিম আর পাঁপড় ভাজা। সঙ্গে কাঁচা আমের চাটনি। ওরা সবাই খাওয়ার জন্য ছুটে চলতো। তারপর আবার সেখানে শুরু হতো কবিতা পাঠ, গান। এইভাবে গভীর

রাত্রে শিথিল কোনো মুহূর্তে বাবলুর ঘরে ওদের স্বর্গ রচনা হতো।

চাঁদের আলোয়, পূর্ণ চাঁদের মায়ায় ওরা তখন গান গাইত। সেই ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠে। বেদীর ওপরে তখন শাপমোচনের খেলা শেষ হয়েছে। ওর স্মৃতির আকাশ ধূসর হয়ে ওঠে। দেখে বসন্ত পূর্ণিমার চাঁদ মাথার ওপরে উঠে এসেছে। গাছের ফাঁকে রূপালী থালাটা হাসছে। মাঝে মাঝে মেঘের দল তাকে ওড়না বুলিয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে আসা আলোয় ভেসে যাচ্ছে ভুবনডাঙার মাঠ। ভেসে আসা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরধ্বনি ওকে কোনো মায়াবী জগতে নিয়ে যায়। ওর মনে হয় কেউ যেন ওরই পাশে, আশে পাশে কোথাও গান করছে। খুব করুন সুরে গাইছে রবীন্দ্রনাথের গান। ওই সঙ্গীত, সুরধ্বনি ক্রমশ এগিয়ে আসে। কাছে আরো কাছে। সত্যিই এসে উপস্থিত হয় একেবারে ওর সামনে। ও তখন অবাক হয় ! রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে কেউ এসে ওর সামনে দাঁড়িয়েছে। এক অপার্থিব রূপ ওর সামনে উন্মোচিত হয়, একেবারে মুখোমুখি তাকে দেখে চমকে ওঠে। ভাবে একী স্বপ্ন না মায়া ! দেখে মায়া নয়, একেবারে বাস্তব ! ধড়ফড় করে উঠে বসে। একটি সাঁওতাল মেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে। অবাক হয় মেয়েটিও। কয়েক মুহূর্ত মেয়েটিও দাঁড়িয়ে পড়ে। আনন্দ তাকে বলে, বাঃ ! কী সুন্দর গান গাও তুমি ?

ওর কথায় মেয়েটি বিস্ময়ে হতবাক হয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর এক ছুটে বাঁক ঘুরেই অদৃশ্য হয়।

—ওগো মেয়ে তুমি কি একা পথ ভুলে ছিলে ?

ভাল করে বুঝবার আগেই মেয়েটি চলে গেল। আনন্দ ভাবল এইজন্যই বুঝি বলে, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় আছে সত্য, জ্ঞান, অনুভূতির সুসংবদ্ধ প্রকাশ। মনের ভেতর থেকে অনেক কথা উঠে আসে। এ এক অতলগভীর স্পর্শের মতো। গানের মধ্যে দিয়ে তিনি পরম পিতার মতো ওর মধ্যে তাঁর অনুভবের ভাষাকে ব্যক্ত করেন। একটা নিরুত্তেজ শান্ত সুরের মধ্যে ও বিচরণ করতে থাকে। এ যেন সকল নিয়ে সব দিয়ে শোনার জন্য অপেক্ষা করা। এ অপেক্ষা যেন চিরকালীন অপেক্ষা—'কবে তুমি আসবে' বলে অপেক্ষা। এ অপেক্ষা অনন্তহীন। না, মেয়েটি চলে গেছে।

শান্তিনিকেতন শহর থেকে দূরে নয়, অথচ শহরও নয়—এমন শান্তির নীড়। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'র জায়গা এই শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতন তাঁর এই উপলব্ধির সংযোগ সেতু আনন্দর মধ্যে বেঁধে দেয়। ওর মনের ক্ষতের উপরে শুশ্রূষার সেবার পরশ নিয়ে আসে।

বাইরের সঙ্গীত থেমে গেলেও ওর মনের মধ্যে ওই সঙ্গীতের রেশ নীহারিকার মতো জ্বলতে থাকে। বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে ঢেউয়ের মতো তোলপাড় হতে থাকে ওর মনের গহীন অরণ্য। যতক্ষণ এই মাটিতে বসে থাকে মনে হয় নতুন কোনো পৃথিবীতে আছে। এখানে সবই সুন্দর, সবাই ভালবাসতে পারে সকলকে। প্রীতি দিয়ে, মন দিয়ে এখানে সবাই ছুঁয়ে থাকে সকলকে। সব মানুষই কেমন যেন সকলের আপনজন। এই সূক্ষ্ম অনুভূতিকে ধরবার ক্ষমতা তিনি দিয়েছেন এখানকার মানুষদের। আনন্দর মধ্যেও জাগরুক হয় সেই শক্তি,—যা ও জানতেই পারত না যদি না শান্তিনিকেতনে আসত। এখানকার মৌনতা তাই ওকে মুগ্ধ করে। ও পবিত্র হয়। এখানে এলে আনন্দ সেই পরম পিতার আশীর্বাদ পায় মাথার ওপরে।

অবশেষে আনন্দ একটা ঘোর নিয়ে উঠে পড়ে। পথে যেতে যেতে ভাবে—দিনটা ভারি সুন্দর কাটল। ওর মনের ভেতরটা ঠিক যেন পলাশ ফুটে ওঠার মতোই হয়ে ওঠে আলোকিত বনভূমি। রাত হচ্ছে। তবু ফিরে যেতে হবে। সামনে দেখে একটা ছেলে হ্যারিকেন নিয়ে এগিয়ে আসছে। ওর সাথী হয় আনন্দ। ওকে বলে, আমাকে একটু এগিয়ে দিবি ?

ছেলেটি রাজী হয়।

আনন্দ জানতে চায়, তুই কি সেই দূর দেশী রাখাল ছেলে ?

ছেলেটি ঘাড় নাড়ে। বলে, আমার নাম প্রদীপ। ওই মাঠের ধারে আমাদের বাড়ি। স্যারের কাছে পড়তে গিয়েছিলাম।

বালক তাকে প্রশ্ন করে, তুমি কি শান্তিনিকেতনে গান শুনতে এসেছ ?

আনন্দ বলে, হ্যাঁ।

প্রদীপ বলে, আমার দাদা ভাল গান গায়। আজ নাচ করেছে, গানও করেছে।

—তাই বুঝি ? তুই গান করিস না ? আনন্দ ওকে জিজ্ঞাসা করে।

ও বলে, গাই। দাদার মতো পারি না। দাদা খুব ভাল পারে।

আনন্দ অবাক হয়। এ ছেলে বসন্তের ডাক পায় নি এখনো। মা তাকে লেখাপড়া শিখতে স্যারের কাছে পাঠিয়েছিল। লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।' 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।' নীতি শিক্ষার এইপাঠ ও এখন নিচ্ছে।

প্রদীপের জন্য রাতের শেষ ট্রেন পেয়ে যায় আনন্দ। স্টেশনে ভিড় থিক থিক করছে। ট্রেন থেকে যেমন লোক নামছে, উঠছে তার চেয়েও বেশি। আনন্দ

ভাবে, উৎসব তো শেষ। তাহলে এত লোক নামছে কেন আবার ? শেষমেশ একটা রিজার্ভ কামরাতেই উঠে পড়ল আনন্দ। অনেকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। রিজার্ভেশন নেই ওর। রিজার্ভ বার্থে যাত্রীরা সব ঘুমুচ্ছে। তারা কেউ কেউ বিরক্ত হয়। আনন্দ তাই বাথরুমের করিডরে দাঁড়িয়ে থাকে। এছাড়া কিচ্ছু করার নেই। গাড়িতে বড্ড ভিড়, সাধারণ বগিতে উঠতেই পারতো না দরজায় দরজায় বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে বেশ কিছু মানুষ।

বর্ধমান এসে যখন পৌঁছল, রাত তখন ভোর হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে বহু মানুষ কুঁকড়ে শুয়ে আছে। তিন চারটে ষণ্ডা মার্কা কুকুর মারামারি করতে করতে দৌড়ে এল ওর দিকে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতেই শুয়ে থাকা একজন হেট হেট করে তাড়া দিল ওদের।

আনন্দ দেখল দুজন ভিখারি গল্প করছে। একজন হাতের লাঠিটা মাটিতে আছাড় মারল বার কয়েক। কার প্রতি এত আক্রোশ ? ওই কুকুরগুলো ? খবরের কাগজের গাড়ি, হকারদের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে সাত সকালে। দিনের টাটকা সংবাদপত্র নামছে গাড়ি থেকে, টাটকা সব্জীর মতো কাগজের বান্ডিলগুলো পৌঁছে যাবে সর্বত্র। আনন্দ দেখে সব কাগজের হেডলাইন 'রক্তাক্ত নন্দীগ্রাম'। স্টেশন চত্বরের বাইরে আসে সে।

আবার রক্তাক্ত নন্দীগ্রাম। মিটিংয়ে মিছিলে তোলপাড় রাজধানী কলকাতা। আনন্দ ভোর রাতে বাড়িতে ঢোকে। সনাতন দরজা খুলে দেয়। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ে আনন্দ।

দরজায় অনেকক্ষণ ধরে খুটখুট আওয়াজ হচ্ছে। সদর দরজায় এসময় কে আওয়াজ করে ? এত সকালে কে আসতে পারে ? কোনো খারাপ খবর নয়তো ? বাবা তো অনেক সকালে মর্ণিং ওয়াকে বেরিয়ে গেছেন। আর কেউই এত সকালে ওঠে নি। 'সনাতন.....' হাঁক দিয়ে আনন্দকেই উঠতে হল।

দরজা খুলে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে রবিদা। বিধ্বস্ত চেহারা এমন। সারারাত ঘুম হয় নি। মুখে একটা কাঁচুমাচু ভাব আর কুণ্ঠাজড়িত মৃদু হাসি। ওকে ঘুম থেকে তুলে যেন একটা ভীষণ অপরাধ করে ফেলেছেন। গালে দু তিন দিনের না কামানো দাড়ি। পড়নে ময়লা ধুতি, উর্ধ্বাঙ্গের পাঞ্জাবীটাও ময়লা। হাতে কাগজে মোড়া নতুন বইয়ের একটা প্যাকেট।

—কী হয়েছে রবিদা ? এত সকালে ? অবাক হয়ে জানতে চাইল আনন্দ।

কিছু যে একটা হয়েছে। সেটা যে ভাল ঘটনা নয়, এই ভেবেই ওঁর হাত ধরে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে এল। ওর হাত ছাড়িয়ে দ্বিধান্বিত গলায় কেমন

একটা বিশ্রী হাসি হাসতে হাসতে রবিদা বললেন, এই না, না, না। আমি..আমি..আমি..বসব না। তাছাড়া এখন আমি শ্মশান থেকে আসছি আনন্দ।

——শ্মশান ? কি হয়েছে ? আনন্দ চমকে ওঠে।

——হ্যাঁ শ্মশান। মলয়টা চলে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বের হল। মাথা নিচু করলেন রবিদা।

——মলয় ? কখন কিভাবে ? কই আমাকে তো কেউ খবর দাও নি ? কি করে হলো ? আনন্দ ককিয়ে উঠল যেন।

——আত্যহত্যা করেছে মলয়।

——কিভাবে ?

——ওর ক্যান্সার হয়েছিল। কাউকে বলে নি। কাউকে বুঝতেও দেয় নি। হতভাগাটা এমনি করে পরিবারটাকে পথে বসিয়ে চলে গেল। সুইসাইড নয় তো কি বলব একে ? রবিদা বললেন।

রবিদাকে আনন্দ জোর করে ওর ঘরে টেনে নিয়ে গেল। বসাল একটা চেয়ারে। মশারি গুটিয়ে রাখল। বলল, একটু বসুন, চায়ের জোগাড় করে আসি। তারপর সব শুনছি। বাথরুম যাবেন তো ওই দিকে ঘুরে আসুন। দড়িতে গামছা আছে। আমি আসছি। রবিদাকে বাথরুম দেখিয়ে আনন্দ রান্নাঘরে এল।

রবিদা একইভাবে বলতে লাগল, এই আনন্দ না না। এসবের কোনো দরকার নেই। আগে আমার কথা শোন।

ওঁর কথা না শুনে রান্নাঘরে এল আনন্দ। দেখল মা উঠে স্টোভ ধরাচ্ছে। ফিসফিস করে মা ওকে জিজ্ঞাসা করল, কার কি হয়েছে রে খোকা ? কে এসেছে এত সকালে ?

আনন্দর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। মা ভাল করে হাঁটতে পারে না। বাতে পা দুটো পঙ্গু করে দিয়েছে। সেই মা কোনোরকমে হেঁছড়াতে হেঁছড়াতে রান্নাঘরে উঠে এসেছে। দরজার কড়া নাড়া শুনেছে। কেউ বাড়ি এসেছে টের পেয়েছে। মা আবার ওকে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে রে খোকা ? কে এসেছে ? বললি না তো ?

চোখের জল বাধা মানল না। আনন্দ মাকে বলে, মা, রবিদা এসেছেন। সারারাত জেগে ছিল। বোধহয় পেটে কিছু পড়েনি। চায়ের সঙ্গে কিছু দিতে পারো ?

মা ওর চোখে জল দেখে বলল, তুই যা। আমি সনাতনকে পাঠাচ্ছি। কিন্তু

কে মারা গেছে বললি ?

——মলয়। তুমি তাকে দেখেছ।

——দেখেছি কি রে ? ওই তো পুলিশের রাইফেল ছিনতাই করেছিল ? সেই মলয় ?

——রাইফেল ছিনতাই করে নি মা। ওই ঘটনায় ওকে ফাঁসানো হয়েছিল। ও তুমি বুঝবে না। আনন্দ বলে।

ফিরে এসে দেখে রবিদা হাতের প্যাকেটটা খুলে ফেলেছে। ভিতর থেকে বের হল খুব সুন্দর মলাটের কয়েকখানা সাহিত্য পত্রিকা। দুটো ওর দিকে বাড়িয়ে রবিদা বললেন, এটাই আমাদের লেটেস্ট ইস্যু। যা লৌকিক নয়। মলয়ের লেখা আছে। শেষ লেখা বলতে পারিস। মলয় এটা দেখে গেল না। অথচ সবটাই ও করেছে। তাই সঙ্গে নিয়েছিলাম। ওর চিতায় একটা কপি তুলে দিয়েছি।

রবিদা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। কী যেন ভাবলেন। তারপর ওর দিকে চেয়ে বললেন, আর একটা বিশেষ অনুরোধ আছে আনন্দ, তোর কাছে।

আনন্দ জানতে চাইল, কী ?

রবিদা আস্তে আস্তে বললেন, মলয়ের পরিবারের জন্য কিছু টাকা দিতে পারিস ?

——আমি ? আনন্দ অবাক হয়। এরা সবাই ওকে কী ভেবেছে ?

রবিদা বললেন, আমার কথা তো জানিস। তার ওপরে এই পত্রিকার জন্য অনেক টাকা প্রেস কে দিতে হয়েছে। খরচ হয়েছে অনেক টাকা।

——একবারে শেষ সময়ে এলেন ? আনন্দ যেন নিজের মনেই কথাটা বলল।

——না। তোর খোঁজ করেছিলাম। তুই ছিলি না। আনন্দ, তুই দুবাই থেকে চাকরি করে ফিরেছিস, তাই জোর করছি।

রবিদার এই কথায় আনন্দ ফের চমকে উঠল। রবিদার চোখেও দেখল সেই একই দৃষ্টি। সবার ধারণা ও এখন প্রচুর টাকার মালিক। দুবাই ফেরত। ওখানে নাকি অনেক টাকা বেতন পেত। বিরক্ত লাগল ওর। বলল, ও। সেইজন্যই আমার কাছে এসেছেন ?

——হ্যাঁ রে। রবিদা নির্লজ্জের মতো উত্তর দিল।

ওর মনের এত দিনের বন্ধ দরজা জানলাগুলো একে একে হাট করে খুলে গেল। শিবসুন্দর শ্যামলেন্দু দেবাশীষ বিকাশ অমিত আফসার....তালিকার অন্ত

নেই। বন্ধুরা প্রায় সকলেই কম বেশি জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ব্যতিক্রম ছিল মলয়। মুখে বিপ্লবের কথা বললেও দোকানটার মায়া কিছুতেই ছাড়তে পারল না। নীতি নৈতিকতা আঁকড়ে পরিবারটাকে পথে বসিয়ে দিয়ে গেল। ও তো চলে গেল। যারা রয়ে গেল, তাদের এখন দেখবে কে ?

আনন্দ রবিদার এভাবে আসাটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারল না। এভাবে কতদিন চলবে ? প্রশ্নটা অনুচ্চারিত রাখল। দেখল রবিদা ওর দিকে চেয়ে আছেন একদৃষ্টে ব্যাগ্রভাবে। যেন খুব আন্তরিকভাবে অপেক্ষা করছেন, দুবাই ফেরত আনন্দ কি করে ? ওঁর অনুরোধের জবাবে আনন্দ কি করবে ? এই আশা নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দর মনে হল পৃথিবীতে সত্যিকারের ভালবাসা আন্তরিকতা এগুলো সত্যিই মরে গেছে। ওই মুখের আয়নায় ও দেখল যেন টাকা ছাড়া আর কোনো শব্দ জেগে নেই। রবিদা পারলেন না, আনন্দর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন রবিদা। আনন্দ-র মনে পড়ে গেল 'মৃতদের থেকে জীবিতরা অনেক বেশি মূল্যবান' কথাটা খুব বলতো মলয়। ওর মনে হল মলয় যেন অলক্ষ্যে থেকে ওদের ওপর নজর রাখছে। কে কী করছে সেটা দেখতে চাইছে। হয়তো বলতে চাইছে, কি রে আমার জন্য কাঁদবি ? আমি তো মরে গেছি। আমার জন্য কেঁদে কিচ্ছু হবে না। বরং ওরা রইল, ওদের দেখিস। সেই মুহূর্তে আনন্দ সিদ্ধান্তটা নিল।

টেবিলের ওপরে ওর পার্সটা রাখা ছিল। তুলে নিল সেটা। হাতড়ে নোটগুলো বার করল। রবিদার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, বসুন চা আসছে। চা খেয়ে তারপর যাবেন।

পাঁচখানা একশ টাকার নোট। হীরক দ্যুতি নিয়ে জ্বলছে। রবিদার হাতে কিছুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—সবটাই দিয়ে দিলি ? রবিদা কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, না রে চলি।

রবিদা উঠে পড়লেন। বললেন, আমি ফিরলে ওরা দুটো খেতে পাবে। তাই আর বসব না। তুই বড় উপকার করলি আনন্দ। আমি এখন.....।

সনাতন চা টোস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। রবিদাকে বলল, চা টা অন্তত খেয়ে যান।

—দেরি হয়ে যাবে। পরে অন্যদিন খাব। আজ আসি। বলেই রবিদা চলে

গেলেন।

রবিদা কি দেখল ? বুঝল ? আনন্দর পার্সে আর কোনো টাকা নেই আর দুবাইয়ের চাকরিটা আনন্দ ছেড়ে এসেছে ?

সনাতন অবাক হল। মা ঘুম থেকে উঠে কষ্ট করে চা করে দিলেন ! ওকে আনন্দ বলল, চা টা রেখে যা। আর টোস্ট টা ঢাকা দিয়ে রাখ, আমি পরে খেয়ে নেব।

'নূরজাহান ফিরদৌসরা নগ্ন ত্রস্ত পায়ে
হেঁটে যায়
ওরা রেল ওয়াগন থেকে চুরি করে
সভ্যতার কালো সোনা।
ওদের দুচোখে ক্ষুধার উনুন জ্বলে
ওরা চুরি করে।
ওদের জ্বলন্ত শরীর থেকে কালো
ছাই ওড়ে।
ওরা শীতের বৃষ্টিতে কষ্ট পায়।
ওরা পৃথিবীর অসুখ।'



'খেটে খাওয়া স্বদেশ
প্রখর গ্রীষ্ম রাত্রি,
মুখ ভরেছে সাদা ফেনায়——
বাতাস গাইছে রামধনু।
অভ্যর্থনা নির্মাণ যা কিছু——
মাংসহীন কঠিন তলপেট
জন্ম দিয়েছে আমার স্বদেশ।'

মলয়ের কবিতা। মলয় অল্প বয়সেই লেখালেখি করে কবি হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল। পেন পেন্সিল আর খাতা পত্রের দোকান করে নিজের ছোট্ট সংসারটা ঠিকই চালিয়ে নিচ্ছিল। তার হল কিনা ক্যানসার। ক্যানসার রোগটা আজকাল ঢুকে পড়েছে নিম্ন মধ্যবিত্তের অন্দরমহলে। অবশ্য গোটা সমাজটাই এখন ক্যানসারে আক্রান্ত। যার ঘরে এই রোগ ঢুকছে, সংসারটাকে পথে বসিয়ে

দিচ্ছে।

মলয় একসময় মনে করতো বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। এই ভেবে ও ঠকেছিল। তারপর ভাবল বন্দুকের নলের চেয়ে বরং কলম ধরি। পুরনো সেই কথা 'দি পেন ইস মাইটিয়ার দ্যান দি সোর্ড'। কিন্তু মলয় সেই থেকে কেমন যেন চুপসে গিয়েছিল। হয়ে গিয়েছিল চুপচাপ। ওর ভিতরের কথাগুলো শব্দের রূপ নিয়ে কলমের ডগা দিয়ে কাগজের মধ্যে বেরিয়ে আসতো। কারোর ভাল লাগতো, কারোর লাগতো না। আনন্দ একদিন বলেছিল, শুধু লিখলেই হবে না, পড়তেও হবে।

আনন্দ শান্তিনিকেতন গিয়েছিল, এর মধ্যে এতগুলো কান্ড ঘটে গেল। চিকিৎসার কোনো সুযোগ না দিয়ে চলে গেল মলয়। শ্মশানে যখন ওকে চিতায় চাপানো হয়েছিল, তখন চারদিক থেকে নাকি প্রচুর বাতাস বইছিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল ওর চিতা। খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে গিয়েছিল মলয়। ডোমরা বলেছিল, মহান মানুষেরা নাকি চিতায় উঠলে এমন হয়, এমনি করে পোড়ে। ওরা তো জানতো না, মলয় মানে বাতাস। তাই এত বাতাস এসেছিল।

বুকের ওপর দুটো হাত, কানে তুলো, নাকে তুলো, চোখে চশমা পড়িয়ে দোলের রঙ মাখা মলয়কে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। পুরনো দোতলা বাড়িতে ভাড়া থাকতো মলয়। শ্বশুরবাড়িরও কোনো সাহায্য নেয় নি। কি করে যে এত সব ম্যানেজ করতো কে জানে!

গোলাপী রঙের ফুলকাটা বেড কভারে মলয়ের মৃতদেহ ঢাকা দেখে ওর মেয়ে ভাবছিল বাবাকে ফুলের বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। সে শুনেছিল মানুষ মরে গেলে আকাশের তারা হয়ে যায়। তার বাবাও মরে গিয়ে আকশের তারা হয়ে গেছে। ওর দাদু আকাশের তারা হয়ে আছে। তাহলে দাদু আর বাবা কি পাশাপাশি থাকবে? এইসব প্রশ্নের ঠিকঠাক জবাব না পেয়ে ও সকলকে অস্থির করে তুলছিল। বেচারা জানেই না, মর্ত্যলোক থেকে উঠে আকাশের তারা হয় যারা, তার সব বিশেষ প্রজাতির মানুষ। তারা ওর দাদু বা বাবার মতো সাধারণ নয়।



গত চোদ্দ বছর মলয় কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিল না। সক্রিয় রাজনীতি সে ছেড়ে দিয়েছিল। কোনো রাজনৈতিক দলের সাফাই গাইবার দায়

ছিল না তার। নিজের লেখালেখি নিয়ে থাকতো। আর ছিল দোকানটা।

নন্দীগ্রাম ওদের বাড়ি ছিল এক সময়। সেখানকার ধূলোতে ও খেলেছে, নদীতে সাঁতার শিখেছে। ওখানকার বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছে। সেই নন্দীগ্রাম এখন অশান্ত। যে অঞ্চলগুলিতে অশান্তির আগুন জ্বলছে সেখানকার মানুষ ওর অতি প্রিয়জন। যে মানুষেরা মারা গেছেন, তাদের কেউ কেউ ওর পরিচিত। কয়েকদিন আগে ওদের গ্রামের বাড়ি থেকে ওর মেজদা ফোন করে বলেছিল, একবার বাড়ি আয়।

ও জানতে চেয়েছিল, কেন ?

ওর মেজদা বলেছিল, গ্রামের ব্যাপার স্যাপার আমার মোটেও ভাল লাগছে না।

মলয় জানতে চেয়েছিল, কেন, কি হয়েছে ?

——কাগজে পড়ছিস না ? বলে ওর মেজদা সব কথা বলেছিল।

মলয় বলেছিল, তাহলে আমি আর গিয়ে কি করব ?

——তবু যদি আসিস ?

ওর মেজদার ধারণা হয়েছিল, ও বাড়ি গেলে ওখানকার অশান্তি হয়তো কমতে পারে। কারণ বামপন্থী কর্মী হিসাবে মলয় ওই এলাকাতেই প্রথম কাজ শুরু করেছিল। ওখানে আজকের যারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব তারা সকলেই ওর এক সময়ের পরিচিত। ঘটনা হল কি, এরপর ঘটনা খুব দ্রুত তালে এগিয়ে গেল। কয়েকদিন পরই মলয় নন্দীগ্রাম গিয়েছিল। গ্রামে কিন্তু ঢুকতে পারেনি। অপমানিত হয়ে ফিরে এল। ওকে যারা আটকে ছিল তারা ছিল সকলে আঠারো থেকে বাইশ চব্বিশের যুবক। মলয় জোর করে গ্রামে ঢুকতে চেয়েছিল। ওদের মধ্যে একজন যাকে মলয় চিনতে পেরেছিল। সে রুখে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, তুমি আর যেতে পারবে না।

——তুই ? তুই আমাকে বাধা দিবি ? মলয় উত্তেজিতভাবে জবাব দিয়েছিল।

——প্রয়োজন হলে আরো কিছু করব। উত্তর শুনেছিল মলয়।

——শেষ পর্যন্ত তুই ? মলয় হতবাক হয়েছিল। এ ছেলে তার কোলে পিঠে মানুষ হয়েছে। সে কিনা বলে, প্রয়োজন হলে আরো কিছু করবে ?

মলয় ফিরে আসে। দু দিন কারো সঙ্গে কথা বলতে পারে। নিজের মধ্যে চুপচাপ থাকে। দোকানের বিক্রি কম। বেচার জিনিষও কম, পুঁজি কম হলে যা

হয়। এর মধ্যে ব্যথাটা বেড়েছিল। ওর বউ কয়েকটা বাড়িতে রান্নার কাজ করে। ভেতরে ভেতরে মলয় যে এত ক্ষয়ে গিয়ে ছিল বোঝা যায় নি। মলয় বুঝতেও দেয় নি। নিজে টের পেয়েছিল ঠিক, কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয় নি। হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছিল। ক্যানসার কোনদিন হোমিওপ্যাথিতে সেরেছে কেউ শুনেছে?

দু দিন আগে মলয় বর্তমান ছিল। আজ সে অতীত। ওর বউ সারা জীবনের জন্য বিধবা হল। কতই বা বয়স? এইসব চিন্তায় মনটা খারাপ হয়ে গেল আনন্দর। ওর মনে হল মলয়ের মেয়ে হয়তো এখন রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে বাবা তার বাড়ি ফিরবে বলে? হয়তো বা কাঁদছে। কে এখন ওদের সান্ত্বনা দেবে? গলায় সোনার চেন ঝোলানো পাড়ার চ্যাংড়া ছেলেগুলো এবার হয়তো ওদের গার্জেন হবার প্রতিযোগিতা শুরু করবে। আশ্চর্য! মলয় এসব কথা একবার ভাবল না?

আনন্দ সনাতনকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, আমার কেউ খোঁজ করেছিল?

মাথা চুলকে একটু ভেবে উত্তর দিল সনাতন। বলল, হ্যাঁ। রীতা দিদি ফোন করেছিল। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।

——ঠিক আছে যা। বিরক্তভাবে জবাব দিল আনন্দ।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিকাশের ঠেকে গিয়ে বসল। বিকাশের এই ঠেকটা খুব ভালো। নিরালা নিরিবিলি। বিকাশের এক বন্ধুর নার্সিংহোমের ছাদের ওপরে ঘরটা। কেয়ারটেকাররা সাধারণতঃ ব্যবহার করে। বিকাশ, মাঝে মাঝে আনন্দও আসে। স্মৃতির অনুষঙ্গে এই, প্রথম মলয়ের মৃত্যু আনন্দকে ধাক্কা মারল। ভীষণভাবে নাড়া দিল। বিকাশকে বলল, আজ মদ খেতে ইচ্ছে করছে খুব, খাওয়াবি একটু।

বিকাশ বলল, সকালে আমিও শ্মশান থেকে ফিরেছি। কাল সারারাত শুধু মাল টেনেছি। আমাদের মধ্যে মলয় প্রথম চলে গেল। কিচ্ছু ভাল লাগছিল না। ভাবছিলাম দুপুরটা ঘুমাবো। বলছিস যখন চল্।

বিকাশ বড় একটা বোতল বার করল। হুইস্কীর বোতল। দুটো গেলাসে বেশ কিছুটা করে হুইস্কী ঢালল। গন্ধটা সারা ঘরে ছড়িয়ে গেল। একটা ধূপ জ্বেলে দিল বিকাশ। হুইস্কীর তিতকুটে স্বাদটা গলা দিয়ে পেটে নেমে যেতেই আগুনের হল্কা ছড়িয়ে গেল আনন্দর সারা শরীরে। দুজনে মিলে এক পেট হুইস্কী মেরে দিল।

বিকাশ মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে বীভৎস মজা লুটতে যায় কলকাতায়। সে বলে, বর্ধমান একটা গন্ডগ্রাম। এখানকার লোকে ধানটাই চাষ করতে জানে শুধু, আর কিছু নয়। পয়সা আছে বটে, তবে ঘোমটা দিয়ে খেমটা

নাচে। ঠিকমতো মজা লুটতে জানে না। আরে বাবা, এখন বিশ্বায়নের যুগে। সময়ের এখন প্রচুর দাম। ঠিক মধ্যে নাচতে নেমে ঘোমটা টানা, এসব সহ্য হয় ? বর্ধমান যেন এখন মধ্যযুগ পড়ে আছে। এখন গাছেরও খাব, তলারও খাব। ডুডুও খাব, তামাকও খাব। হাঁটি হাঁটি পা করে এগোলে চলবে না, দৌড়তে হবে।

আনন্দ বলল, তোর যদি মেয়েছেলে করবার দরকার হয় তবে কলকাতায় কেন ? আজকাল তো শুনছি ওসব বর্ধমানেই এভেলেবল।

——তুই বড্ড সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছিস আনন্দ। আমি জানি, তোর কাজেও ইমোশনাল স্ট্রেন হয়, একবার চ আমার সাথে কলকাতায় দেখবি এনার্জি কত ! শহর আর মফঃস্বলের অনেক তফাত রে, এসব তুই বুঝলি না ! জীবনটা উপভোগ কর, তবে তো বুঝবি।

——আমার ভাই ওসব বুঝে কাজ নেই। সাধু সন্তের লাইন পড়েই আছে। এদেশে এই ব্যবসাটা ভালই চালানো যায়। শুধু একটা গাছতলা দেখে ফেঁদে বসে পড়া। তাহলেই হল। আর নদীর ধার পেলে তো কথাই নেই ! তারপর ববম বোম, বোমকালী জপলেই ইনকাম দেখে কে ? লালে লাল। তোমার বেশও লাল, তুমিও লাল।

——সাধু হবি তুই ? ব্যাটা ধর্মের ভেক ধরে মাগীবাজী করবি ?

——আঃ। তুই আবার সিরিয়াস হয়ে পড়ছিস বিকাশ। তোর নেশা হয়ে গেছে।

বিকাশ বলে, এই তো কারখানাগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এখন দ্যাখ ! দু চাকা, চার চাকা কারখানার বান লেগে গেছে। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভটা একদিন ঘুরে আয়। নয়তো আমাদের জেলার দুর্গাপুরটাই না হয় দেখে আয় একদিন। মৃত নগরী এখন কী হয়েছে দেখবি। চোখে সরষে ফুল বুঝলি, চোখে সরষে ফুল দেখবি। আর দুর্গাপুর কেন যাব ? কলকাতা এখন কত কাছে। গাড়ি ছাড়তে যা দেরি হুউশ ! সেকেন্ড হুগলী ব্রিজ দিয়ে মাত্র দেড় ঘণ্টায় দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাওয়া। তারপর যা না যেখানে যাবি। ফাইভস্টার তো দূরের কথা একটা থ্রিস্টার রেস্টুরেন্ট নেই এই শহরে। শা.....গাঁ নয়তো কী বলব ? সন্ধ্যাবেলায় সব দৌড়য় নুকিয়ে নুকিয়ে বাইপাসের ধারে ধাবায় মাল খেতে। শালা, মাল খাবে তাও ছোলা নুন দিয়ে। নইলে পাঁপড় ভাজা ! ছ্যা ছ্যা ছ্যা ! বলে কিনা বর্ধমান বাড়ছে ! এই শহর বাড়ছে ! কি যে বলিস তোরা ? তুই তো দুবাই গিয়েছিলি, বল না দুবাইয়ে কি দেখে এসেছিস ?

বিকাশ আনন্দকে সাক্ষী মানতে চায়। হ্যা হ্যা করে হাসে। আনন্দ ওর সব কথাগুলো ফেলে দিতে পারে না। ওর টাকার কোনো মা বাপ নেই। অঢেল টাকা উপরি রোজগার করে, খরচটাও করে দ্বিগুণ। পুলিশে চাকরি করে বলে ম্যানেজ হয়ে যায়। তবে বাড়িতে অশান্তি হয়। মাল খাওয়া নিয়ে ওর বৌ অশান্তি করে। বিকাশ তাই বাড়িতে ওসব নিয়ে যায় না। যা খাওয়ার বাইরে থেকেই খেয়ে যায়। এই ঠেকটা ব্যবহার করে। বিকাশের চাকরিটা ওর পুলিশ শশুড় করে দিয়েছিল।

সারা দুপুর কখন কেটে গেছে। লোডশেডিং-এ ঘেমে নেয়ে একশা। জেনারেটারের আওয়াজে ঘুম ভাঙল ওদের। উঠতে হল, এদের জেনারেটর থাকে ছাদের ওপরে। দেখল সন্ধ্যে নেমে গেছে। সারাদিনটা শুয়েই কাটিয়ে দিল দুজনে। বোতলে তখনও খানিকটা হুইস্কী পড়ে ছিল। বিকাশ বলল, এটুকু রেখে আর কি হবে ? খেয়ে নে।

মলয়কে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মলয় বলেছিল, ভাই, আমাকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনিস। আমি এভাবে মরতে চাইনা। এখনো অনেক কাজ বাকি। বিপ্লব হবে না জানি তবু কিছু কাজ তো করতেই হবে। আমাকে ফিরিয়ে আনিস। বিকাশকে জড়িয়ে ধরে মলয়ের এই শেষ কথা।

একটা বড় চুমুকে গেলাসটা শেষ হতেই বিকাশকে প্রশ্ন করল আনন্দ, বাড়িতে তোর বউ নেই ?

বিকাশ ঘাড় নাড়ল, না।

—কোথায় গেছে ?

ও আবার ঘাড় নেড়েই বলল, জানে না।

আনন্দ এবার জানতে চাইল, মানে ?

বিকাশ বলল, মলয়ের ডেড বডি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে দেখি বউ নেই। হয়তো কোথাও গেছে।

—তোরা আমাকে মলয়ের মৃত্যুর খবরটা দিসনি কেন ? আনন্দ জানতে চাইল।

বিকাশ কোনো জবাব দিল না। চুপচাপ মদ খেতে লাগল। আনন্দ রেগে গেল। ওকে বলল, মানুষ কেন মরে জানিস ?

বিকাশ মাথা নেড়ে বলল, সে জানে না।

—কী জানিস না, জানিস না বলছিস তখন থেকে ?

আনন্দ রেগে যায় গেল। উত্তেজিত গলায় বলল, আরে বাবা মলয় তো আমারও বন্ধু ছিল ? ও মারা যেতে আমিও তো দুঃখ পেয়েছি। সকালে রবিদা গিয়ে বাড়িতে যখন হেল্প চাইলো, যা ছিল তাই তুলে দিয়েছি। জানিস ?

বিকাশ একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখল। দেখল ওর গেলাসটা খালি। তারপর খানিকটা হুইস্কী ঢেলে দিল চুপচাপ। আনন্দ ওকে বলল, করিস তো পুলিশে চাকরি। ঘুষের সঙ্গে বোতলও ফ্রী পাস। পয়সা দিয়ে তো মাল কিনতে হয় না। ফ্রীতে পাওয়া মাল একটু খেতে চেয়েছি বলে এত দেমাক দেখাচ্ছিস ? তুই এমন করছিস যেন..... ?

পি সি মিত্রের বাগান বাড়িটার আমড়া গাছের ফাঁক দিয়ে ওই সময় ইয়া বড় গোল থালার মতো চাঁদটা বেরিয়ে এল। এত বড় চাঁদ আগে কোনোদিন দেখেনি আনন্দ। চমকে গেল। ওকে বলল, দ্যাখ দ্যাখ চাঁদটা কি বড় হয়ে গেছে। শালা পৃথিবীর কাছে চলে এসেছে নাকি ? ধাক্কা মারবে ?

বিকাশ হাসল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আবছা লালচে হলুদ বিশাল একটা গোল নরম বলের মতো গর্ভিনী চাঁদটা ওপরে উঠছে। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার যেমন আস্তে আস্তে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে তেমনি। ওই চাঁদ দেখে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল ওর। বলল, ইস্, মলয়টা থাকলে একটা কবিতা লিখে ফেলতো নিশ্চিত।

যেমন লিখেছিল——

‘সমস্ত রাত্রি মদ্যপান করি
কুয়াশা ছিঁড়ে ধরি রাত্রিকে
খোয়াই থেকে ছুটে আসে শীত
বাতাস ফোটায় শালুক আর পদ্মকে
রাত সুন্দর হয়, নারী সুন্দর হয়,
পৃথিবীটা হয় আরো সুন্দর, আমি শুধু তোমাকে দেখি।’

বিকাশ বলল, জানিস তো আমার বাড়ির লোকে. ।বার মরা ছোঁয়া-টোঁয়া এসব খুব মানে। আলতার ছাপ দেওয়া, চন্দন পড়ানো——আমি আবার এসব একদম সহ্য করতে পারি না। ওদের কত রিকোয়েস্ট করলাম, এসব করবে না——প্লিজ। শুনল না। বউ বোধহয় গঙ্গা স্নান করতে গেছে।

মালটায় কি ছিল কে জানে, প্রথমে প্রচন্ড একটা হিক্কা, তারপরেই বমি উঠলো আনন্দর। শেষ পর্যন্ত আটকাতে পারল না। বমি করে ফেলল। বাথরুমে

যেতে গিয়ে নিজের বমিতেই পা পিছলে গেল ওর। পড়ল সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে। ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে দুর্যোধনদা বললেন, যা অবস্থা রাতটা আমার চেম্বারেই শুয়ে থাক। ছেলেটাকে বলে যাচ্ছি ব্যবস্থা করে দেবে।

শেষে মুখটুখ ধুয়ে বিকাশের ঠেক থেকে বাইরে এল,। পা জ্বলছে। দেখল বুড়ো আঙুলটা কেটে গেছে। রক্ত গড়াচ্ছে। রুমাল দিয়ে বাঁধল। রক্ত বন্ধ হল না তাও। ভাবল একবার বিকাশের কাছে ফিরে যাবে ? নাঃ। দুর্যোধনদার চেম্বারে গেল। ডাঃ দুর্যোধন সাহা দেখা গেল। আঙুল অনেকটা কেটেছে। সেলাই করতে হল। ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে দুর্যোধনদা বললেন, যা অবস্থা রাতটা আমার চেম্বারেই শুয়ে থাক। ছেলেটাকে বলে যাচ্ছি। রুগীরা সকলে বাড়ি চলে গেছে। দুর্যোধনদা ডাক্তারদের একটা অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, পার্টি আছে বলে তিনিও চলে গেলেন। তার চেম্বারের পাশের ঘরে এক্সরে ব্যবস্থা। এই ঘরে একটার পর একটা রুগী দেখেন দুর্যোধনদা, প্রেসক্রিপশন করেন। ভেজা এক্সরে-র প্লেটগুলো ফ্যানের নিচে দড়িতে ঝোলানো রয়েছে।

দুর্যোধনদার কমপাউন্ডার ছেলেটা আনন্দকে ভাল করেই চিনত। ভাল ব্যবস্থা করে দিল। মশা তাড়ানো ধূপ জ্বেলে দেওয়া, খাবার জল দেওয়া মায় বাথরুমে দু বালতি জল ঢেলে পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। সকাল সকাল এসে চা খাওযাবে, সেটাও বলে গেল। ভালই হল, আনন্দ আর বাড়ি ফিরল না। বাড়িতে সনাতনের শাসন শুনতে হতো। মা হয়তো টের পেয়ে যেতো। কিন্তু বাড়িতে একটা খবর দেওয়া দরকার ছিল। মা চিন্তা করবে। কম্পাউন্ডার ছেলেটাকে বলে দিলেও হতো। এই প্রথম আনন্দের মনে হল একটা মোবাইল থাকলে ভাল হতো। যাকগে, একটাই তো রাত ! ও ভাবতে ভাবতেই কেটে যাবে। ভাবনা ছেড়ে আনন্দ শুয়ে পড়ল।



দুর্যোধনদার রুগী দেখা বেঞ্চটাতেই শুয়ে কেটে গেল রাতটা।

পরদিন সকালে দুর্যোধনদার কম্পাউন্ডারের ডাকে ঘুম ভাঙল। আনন্দ ওর মুখে শুনল, ভোরে একটা বাড়ি থেকে একজন বিবাহিত মহিলাকে রেপ এবং মার্ডার করার অভিযোগে বিকাশকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। মহিলা মরে নি। যদিও বিকাশ নাকি তাকে মরা ভেবেই ছেড়ে দিয়েছিল। আর এখবরটা সঙ্গে সঙ্গেই রাতে থানায় গিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল মহিলার স্বামী।

—যাঃ শালা ! আজ সকালেও ফের খারাপ খবর শুনলাম। পৃথিবীটা কী হয়ে যাচ্ছে ? বিচ্ছিরী ! আনন্দ নিজের মনেই বলল।

বিকাশকে পুলিশে ধরেছে ? লে হালুয়া ! বিকাশ তো নিজেই পুলিশ। হারামজাদা বিকাশ। একটা লাথ খোর হেরো। বিকাশকে মনের সুখে গালি দিল আনন্দ। ব্যাটা আগ বাড়িয়ে লোকের উপকার করতে যাস। নিশ্চয় কিছু হয়েছিল। গিন্নীর কাছে ধাতানি খাবে, আবার সারারাত ধরে বউকে চটকাবে। তারপর ক্লান্ত হয়ে বউয়ের বুকেই শুয়ে পড়বে। এ তো পুরুষ মানুষ হয়ে গরু ছাগলের জীবন। ছ্যা ছ্যা ছ্যা ! তোদের গার্হস্থ জীবন দেখে বিয়েতে আমার ঘেন্না ধরে গেল ! ভাল করেছি শালা বিয়ে করিনি। নিজেকে সান্ত্বনা দিল আনন্দ। তারপর বাড়ি ফেরার পথে আবার পুরো ঘটনাটা শুনল।

বিকাশ মাল টাল খেয়ে বাড়ি ঢুকছিল। বাড়ি ঢোকার পথে ওদের উল্টোদিকের একটা বাড়িতে প্রায়ই ঝগড়া হয়। সেদিনও ঝগড়া শুনতে পেয়েছিল বিকাশ। স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া, রোজই হয়। তোর নাক গলানো কেন বাপু ? আসলে বউটার পরিত্রাহী চিৎকারে খানিকটা মজা পেয়েছিল বিকাশ। পুলিশ হলে কি হবে, নিজের বউকে তো শাসন করতে পারে না। পরের বউয়ের মার খাওয়া দেখতে সখ হয়েছিল। ভেবেছিল এই স্বামী পুঙ্গবটা অন্তত মানুষ। বউটাকে আচ্ছা করে পেটাতে পারে। মনে মনে খুশি হয়ে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ঝগড়াটা শুনছিল। আর মনে মনে বলছিল, মার, শালা আরও মার। মেরে একেবারে চামড়া তুলে নে মাগীর।

ওর অনুভবটা ছিল এমনিই যেন পারলে নিজেও গিয়ে দু ঘা লাগিয়ে দেয়। পকেটে বোতল ছিল। উত্তেজনায় আরো দু ঢোক টেনে নিয়েছিল। তারপর যেমন ভাবা তেমন কাজ। ঢুকে পড়েছিল ওই বাড়িতে।

—তবে রে, স্বামীর মুখের ওপর কথা ! বলে বউটার ওপর চড়াও হতে চেয়েছিল বিকাশ। কিন্তু বউটার চেহারা দেখে কেমন মিইয়ে গিয়েছিল। কী চেহারা মাইরী ! একেবারে মাধুরী দিক্ষীত, থুড়ি নেনে ! বউটাকে দেখে ওর নিজের মাথাটাই ঘুরে গিয়েছিল। ওর মারের হাত থেকে বাঁচতে মহিলা পালাতে চেয়েছিল। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লাগে। অজ্ঞান হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। ভয়ে ওর স্বামী থানায় গিয়ে অভিযোগ করে। তারপর পুলিশ আসে।

বিকাশ নেশা করেছিল। যারা এসেছিল, তারাই ওকে তুলে নিয়ে যায়।

পাড়ায় রটে যায়, ও অ্যারেস্ট হয়েছে। আরে বাবা পুলিশ কখনও পুলিশকে অ্যারেস্ট করে ?

কিন্তু আই সি ছিল বড্ড টেঁটিয়া। বিকাশের নামে কেস দিয়ে দিল। বিকাশের গায়ে পুলিশের পোষাক ছিল, পেটে মাল পাওয়া গেছে। বংশ দন্ড হয়ে গেল ওর। আসলে কপাল খারাপ থাকলে যা হয় !

রবিদার কাছে গেল আনন্দ। রবিদা বললেন, যুদ্ধ থেকেই লোভ আর হিংসার শুরু বুঝলি। মানুষ যতদিন লোভ হিংসা মারামারি করে ততদিন যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না। যখন সে ঐক্যবদ্ধ হয় তখনই যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। যুদ্ধ হচ্ছে ভীষণ লাভজনক একটা ব্যবসা।

—কী বলতে চাইছেন আপনি ?

—বুঝতে পারছিস না ? দ্যাখ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নীট ফল হল আমেরিকার অর্থনীতির ফুলে ফেঁপে ওঠা।

—তা একদিকে ঠিকই বলছেন।

—আর এখন দ্যাখ, আফগান যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ। তাও আমেরিকার অর্থনীতিকেই চাঙ্গা করার জন্য। গোটা বিশ্বে আফিম নিয়ে যে ব্যবসা চলছে তা কত টাকার জানিস ? তিরিশ বিলিয়ন ডলার। এর একুশ বিলিয়নই আফগানিস্থান কন্ট্রোল করে। সারা বিশ্বের সত্তর শতাংশ আফিম বাজার আফগানিস্থানের দখলে। ওই দেশটা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ও দেশটা যার হবে, আফিমের ওই বাজারটাও হবে তার। সুতরাং আফগানিস্থান দেশটা দখল করতে হবে। একই রকমভাবে ইরাক দখল হলে তার তেলটাও দখল হবে।

—বলছেন বটে, কিন্তু ইকোয়েশনটা কি এতই সহজ ?

—সহজ ! খুব সহজ ! আবার দ্যাখ যুদ্ধ সব সময় গোলা বারুদ দিয়ে হয় না। পলাশীর যুদ্ধে কী হয়েছিল ? সিরাজের অত সেনা দেশপ্রেমে টগবগ করে ফুটছে, লড়াই করলে মেদিনী কেঁপে যাবে। কিন্তু ওদেরকে নিস্তেজ করে দেওয়া হল, যুদ্ধক্ষেত্রে চুপচাপ ওরা দাঁড়িয়ে রইল। যারা দেশপ্রেম দেখাতে গেল মরল। তারপর দেশটা দখল হল। দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যরা পুরস্কার পেল। একই দৃশ্য আমরা আফগানিস্থানে দেখছি, ইরাকে দেখলাম। এটাও কী কম বড় যুদ্ধ ?

—নিশ্চয়ই এটাও বিশাল যুদ্ধ। এই তো কিছুদিন আগে, ঘরের মধ্যে

বসে বসে দেখলাম মিশাইল, স্কাড কত কি ক্ষেপনাস্ত্রের গুঁতো গুঁতি। মিশাইল মিশাইলে ঠোকাঠুকি যেন বাজি পটকা ফাটছে। ঘরে বসে দেখছি আর হাতে তালি দিচ্ছি। এ যেন ঘরের মাঠে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের রোভার্স ফাইনাল হচ্ছে। তারপর ধর ওই ঘরের মধ্যে ধূপ ধুনো জ্বেলে রামায়ণ দেখলাম, মহাভারত দেখলাম। তারপর বাবরি মসজিদটাকে ভেঙ্গে দেওয়া হল। নিরামিষ প্রতিক্রিয়ায় উদ্বেল হল গোটা দেশ সেও তো দেখলাম ঘরে বসেই।

——রাম ইটের বানে ভাসিয়ে দেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হল। সেটা বল ?

——হ্যাঁ। ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া এখন ভারত। ভারতবর্ষ নয়। একটা গ্রেটার ভাবনা না, শুধু একটা দেশ !

——খেয়াল করেছিস আনন্দ, সাঁওতাল মেয়েরা এখন শুধু জামা পড়ে না। ওরাও আজকাল ব্রা, ব্রেসিয়ার ব্যবহার করে।

——আরে সেইজন্যই তো তিন তিনটে বিশ্বসুন্দরী, ব্রহ্মান্ডসুন্দরীর বান বয়ে গেল দেশে।

——বিজ্ঞাপনী মোড়কে লোভনীয় অফারের হাতছানি দিয়ে সুন্দরী রূপসী মিতবাস পড়ে শপিং মলের চলন্ত সিঁড়ি থেকে উড়ন্ত চুমু ছুঁড়ে দিচ্ছে। বলছে, চেনো কি আমায় ? দ্যাখ আমি বিপ্, আমি অ্যাশ, আমি সুস্মিতা ! স্পর্শ করে দ্যাখ আমায়। কার সাধ্য একে অস্বীকার করে ?

বংশীর দোকান থেকে কথা বলতে বলতে বের হল আনন্দ রবিদার সাথে। দুজনে এসে দাঁড়াল বিজয় তোরণের নিচে। মলয় চলে যাবার পর এই প্রথম দুজনে অনেকক্ষণ একসঙ্গে সময় কাটাল। রবিদা বললেন, এই যে তুই মলয়ের এত কথা ভাবছিস, এইজন্যই তুই অন্যদের থেকে আলাদা, তুই লেখক হতে পারবি। তোর যোগ্যতা আছে, তোর কলম হয়তো এই দুঃখে কেঁদে কেঁদে একটা ভাল উপন্যাস লিখে ফেলবে। আমি বলছি, তুই লেখ আনন্দ ! তুই লিখে যা !

আনন্দ হেসে বলল, রবিদা লেখক হওয়া এখন চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। ভেবেচিন্তে প্লট সাজাতে অনেক হ্যাপা। শুধু লিখলেই হবে না, আবার লবি করতে হবে। তিরিশ বছর ধরে লিখছি। কলকাতার কাগজেই বেশি লেখা প্রকাশ হয়েছে। কলেজ স্ট্রিট থেকে বইও বের হয়েছে বেশ কয়েকটা। শেষ দুটো উপন্যাস দে'জ থেকে প্রকাশ হয়েছে। তবু লেখক হতে পারলাম কই ? এক বান্ধবীর কাছে সেদিন জানতে চেয়েছিলাম, তোমার কেমন লাগে আমার লেখা ? কি বলেছিল জান ?

—কি ?

—বলেছিল, আপনার লেখার কোনো মাথামুন্ডু নেই। কি যে লেখেন ছাই পাঁশ বুঝিনা।

—তোর সব বইই তো পাবলিশাররা ছাপে। বিক্রি হয় নিশ্চয়।

—হয় হয়তো।

—নইলে ছাপবে কেন ? রয়েলটি পাস নিশ্চয় অনেক টাকা ?

—হাসলে দেখছি। বাংলায় লিখে কজন লেখক অর্থবান হয়েছে দেখাতে পার ? সকলেই কিছু না কিছু করেছে তাই দুটো খেতে পেয়েছে। নইলে.....।

—কিভাবে প্লট বাঁধিস বল তো ?

—সে কী আর কিছু ভেবে চিন্তে হয় ? লিখতে লিখতে হয়ে যায়। প্রথমে দু চার জনকে পড়াই। কেউ ভাল বলে, কেউ মন্দ। তারপর ওদের মতামতের ওপর লেখাটা অ্যাকসেস করি।

—আমাকে তোর একটা লেখা পড়াবি তো ?

—বেশ। তুমি কি আমার লেখার প্রথম পাঠক হবার কথা বলছ ?

—প্রথম পাঠক ? সেটা আবার কী ?

—ওই যে বললাম। প্রথম পড়াব। তোমার মতামতের ওপর লেখাটা তৈরি হবে।

—ও বাবা, অত ঝাক্কিপারব না। তাহলে তোর একটা বই পড়াস। আচ্ছা পাবলিশাররা কি টাকা কড়ি একেবারেই দেয় না ?

—দেয় কিছু কিছু। ওরা তো বলে, আপনার লেখার হাতটা ভাল। উপন্যাস ধরুন। ভূতের গল্প লিখুন। কেউ রহস্য রোমাঞ্চ গল্প চায়। এত কিছু লেখার মতো আমার নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস জন্মায়নি। বিভূতিভূষণ বলেছেন, আত্মপ্রত্যয় লেখকের একটা বড় পুঁজি। কিন্তু আমার পুঁজির ভাঁড়ার সামান্য তবে একেবারে শূণ্য নয়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'সাহারা' পড়ে বলেছিলেন, তুমি তো দারুণ কবিতা লিখেছ ? তুমি খুব ভালো লেখ। ফোন তুলে একজনকে বলেও দিয়েছি, তোমার কাগজে একে লিখতে বল। ওই পত্রিকার পুজো সংখ্যায় আমি লিখেছি। এইসব মতামত আমাকে স্বর্গীয় সুধা পান করায় রবিদা। তবে তোমার মতো উৎসাহ কেউ দেয়নি। তোমাকে আমার বই দেব। তোমার কথা ভুলব না।

—আনন্দ পারবি পারবি। তোর হবে। আজকাল কেউ কারো কথা

শুনতেই চায় না। তুই তো শুধু ভাবিস ! রবিদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপা দিলেন। তারপর বললেন, কেউ ভেবেছিল ? এই যে এই বয়সে বাবা কাশী চলে গেলেন। মা চলে গেলেন বৃন্দাবনে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দুজনে দুজনার কাউকেই সহ্য করতে পারলেন না। নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে পাড়ি দিলেন দুজনে দু জায়গায়। একবারও ভাবলেন না আমি কিভাবে খরচা যোগাব। এখন দুই দেবতার পদপ্রান্তে দুজন দুবেলা আছাড় খাচ্ছেন আর নিজেদের জীবনটাকে বিফল করে দেবার জন্য একজন অন্যজনকে শাপ শাপান্ত করছেন। ফিরে আসতে বলছি, ফিরেও আসবে না। ভাল লাগে বল ? দুজনকে আলাদা করে মাসে মাসে টাকা পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব ? তুই বল ?

রুমালে চোখ মুছতে মুছতে রবিদা চলে গেলেন। বাড়ি ভাড়ার টাকায় সংসার চালাতে হয় রবিদাকে। বাড়িতে লোক কম নয়। তাই চলে যায় কোনওরকমে। বীথিও এখন শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছে। মলয়ের জন্য যে টাকাটা রবিদা নিয়েছিলেন, আনন্দ বুঝতে পারল কেন সেটা ওর স্ত্রীর কাছে পৌঁছায় নি। আনন্দ বুঝতে পারল, এমনি করে তার চারপাশের চেনা জগৎটা একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের ঢেউ এখন যৌথ পরিবার নয়, ছোট ছোট পরিবারগুলোকে ভেঙ্গে একশা করে দিচ্ছে।

আনন্দ বাড়ি ফিরে দেখল টেবিলের ওপর একটা ভারী খাম পড়ে আছে। আঁকা বাঁকা অক্ষরে খুব দ্রুত হাতে লেখা ওর নাম ঠিকানা। কে লিখেছে ? খামটা খুবই পুরনো। তাতে পোস্ট অফিসের নতুন স্ট্যাম্প সাঁটা। কে ওকে চিঠি দিল ? আজকাল কেউ তো চিঠি লেখে না, এস এম এস করে। খামটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল।

সনাতন চা দিতে এল। বলল, দুপুরের ডাকে পিওন দিয়ে গেছে। কোনো চাকরির চিঠি কী ?

সনাতনের ধারণা ওর পুরনো কোম্পানি আবার ওকে ডাকবে। হাতে খামটা দেখে জানতে চাইল, কী ব্যাপার এখনও খোলো নি ?

আনন্দ বলল, ভাবছি, কে চিঠিটা লিখল ?

—দেখ তোমার পুরনো অফিস হবে হয়তো। বলে, সনাতন চলে গেল।

অফিসের চিঠি নয়। গরম চায়ে চুমুক দিল আনন্দ। হাতের লেখাটা চিনতে

পারল না। স্ট্যাম্পটা কোথাকার বুঝতে চেষ্টা করল। অস্পষ্ট। পারল না। বীথির সঙ্গে দেখা করে নি। তাহলে বীথি কী ? খামটা না খুলে ভাবতে বসল আনন্দ।



বিকাশ যাকে স্বামী-স্ত্রী-র ঝামেলা বলে ভেবেছিল, তা আসলে ছিল একই পরিবারের দেওর-বৌদীর মামলা। জামতলার বাজারের পূব দিকে রেলের রিপিটার স্টেসনের পিছনে একটা শিবমন্দির আছে। মেয়েরা সেখানে শিবরাত্রি বা পুজো পার্বনে শিবের মাথায় জল ঢালে। কম বয়সী একজন সন্ন্যাসী কিছুদিন ধরে ডেরা বেঁধেছিল সেখানে। সন্ধ্যায় মদ আর গাঁজার আড্ডা বসতো সবাই জানতো সে কথা। তবুও কিছু হতো না যদি না ওই নিঃসন্তান মহিলা প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেড় দু-ঘণ্টা জপ করতে যেত ওই সন্ন্যাসীর কাছে। এই নিয়ে ওই পরিবারে একটা অশান্তি চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। সেদিন একেবারে তুলকালাম হয়।

মহিলার দেওর সবার সামনে মন্দিরে গিয়ে মহিলার চড় মারে। তারপর সন্ন্যাসীর ওপর চড়াও হতে যায়। সন্ন্যাসী পাঁচিল টপকে উধাও হয়। বীর দেওর তখন মহিলার চুল ধরে টানতে টানতে মন্দির থেকে বের করে আনে। মহিলার স্বামীর রোজগারপাতি ভাল নয়। বউয়ের কর্মকান্ড সে মুখ বুজে সহ্য করে। কিন্তু দেওরটি বেজায় ঢেঁটা। আসলে দেওরের রোজগার ভাল। তার একটা বাস আছে। বসে বসে তার রোজগার। তার রোজগারেই সংসারটা চলে। সে কেন সহ্য করবে পরিবারের এই কলঙ্কের ঘটনা ? তার গলায় সোনার মোটা চেন দোলে। পাড়ার মান্যিগন্যি মানুষ সে। পুজো কমিটির সেক্রেটারী। পরিবারের প্রেসটিজ রাখতে তাই সে সবার সামনে গাঁজরে শিবের মন্দির থেকে মহিলাকে তুলে আনে। পাড়ার সবাই সে দৃশ্য তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছে। সবাই দেখেছে শাসন করতে করতে সে তার বৌদিকে মারুতি ভ্যানে চাপিয়ে বাড়ি ফিরছে। গাড়িতে তখন মহিলা মুখ ঢেকে অত্যন্ত জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। পাড়ার লোকেরা শুনেছে গুণধর দেওরটি তখন ঈষৎ নাকি সুরে জড়ানো গলায় সাধের বৌদিকে গলা জড়িয়ে বলছিল, বিয়ে করলেই কেউ ব্যাটাছেলে হয় না। বুঝলে ? তার জন্য মুরোদ চাই মুরোদ। আমার মতো মুরোদ। নিজের কব্জি ঘুরিয়ে সে তার বৌদীকে বোঝাচ্ছিল ব্যাপারটা।

পাড়ার কেউ কেউ নাকি সে সময় রুমালে মুখ ঢেকে ফিক ফিক করে

হেসেছিল। বলেছিল, এইজন্যই তুমি বাপু বিয়ে করনি, আমরা বুঝতে পারছি।

জানা গেল সেই ঘটনার পর থেকে সন্ন্যাসীকে পাড়ার আর কোথাও কেউ দেখতে পায় নি। আর ওদিকে বিকাশের উপর্যুপরি রেপ এবং খুনের কেস বলে যা শোনা গিয়েছিল তা একেবারেই সত্যি নয়। ওর ডিপার্টমেন্টের লোকেরা চুপচাপ ওকে হেল্প করল। শুধু দিন সাতেক পর খবরটা একটু ছোট করে বেরিয়ে গিয়েছিল 'একদিন প্রতিদিন'এ। বিকাশ চাকরি থেকে তাই সাসপেন্ড হয়েছিল কয়েকদিনের জন্য।

বিকাশকে সাকুল্যে এক রাত মাত্র থানার হাজতে থাকতে হয়েছিল। সে রাতে ও সারা রাত শুতে পারে নি, জেগে ছিল। ভোরবেলায় আধো ঘুমে বিকাশ স্বপ্নে তার বাবাকে দেখতে পেয়েছিল। সে দেখেছিল, তার মৃত বাবা সরু সরু আঙুল দিয়ে তার মাথার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। ঈষৎ পাতলা হয়ে যাওয়া তার মাথার চুলগুলো সেই আরাম পেয়ে খিলখিল করে হাসছিল। বিকাশের বাবা তাকে বলছিল, ট্রাই বিকাশ ট্রাই। এই পচা গলা সমাজটাকে পাল্টাতে হবে। আমি একজন হেরে যাওয়া মানুষ। আমার ছেলে হয়ে তোর উচিত লড়াইটা চালিয়ে যাওয়া। তুই পুলিশের উর্দি পেয়েছিস। এই উর্দির বিরাট সম্মান আছে। হোক না তোর শ্বশুর চাকরিটা করে দিয়েছে। সবাই এই সুযোগ পায় না রে। সুযোগটাকে কাজে লাগা। ট্রাই বিকাশ ট্রাই....।

বাবার এই দৈববাণীতে বিকাশ উৎসাহিত হয়। প্রায় ত্রিশ বছর আগে বিকাশের মা ওর কাকার সাথে পালিয়ে গিয়েছিল জামাডোবায়। ওর কাকা সেখানে কোলিয়ারীতে কাজ করতো। ওর বাবা তারপর নিজের সার্ভিস পিস্তলে আত্মঘাতী হয়েছিল। বাবা মারা যাওয়ায় বিকাশ চাকরি পায় কনস্টেবলের। ওর শ্বশুর তখন ছিল ভাবীশ্বশুর, ভদ্রলোক হেল্প করেছিল। যে মহিলার জন্য বিকাশের এত হেনস্থা, সে আসলে বাঁজা নয়। জানা গেল, আসলে গন্ডগোলটা ছিল তার স্বামীর।

এক সপ্তাহের মধ্যে পাড়ায় দু দুটো ঘটনা ঘটে গেল। মলয়ের মৃত্যু, বিকাশের অ্যারেস্ট হওয়া। বিকাশের অ্যারেস্ট হওয়া এখন মিডিয়ার মুচমুচে খবর। একটা মিডিয়া আবার খবর করে দিল নন্দীগ্রামে প্রশাসনের ভূমিকায় হতাশ হয়ে মলয় আত্মহত্যা করেছে। আর একটা মিডিয়া খবর করলো পুলিশে দুর্নীতি তো আছেই চরিত্র বলেও কিছু নেই। দুটো পরিবারের সামনে কালো পর্দা যাকে বলে যবনিকা পতন। কেউ যেন কালো পর্দা টাঙিয়ে দিল সব সময়ের

জন্য। সবাই বলাবলি করছে, এ পাড়ায় নাকি একজন মারা গেলে আরো একজন মারা যায়। বিকাশ বলল, দেখ, এবার কার পালা ?

এই নিয়ে সবাই জল্পনা কল্পনা করে।

মলয়ের পরিবারে এখন দুটি মাত্র প্রাণী। ওর বউ আর মেয়ে। মলয় এমনিতে পাড়ার লোকের সঙ্গে কথাবার্তা তেমন বলতো না। রেডিও সিলোন আর বিনাকা গীতমালা ওর একসময়ের খুব ফেভারিট অনুষ্ঠান ছিল। রফি, মহেন্দ্রকাপুর, মুকেশ, এবং কিশোরের দুঃখের গানগুলো শোনাবার জন্য ও বিনাকা গীতমালায় অনুরোধ জানাতো। আর ঠিকানায় লিখতো, 'ঝুমরি তিলাইয়া সে মনোজকুমার'। ঝাড়খন্ডের ঝুমরিতিলাইয়া-তে মলয় কোনোদিন যায়নি। পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা ঝুমরিতিলাইয়া ছিল ওর স্বপ্নের জায়গা। এই নামে একটা উপন্যাস পড়ে ওর খুব ভাল লেগেছিল। সেই থেকে নামটা ওর বুকে বাসা বেঁধেছিল। রেডিও সিলোনে ওর নাম উচ্চারিত হতো প্রায় প্রতিদিন। ওর নাম উচ্চারিত হলে ও যত খুশী হতো, আমাদেরও ভাল লাগতো। আগে থেকে ও বলে দিতে পারতো, কবে কখন ওর নাম বলবে, অনুষ্ঠানের সংচালক আমীন সাহানি। 'মেরা জীবন কোরা কাগজ' কিশোরের এই গান বন্ধুদের যে কতবার শুনিয়েছে! সে সব কতদিন আগের কথা। মাঝে মধ্যে অল্প নেশা, লিটল ম্যাগাজিনে লেখালেখি এই নিয়ে শান্ত প্রকৃতির মলয় চুপচাপ থাকতো। তার যে ভেতরে ভেতরে এমন একটা ক্ষয় চলছিল, কাউকে টের পেতে দেয় নি। কারোর কল্পনায় ছিল না এই বয়সে ও চলে যাবে।

শুধু একটা চিরকুট পাওয়া গেল ওর বালিশের তলা থেকে।

——রবিদা পারলে এদের দেখবেন। বাজারে হরিপদবাবুকে দুধের জন্য একশ তিরিশ টাকা দিতে পারিনি। আনন্দ-কে বলবেন, ওর তো অনেক টাকা। ও যেন টাকাটা দিয়ে দেয়। মলয় আরো লিখেছিল——আমার মেয়ের ওপর আমার পুরো কনফিডেন্স আছে। ও ঠিক সামলে নেবে। একটু সময় লাগবে।.....লাগুক। কোনো কারণ নেই। মাঝে মাঝে নিজেকে কেমন গিল্টি মনে হয়। বাবা বলেই হয়তো। বাবা না হলেই বোধহয় ভাল ছিল। কিন্তু লেলিন——স্তালিন——মাও এঁরাও তো সকলেই বিয়ে করেছিলেন। বাবা হয়েছিলেন। ওঁদের গার্হস্থ জীবন কঠোর সংগ্রামের মধ্যেও তো কোথাও এতটুকু টাল খায়নি। তবে ?

ব্যাস! মলয়ও চলে গেল।



আশ্বিন এসে গেছে। শরৎ-এর নীল আকাশে সাদা পায়রার মতো উড়ে বেড়াচ্ছে মেঘের দল। চারদিকে ফুটফুটে রোদউজ্জ্বল আগামী শস্যের স্বপ্ন ভেসে আসছে। গাছে গাছে পাখিদের কিচির মিচির, তারাও টের পেয়ে গেছে শরৎ এসেছে। বাতাসে ভাসছে শিউলির গন্ধ। যে কোনো মৃত্যুই দুঃখের। কিন্তু সেই দুঃখও সয়ে যায়। মলয় আমাদের মধ্যে ছিল, আজ নেই। ওর অনুপস্থিতিও ধীরে ধীরে সয়ে গেল যেমন হয় আর কি। এরই মধ্যে জানা গেল বীথির পণ প্রথার বিরোধী স্বামী বিয়ের এতদিন পর মনে করেছে শ্বশুরের টাকায় একটা মোটর সাইকেল হলে ভাল হয়। সে ওটা কিনে দেবার জন্য চাপ দিচ্ছে। রবিদা বীতশ্রদ্ধ। বীথিও নাকি ডিভোর্স চাইছে তার কাছ থেকে। একটা ছেলেও আছে ওদের। আশ্চর্য! চারদিকে একটা অসহিষ্ণু পরিবেশ। কেউ কারো প্রতি একটুও সহমর্মি নয়।

এখন বোঝা যায় মলয় স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিল, চলে যাবে। ও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল, ওর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে শমন? অ্যাত পড়াশোনা করে কী হল? পৃথিবীর কোন কোন বিষয়ে ওর উৎসাহ ছিল না, সেটাই আমাদের কেউ জানে না। আশ্চর্য! মলয় আমাদের চমকে দিয়ে জীবনটার গালে একটা কষে থাপ্পড় মেরে চলে গেল।

মলয়ের অসুস্থ হওয়া, মারা যাওয়া, শ্মশান কোনো জায়গাতেই আনন্দ উপস্থিত নেই। কিন্তু মলয় ওকে ছেড়ে যায় নি। ও চলে গেছে, কিন্তু ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়ে গেছে। ও আনন্দর বন্ধু? একটা রাগ, একটা অভিমান আনন্দর মধ্যে তৈরি হল। আর বিকাশ? বিকাশের তো বউ ছিল। তবু পরের বউ দেখে হামলে পড়ল কেন? ওর বউ একটু মুখরা বটে, একটু মোটাসোটা তবু দেখতে ভাল। কথায় কথায় বাপের বাড়ি চলে যাওয়া অভ্যেস।

জানা গেল সেই বিকাশের একজন মেয়ে বন্ধু আছে। সে রোজ থানায় বা কোর্টে যেদিন যেখানে ডেট পড়েছে গিয়ে হত্যে দিয়েছে। ওর সাথে শুধু একবার দেখা করতে চেয়েছে। বিকাশের উকিলের পায়ে ধরেছে, অনুরোধ করেছে মামলা ভাল করে লড়বার জন্য। তার শাড়ি গয়না যেটুকু আছে তা বিক্রি করে টাকা এনে দিয়েছে। শেষমেষ বিকাশের জামিন হল। খুন তো নয়, যার জন্য জেল হাজত সেই মহিলাই ব্যবস্থা করে দিল। শুধু সেই মহিলা নয়, তার গুণধর

দেওরটিও। আসলে ওই মহিলা নিয়মিত ওই মন্দিরে গাঁজা সাপ্লাই দিতে যেত। আর তার বিখ্যাত দেওরটি হল ওই ব্যবসার আসল কারবারি। ওরা পুলিশ প্রশাসন সব ম্যানেজ করে ফেলল। কেসটা উইথড্র হল বিকাশও খালাস পেল। এইসব লোকেদের হাতের মুঠোয় এখন গোটা দুনিয়া। পাড়ার এইসব তথ্য নিয়ে নানা মুখরোচক গল্প তৈরি হতে লাগল। আর বিকাশের সমস্যা হল, বিকাশের বউ ওকে ঘরে ঢুকতে দেয় না।

বিকাশ যে রাতে ধরা পড়ে আনন্দ যে ওর সাথে সারাদিন ছিল কাউকে বলেনি। বিকাশের বউ বাড়িতে না থাকায় কারোর সেটা জানা সম্ভবও ছিল না। তাই কেউ জানতেও পারে নি। অবশ্য কেউ জিজ্ঞেস করলে আনন্দও হয়তো স্বীকার করত না। হয়তো বলত, না। ওর সঙ্গে আমার মোটেও দেখা হয় নি।

সবার সেই এক কথা। মলয়টা মারা গেল, বিকাশ খামখা জেলে গেল। বিকাশের জেলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। পাড়াটার আর কিছু বাকি রইল না। শুধু রবিদা বললেন, এসব কান্ডগুলো আর কিছুদিন পরে ঘটলেই ভাল হত। সামনে পুজো। আসছে। সবাই আনন্দ করবে তা নয়!

আলোক বলল, পুজোর পর ওর একটা হিল্লে হয়ে যাচ্ছে। একটা সংস্থায় ঢুকবে ঠিক হয়ে গেছে। 'এনজিও' যাদের কাজ হল অসহায় গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়ানো।

মুক্ত বিহঙ্গ বিকাশ খি খি করে খুব আওয়াজ দিল। বলল, তার চেয়ে চ মাইরি দুজনে গেরুয়া ধারণ করে বেম্মচারী বনে যাই। বলে কিনা গরিব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবে। গরিব মানুষের কল্যাণ বলে বলে অনেক তো মাড়ুক্কল হল! নিজেদের পেটগুলো অ্যাত মোটা হয়েছে যে এবার ফেটে যাবার উপক্রম! শালা, কত হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল।

আলোক বলল, তোদের শালা কোনো কিচ্ছু হবে না। তোদের সব পেছনে ঘা। মাছি ভনভন করে। আজকাল দেশে কত এনজিও হয়েছে তার খবর রাখিস? তারা দেশসেবাও করে আবার নিজেদের কাজটাও করে।

——নিজেদের কাজ! সেটাই আসল বল। ওই যে একটা ইউনিটি সেন্টার নামে একটা পার্টি আছে ওইরকম? বিদেশ থেকে টাকা পায়। ওই টাকায় সমাজ সেবা, দেশ সেবার নাম করে নিজেদের সেবা করে যায়। বলে বিকাশ আবার হা হা করে হাসতে লাগল।

——তোর পাছায় জোড়া পায়ে লাথি। বলে আলোক বিকাশের পিছনে ছুটল।

রবিদা ওদের থামালেন। বললেন, ভাল করে শোন না আলোক কি বলতে চাইছে। ব্যাপারটা বুঝি !

আলোক বলল, তোরা তো আমাকে বলতেই দিচ্ছিস না।

——নে এবার বল। রবিদা সকলকে চুপ করতে বললেন।

আলোক বলতে শুরু করল, দ্যাখ, আমার চাহিদা বলতে সামান্য। এই কাজটা ভাল লাগলে অনেক উঁচুতে ওঠার স্কোপ পাব। সারা ভারতে এদের শাখা ছড়িয়ে আছে। অন্যান্য প্রদেশে বা দিল্লীতেও এরা পাঠাতে পারে আমাকে। আপাতত এরা মিউনিসিপ্যাল অফিসের পাশে 'কৃষ্টি' কমপ্লেক্সে একটা বাড়ি নিয়ে অফিস করেছে।

——তাতে কী হয়েছে ? তোকে ওই অফিসের ম্যানেজার করে দিয়েছে ? পঁচিশ হাজার তংখা ?

——দ্যাখ আনন্দ তুই-ও আমার সাথে ইয়ার্কি মারছিস ?

——আরে দূর দূর ! এত ছিচ কাঁদুনে হলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। বিপ্লবী হতে গেলে.....।

——আমি তোদের মত নই। সেটা তোরা ভাল করেই জানিস ?

——জানি। কিন্তু তুই এই কুমিরডাঙ্গা খেলা আর কতদিন খেলবি ?

——মানে ?

——মানে, তোর সেই মেয়েটার খবর বল ?

——আমি বলছিলাম,.....কি একটা বলছিলাম ! ধ্যা ?.....মনে পড়ছে না। এই.....এই যে.....কি বিরক্ত যে লাগে ! সরি, মনে পড়ছে না। ভুলে গেছি।

আলোক ভুলে গিয়েছিল প্রসঙ্গটা। নাগরিক জীবনের চাপে রোজ কত কি ভুলে যাই আমরা। ফোন নম্বর থেকে মানুষের মুখ পর্যন্ত। এত চাপ আমাদের রোজকার জীবনের। মানুষ কি ক্রমশ তার স্মৃতির উপর দখল হারিয়ে ফেলছে ? নইলে অতীতে মানুষ, বেদ বেদান্ত শুনে মনে রাখতো আর এখন প্রিয় বন্ধুর ফোন নম্বরটা পর্যন্ত মনে রাখতে পারেনা কেন ?

খামটা ছিঁড়ল আনন্দ। ওর ভেতর থেকে প্রায় দশ পাতা একটা লেখা বের হল। এটা কি চিঠি ? শেষ পাতাটায় উল্টে দেখল কারো স্বাক্ষর নেই। চিঠি যেভাবে শেষ হয় সেভাবেও শেষ হয় নি। শুরুটাও তাই। আনন্দ দ্রুত পড়তে শুরু করল।

"চোদ্দ বছর পর গ্রামে ফিরছিলাম। যে গ্রামকে নিয়ে কত কবিতা লিখেছি ;

'আইরি গাছের সবুজ পাতায়
হলুদ গাছের ডোর
শুকতারা আর আকন্দ গাছে
মোরগ ডাকা ভোর'।

রান্নাঘরের চালে ঝাঁকানো লাউগাছটা এখনও কী আছে? পুকুরঘাটে বহুদিনের ক্ষয়ে যাওয়া কাঠের টুকরোটা? এমনি একটা স্বপ্নের মোহ আমাকে টানছিল, ঘড়ির সুতোর মতো। আনন্দ আমি ভাবতে পারছিলাম না, চোদ্দ বছর আগে এই গ্রামকে ছেড়ে আমি চলে এসেছি, চলে এসেছি এখানকার বন্ধ্যা মাটিকে ধিক্কার জানিয়ে।

তোরা জানিস মেদিনীপুর বীর শহীদদের মাটি। কিন্তু আমি দেখেছি, নন্দীগ্রামের মাটিতে ঘাস জন্মায় না। শখে অভ্যেসে এখানকার মানুষ চাষ করে। এখানে একটাও শ্যালো টিউবওয়েল নেই। মাটির তলায় জল নেমে গেছে অনেক গভীরে, হয়তো সেখানে পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্রআছে। সেখান থেকে কোনো শ্যালো বা সাব-মার্সিবল জল তুলতে পারে না। চেষ্টা করতে গেলে হয়তো পৃথিবীর প্রাণবায়ুটাই বেরিয়ে আসবে।

হলদি নামে এখানে একটা নদী আছে। তাতে মাত্র তিন মাস মিষ্টি জল থাকে, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন। বাকি ন'মাস নোনা জল, যে জলে চাষ করা যায় না। চাষ বলতে বছরে একবার আমন। আর হয় খেশারি কলাই। ওটা চাষ করতে বেশি জল লাগে না। গরিব লোকেরা খুব খায়। যদিও ওটা শরীরে ক্ষতি করে। দেশের সরকার আইন করেছে খেশারি চাষ করা যাবে না। কিন্তু নন্দীগ্রামের মানুষকে সেকথা কে বোঝাবে?

হত দরিদ্র মুসলমান এবং তপশীল মানুষেরা এখানে একসাথে বাস করে চারপাশে। মিলেমিশে থাকে সকলে। যারা সামান্য লেখাপড়া শিখেছে, সবাই বাইরে চলে গেছে। এখানকার বহু মানুষ জাহাজের খালাসী হয়ে দেশ বিদেশে ঘুরছে। ওইরকম এই গাঁয়ের মনিরুদ্দি চাচা জাহাজের চাকরির স্বপ্নটা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমিও ভেবেছিলাম জাহাজে চাকরি করব। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াব। কিন্তু ওটা আমার কপালে ছিল না। আমার এই চড়ুই পাখির বুক দেখে শামসুল মাস্টার হেসেই অস্থির হয়েছিল। শামসুল মাস্টার অনেকের চাকরি করে দিয়েছে জাহাজে। হলদিয়াতে তার বিশাল বাড়ি আছে। কলকাতাতেও আছে। মেটিয়াবুরুজের সেই বাড়ি আমি দেখেছি। সেখানে চার পাঁচটা বিশাল বিশাল কুকুর আছে। বিশাল বাড়ির বিশাল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে

শামসুল মাস্টার হাসতে হাসতে বলেছিল, আরে দূর দূর! কলম পিষ গে যা। ওখানে যদি তোর কিছু হয়। এখানে কিছু হবে নি।

সেই অপমানের জ্বালা নিয়ে উদয়চাঁদ ব্যায়ামগারে ভর্তি হতে গিয়েছিলাম আমি। ওখানকার ইনসট্রাক্টর দিবাকর বাবু বললেন, ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে।

সেখানেও হল না। শেষে আবার মেটিয়াবুরুজে গেলাম দর্জির কাজ শিখতে।

সেটাও হল না।

আনন্দ, এত সব কথা তোকে লিখছি কেন? তুই তো লিখতে পারিস। একটা কিছু লেখ। একটা গল্প, বা উপন্যাস। কিছু টাকা তো পাবি। ওদের দিস। একটু সাহায্য করা হবে। মেয়েটার জন্যই আমার যা কষ্ট।

সেদিন গ্রামে ঢোকার মুখে পঁচিশ ত্রিশটা ছেলে মেয়ে আমার পথ আটকাল। ওদের কাছ থেকে প্রথম অভ্যর্থনা পেলাম কিছু ঝাঁটা ও লাথি প্রদর্শনের মাধ্যমে। চায়ের দোকানে মাটির দেওয়ালে একটা পোস্টার লটকানো ছিল। দেখলাম তাতে লেখা, "শিল্পায়নের জন্য জমি অধিগৃহীত হলে বিকল্প বাসস্থান এবং বিকল্প জীবিকা দেবার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই।"

তারপর বিশাল একটা মিছিল এল কোথা থেকে হৈ হৈ করে। ওদের সবার হাতে দেখি বড় বড় তলোয়ার। আগের দলটার সাথে মিশে ওরাও আমাকে লাথি চড় ঘুঁষি দেখাতে লাগল। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল। আমাকে ঘিরে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি চলতে লাগল। দেখি ওদের চোখে মুখে উল্লাস, অথচ জমি হারাবার কোনো বেদনা নেই। ওরা এই প্রজন্মের ছেলে মেয়ে সব। আশ্চর্য! ওরা রাজনীতি শিখছে, লেখাপড়া জানে। কিন্তু সত্তরের দশকের রাজনীতির কথা জানে না। আমি ওদের কি করেছি? ওরা কেনই বা আমাকে আটকাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ভাল করে চেয়ে দেখলাম, ওদের অনেকের এখনও গোঁফের রেখা ভাল করে বের হয় নি।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি প্রথমে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। কি করব? ফিরে যাব? ওদের কারো সঙ্গে আলোচনা করব? ওরা আমাকে ভিনদেশী ঠাওরেছে। আমায় পুলিশের লোক বলে মনে করছে। আমার অপরিণামদর্শী মস্তিষ্ক ও শরীর বেশ খানিকক্ষণের জন্য গুলিয়ে উঠল। আমি অনেক কিছু সাময়িকভাবে ভুলে গেলাম। আমি ভুলে গেলাম নন্দীগ্রামে প্রবেশের পথ কেটে দেওয়া রাস্তা,

আড়াআড়ি করে ফেলে রাখা কোনো পিলার বা বোল্ডারের স্তূপগুলো। যা দেখে আগেই আমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। রাস্তায় কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, কোথায় থেকে আসছেন ? কোথায় যাবেন ? কেন যাবেন ? শান্ত চোয়াল সতর্ক জিজ্ঞাসু ওই চোখগুলোকে অবহেলা করা আমার মোটেও উচিত হয় নি। এত ভিতরে ঢুকে পড়াও সঠিক কাজ হয় নি। ওর মধ্যেই রাস্তার দুপাশে ভিড় করে দাঁড়ানো নিরীহ ভিরু শিশু ও মহিলাদের মুখগুলো দেখছিলাম। ভেবেছিলাম চেনাশোনা কাউকে পাই যদি ভাল হয়। খবরের কাগজে পড়েছি কত গল্প। কারও চামড়া ঘেঁষে গুলি উড়ে গেছে, কোনো মহিলাকে মাঠের মাঝে ফেলে ধর্ষণ করা হয়েছে। এসব বর্ণনা যারা দিচ্ছে তাদের কোনো লজ্জা নেই শঙ্কোচ নেই। নির্বিকারভাবে মিডিয়ার সামনে হাসিমুখে কথা বলছে। যেন কোনো বীরত্বের ঘটনা বিবৃত করছে। এই ঘটনার কথা বলে বিনিময়ে তারা হয়তো কিছু পাবে। কি পাবে ? টাকা পয়সা ? অসংখ্য বোবা ফ্যালফ্যালে চোখমুখের ফিরে যাওয়ার আকুতিও চোখে পড়ছিল। আমার মনে হচ্ছিল এ যেন আমার চেনা নন্দীগ্রাম নয়, এ যেন প্রাচীন কোনো শহর। মহেঞ্জোদরো অথবা হরপ্পায় এসেছি। ভাঙাচোরা একটা শহরের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে। এগুলো পয়সা রোজগাবের জন্য পড়ে আছে, মিডিয়াতে ছবি হবার জন্য পড়ে আছে, কাগজে খবর হবার জন্য পড়ে আছে। আনন্দ, আমি শুনেছি, ফিল্ম স্টুডিওতে এরকম সব সাজানো থাকে সিনেমার শ্যুটিংয়ের জন্য।

তখনই বাড়ির জন্য, স্ত্রীর জন্য, মেয়েটার জন্য একটা তীব্র ভয় আর উৎকণ্ঠা আমায় চেপে ধরেছিল। আমার মনে হল, এখানে এসে আমি খুব ভুল করেছি। আমি ওদের চীৎকার করে বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এই গ্রামেরই ছেলে। চোদ্দ বছর পর ঘরে ফিরছি। আমি তোমাদের শত্রু নই। আমি এই গ্রামেরই একজন। আমাকে তোমরা ঘরে ফিরতে দাও।

ওরা কেউ আমার কথা শুনল না। কি বলল জানিস ? আমি পুলিশের খোচর ?

আমি তখন খুব ভয় পেলাম। 'খোচর' শব্দটাকে চিরকার ঘেন্না করে এসেছি। সত্তরের দশকেও এই 'খোচর' শব্দটা ছিল। তারা আমাদের অনেক সর্বনাশ করেছিল। আজও করে চলেছে। পুলিশ তার নিজের স্বার্থে 'খোচর' পোষে। আমি কিনা সেই 'খোচর' ? তুই বল ? ওদের একজনকে একটু চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। আমি জানতাম এখানকার পুরনো রেওয়াজ গার্হস্থ অস্ত্র-শস্ত্র

নিয়ে মিছিল করা। যার যা আছে কুড়ুল, কোদাল, টাঙ্গি, বল্লম, সড়কি সব নিয়ে উৎসাহে মিছিলে চলে আসে সবাই। এসব কোনোদিন কোনো মারামারিতে ব্যবহার হয় নি। কিন্তু এদের চোখ-মুখ দেখে সে ভরসা পেলাম না। ওই চেনা মুখকে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, এসব তরোয়াল টরোয়াল কেন রে ?

ও যা বলল, শুনলে তুই ভিরমি খাবি। বলল, আরো যা আছে, সিপিএমকে মারবার জন্য ! দেখলে সিপিএম ভয়ে মরে যাবে।

সিপিএমকে মারবার জন্য ? খটকা লাগল। নন্দীগ্রাম চিরকাল বামপন্থী ছিল। সেই নন্দীগ্রাম এই কথা বলছে ? তাহলে এ নন্দীগ্রামকে আমি চিনি না। আনন্দ, তখনি বুঝতে পারলাম ফিরে যেতে হবে। গত চৌদ্দ বছরে নন্দীগ্রাম তার রঙ পাল্টে ফেলেছে। মেজদার সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো উপায় ছিল না। নন্দীগ্রাম বর্হিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন। ওখানকার মানুষ রাজ্যের শিল্পায়নের জন্য জমি দিতে চায় না। তাই টেলিফোনের তার কাটা। ব্রিজ কালভার্ট সব ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। যোগাযোগের সব ব্যবস্থাই বন্ধ।

কোনরকমে ফিরে এলাম। গ্রামে ঢুকতে পারলে মা-র সঙ্গে দেখা হতো। অনেকদিন আমি গ্রামের বাইরে। হল না। ভেবেছিলাম বুড়ী মা-কে নিয়ে চলে আসব। মা-র সঙ্গে দেখা হল না। মেজদার ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়ে। মেয়েটা স্কুলফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে কেমন পরীক্ষা দিয়েছে কে জানে ? ছেলেটা এখন স্কুলে যেতে পারছে না। স্কুলে তালা মারা। পোস্টঅফিস, ব্যাঙ্ক, কোথাও কোনো কাজ হচ্ছে না। প্রায় দশ মাস হতে চলল। পুজো আসছে, তাও এবার হবে কি না জানি না। বৌদিকে জোর করে কৃষি জমি রক্ষা কমিটি মিছিলে হাঁটিয়েছে। একেবারে সামনে ফেস্টুন হাতে। বৌদি কোনদিন কোনো মিছিলে হাঁটে নি, এখন দিনরাত শুধু কাঁদছে আর বলছে আমাকে বাপের বাড়িতে রেখে এস। ছেলে মেয়ে নিয়ে বৌদি বাপের বাড়ি চলে যেতে চায়। বৌদির বাপের বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু যাবে কি করে ? দু-তিন ক্রোশ রাস্তা হাঁটা কম কথা নয় ? ভ্যান রিক্সাগুলো কৃষি জমি রক্ষা কমিটি ধরে রেখেছে। তাতে ওরা কি সব রাতের বেলায় আনা নেওয়া করে। সাধারণ মানুষ ওগুলো ব্যবহার করতে চেয়ে পায় না। তাছাড়া গ্রাম থেকে বের হবার সব রাস্তা কাটা। শুধু নদীর দিক দিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু মেয়েরা ওই পথে যেতে পারবে না। ঘরে বৃদ্ধা মা। এখন মেজদাকে প্রতিদিন মিছিল করতে ডাকে ওরা। মনে সায় না থাকলেও মাঝে মাঝে মিছিলে যেতে হয়। নইলে একান্ন টাকা করে প্রতিদিন জরিমানা দিতে হবে। পঞ্চাশ নয়, একান্ন। সমপন্ন গৃহস্থ, ব্যবসায়ী,

স্কুলের শিক্ষক যারাই ওদের মিছিলে হাঁটবে না, সবাইকেই দিতে হবে এই জরিমানা। দিন দিন গ্রামের লোকসংখ্যা কমছে। আগে ছিল আটশো ঘর ছাড়া, এখন তিন হাজার পার হয়েছে। রাতের অন্ধকারে চোরের মতো মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় যেমন হয়েছিল, খান সেনাদের ভয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। তাদের জন্য ছিল উদ্বাস্তু শিবির। নন্দীগ্রামের মানুষদের জন্য সেটুকুও তৈরি নেই।

আনন্দ, মেজদা বহুদিন বলেছে, মলয় তোর ভাগেরটা এসে বুঝে নে। চাষ করার থেকে থাইল্যান্ডের চাল কিনে খাব। তাতে খরচা কম। চাষ করলে যা খরচ হয়, চাল কিনে খাওয়ার খরচ আরো কম। তাহলে লোকে জমি দিতে চাইছে না কেন ? আমার মনে হয়েছে জমিটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসল রহস্য আছে অন্য জায়গায়। সেটা কেউ বলছে না।

মেজদাকে আমি বলেছি, গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছি যখন ও জমি এখন তোমার। তুমি যা ভাল বোঝ কর।

আমার দুঃখ স্বভূমিতে একবার ফিরতে চেয়ে পারলাম না। এ দুঃখ রাখবার কোনো জায়গা নেই। তুই লেখ, আমার এই দুঃখটার কথা। গ্রামের ছেলে হয়ে আমি নিজের গ্রামে ফিরতে চেয়ে ফিরতে পারিনি। এ আমি কোন দেশে বাস করি ? কত গান করেছি 'আমার সকল দেশের রাণী সেজে আমার জন্মভূমি'। সেই জন্মভূমি আমাকে 'খেদরে' দিল। মেদিনীপুরের ভাষা বললাম। মানে তাড়িয়ে দিল। জানি আমার এই বেদনা নিয়ে অবশ্য বেশিদিন আমাকে থাকতে হবে না। তোকে যদি জানাবার সুযোগ না পাই, তাই লিখে গেলাম।

বর্ধমানে ফেরার পর মেজদার একদিন টেলিফোন পেয়েছিলাম। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, মলয় তুই ভাল আছিস তো ? আমরা তোর জন্য ভেবে ভেবে মরছি।

আমি যখন বললাম, হ্যাঁ। আমি ভাল আছি। মেজদা কেঁদে ফেলল। টেলিফোনে মেজদার কান্না শুনলাম। বলল, শুনলাম তোকে ওরা মেরেছে।

মেজদাকে আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, না। আমি পালিয়ে এসেছি। নইলে হয়তো মারতো।

—যাক তুই ভাল ভাবে ফিরেছিস শুনে বাঁচলাম বাবা। তোকে আর এখন গ্রামে এসে কাজ নেই। আমারই ভুল হয়েছিল তোকে আসতে বলা। এদিকে যা চলছে, তোকে আর কি বলব ?

——কেন ? আবার কি হল ?

——তোর ঘরদুটো ভাড়া দিয়েছি, মেদিনীপুরের দুজন মাস্টার ভাড়া থাকে। জমি রক্ষা কমিটি ওদের কাছে হাজার টাকা চাঁদা চেয়েছে। প্রতি মাসে দিতে হবে। কি করবে বল তো ? মাস্টারী করতে এসে কী বিপদে পড়ল। ভীষণ ভয় পেয়েছে ওরা। রাত দিন কান্নাকাটি করছে। স্কুল তো বন্ধ, বাড়ি যেতেও পারছে না। ভাবছে গেলে যদি আর ঢুকতে না পারে ? শেষে চাকরিটা খোয়াবে ? কি করবে বল তো ?

আমি বললাম, আপাতত এখন টাকা দিয়ে দিতে বল। এক মাস তো সময় পাওয়া যাবে। যা অবস্থা দেখে এলাম। এছাড়া এখন কোনো উপায় নেই।

——কিন্তু টাকা দেবে কোথা থেকে? মাইনেই তো হয় নি। ব্যাঙ্ক পোষ্টঅফিস সব বন্ধ। কেউ দরজা খুলতে পারছে না। মেজদা বলল।

আমি তখন বললাম, তাহলে বলতে বল, ধার বাকি থাক। বেতন হলে দেবে।

——তুই বল ? কোনো সভ্য সমাজে এটা চলতে পারে ? গ্রামে প্রশাসনের কোনো চিহ্ন নেই। ওই কৃষি জমি উদ্ধার কমিটি যা বলবে শেষ কথা। এ তো শুনেছি কাশ্মিরে হয় নাকি? যে জায়গাটায় ইন্ডিয়ার কোনো প্রশাসন কাজ করতে পারে না। তুই জানিস নাকি কিচ্ছু ?

কিসের জমি উদ্ধার ? সরকার বলেছে জমি নেওয়া হবে না। নন্দীগ্রামে মেডিকেল হাব হবে না, কারখানা হবে না। তবু.....এরা কারা ? এমন শক্তি সঞ্চয় করে কি ভাবে? বুঝি না। এরাই তো বর্গা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। এরাই তো পঞ্চায়েতের বিরোধিতায় নামে প্রতিটি উন্নয়ণের কাজে। এদের ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষায় পড়াশোনা করে বাইরে থেকে। আর গ্রামে প্রতিটি উন্নয়ণের ক্ষেত্রে এরা বাধা দিচ্ছে সাধারণ মানুষকে উস্কে দিয়ে, সামনে এগিয়ে দিয়ে। আনন্দ, সোভিয়েত ভেঙ্গে গেছে অনেকদিন। তবু স্বপ্নটা ছিল। ধীরে ধীরে আবার স্বপ্নটা জোড়া লাগছিল। কিন্তু নন্দীগ্রাম আমাকে ধাক্কা দিল। কমিউনিস্টদের একটা প্রচার ধারা আছে। সেটা হল মানুষকে বোঝানো, তুমি সংগঠিত হও। সংগঠিত হলে তোমার শক্তি অজেয় হবে। রাষ্ট্রশক্তি তখন তোমাকে ভয় করবে। সে নতজানু হবে তোমার কাছে। এই কথাগুলো কমিউনিস্টদের মধ্যে উচ্চারিত হতে হতে একটা ঘোরের মধ্যে নিয়ে আসে। একটা চিরন্তন আদর্শের জন্য মানুষ তখন মৃত্যুভয়কেও জয় করতে শেখে, মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

তিরিশ বছর এরাজ্যে ক্ষমতায় আছে বামপন্থীরা। এখানে রাষ্ট্রশক্তির সে প্রধান চালিকা শক্তি। তারই পুলিশের রাইফেলের সামনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, মৌলবাদী শক্তির উসকানিতে একদল মহিলা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলছে, চালাও গুলি ? একদল মহিলা বাচ্চা শিশুদের 'নিয়ে পুলিশের রাইফেলের সামনে বুক চিতিয়ে চিৎকার করে বলছে, চালাও গুলি, দেখব তোমাদের হিম্মৎ। এই উদ্দীপনা এমন জমিকে ঘিরে যে জমি আদপে এক ফসলী নয়, দু ফসলী নয়, বন্ধ্যা ? আমাকে ভাবিয়েছে এই রহস্য।

আমার যা মনে হয়েছে তোকে বলি, এরা বুঝে গেছে বামফ্রন্ট সরকারের গুলি চালাবার মুরোদ নেই। গুলি চালালে বিপদ বামফ্রন্টেরই। চারদিকে খবরের কাগজ, মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়বে হৈ হৈ করে। বাম সরকার গরিব জনগণকে গুলি করে মারছে। মজাটা দেখ ? আর এরা গরিব মানুষদের ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে। যারা সরকারে আছে তাদের কি অবস্থা ? সরকারে থাকা কিছু দল এই সব ঘটনার সমালোচনা করছে। এতে গরিব মানুষের দল আরো বেশি বিভ্রান্ত হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ, ধর্মের বেড়াজাল, মানি পাওয়ার, শ্রেণী দ্বন্দ্ব অ্যাত কিছুর মধ্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্যে ক্ষমতায় থাকার তিরিশ বছরের স্থায়ীত্ব শিকড় কত দূর প্রোথিত হয়েছে ? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, চেতনার রঙ আর লাল নেই রে। আমার মনে হয়েছে, বামপন্থীরা কিছুটা হলেও এখানে বিচ্ছিন্ন জনগণ থেকে।

আনন্দ, জন্মান্তরবাদে আমি বিশ্বাস করি না। তবু ভাবতে ভাল লাগে। যদি আবার আসতে পারি......অন্য জীবন নিয়ে....এই বঙ্গে..কবি জীবনানন্দের মতো তাই চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে——

'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়——হয়তো শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হব——কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুন ডাঙায় ;
হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;

হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমূলের ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াচ্ছে এক শিশু এক উঠানের ঘাসে।
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়, রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক ; আমাকেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—'

আনন্দ, বাবার কাছে কোন ছেলেবেলায় শুনেছিলাম আমাদের বাড়ি যেখানে ছিল, সেখানে এখন নদী বইছে। দলিলটা এখনও আছে মেজদার কাছে। কিন্তু আমাদের ঠাকুরদা কোনোদিন সে জমির কাছে যাননি। আমার বাবাও যান নি। আমরাও সে জমি কোথায় জানি না। বাস্তু জমি নদী খেয়ে ফেলেছে। ওই জমি আমাদের বাস্তু ধরলে সাত পুরুষের উদ্বাস্তু আমরা। তোকে একটা কথা বলি, উদ্বাস্তু শিবিরে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। যাদের নেই, তারা উপলব্ধি করতে পারবে না উদ্বাস্তুদের ব্যথা।

তোকে আবার বলছি, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কথা ভেবে সংগঠন হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু, উদ্বাস্তু শুধু পূর্ববাংলার লোকেরাই হয় নি, এপার বাংলার মানুষও হয়েছে। বহু মানুষ, তাদের সংখ্যা কম নয়, কাগজে পড়িস না মুর্শিদাবাদে মালদায় দিনাজপুরে জলপাইগুড়িতে ফি বছর নদী কত জমি খায় ? সেই মানুষগুলো কোথায় যায় ? কে ভাবে তাদের কথা ? বাপ ঠাকুরদার জমি হারানোর বেদনা কি জিনিষ তা আমি বুঝি। আবার এটাও বুঝি নন্দীগ্রামের ওই জমি পোড়া কাঠ ছাড়া কিছু নয়। তাই একবার যেতে চেয়েছিলাম। নিজের চোখে দেখে বুঝতে চেয়েছিলাম আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য সৎ কিনা ? পার্কাস রোডের যে ঘরটায় আমি থাকি সেটা আট বাই দশ ! আমরা বললাম বটে, কথাটা আমাদের বলাটাই ছিল ভাল। মানে আমার স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে।

আজ আমি যদি পুনর্বাসন চাই, তাহলে কে দেবে ? আমি মনে করি গ্রামের জমিতে আমার কোনো সত্ত্ব নেই, কিন্তু মেজদা ? তার প্রতি কোনো দায় থাকতে পারে না ? কিন্তু গ্রাম আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি বিতাড়িত হয়েছি গ্রাম থেকে। যেমনভাবে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল সামসুল মাস্টার। বলেছিল, চড়াই পাখির বুক নিয়ে তুই জাহাজে চড়বি ? খালাসী হবি ? তোর সাহস তো কম নয় ? যা ভাগ এখান থেকে।

উদয়চাঁদ ব্যায়ামগারের দিবাকরবাবু বলেছিলেন, ডাম্বেল ঠেলবে ? আগে

ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে এস। বুকে কোনো দোষ, আছে কিনা জেনে নিই। মেটিয়াবুরুজের মনিরুদ্দি মিঞা বলেছিল, তোমরা বাপজান লিখাপড়া শিখা ছাওয়াল। তুমাদের কি একাজ পোষায় ?

বাম রাজনীতিতে নেমে কত কি দেখলাম। ভিয়েতনাম হল। সেদিন উগো সাভেজকেও দেখলাম। একটা আশা তৈরি হলো। নব্বুইয়ে সোভিয়েত ভেঙ্গেছে। বুকভাঙ্গা হাহাকার নিয়ে তবু স্বপ্নটা হারাইনি। কিন্তু নন্দীগ্রাম আমার সবকিছু হারিয়ে দিল।

আজ সন্ধ্যায় মেজদা আবার ফোন করেছিল, কি বলল জানিস ? মেজদা বলল, জানিস মলয়, তুই তো অনেকদিন গ্রামছাড়া তবু তুইও জানবি, তোরও মনে থাকবে। সাম্প্রদায়িক সমপ্রীতি শব্দটা এগ্রামে আমরা কখনো উচ্চারিত হতে শুনিনি। শব্দটা এখানে কোনদিন প্রয়োজন হয় নি। বাবরি মসজিদ ধ্বংস হবার পরও এখানে "সাম্প্রদায়িক সমপ্রীতি", "হিন্দু মুসলমান" ঐক্য এগুলো বাড়তি শব্দ বলে আমরা মনে করতাম। যদিও সত্তরভাগ মুসলমান বাস করে আমাদের গ্রামে। আজ তোকে বলছি মলয়, এখানে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী মিটিং করল। অতি সুকৌশলে ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বীজটা পুঁতে দিয়ে গেল এখানে। আমি বলব, গত তিরিশ বছরের বামফ্রন্টের ভুলগুলো এই বীজ বপন করার সুযোগ তৈরি করেছে।

টেলিফোনটা কেটে যাওয়ার আগে মেজদা বলল, মা যতদিন আছে বুঝলি ? তারপর সবাইকে নিয়ে তোর ওখানেই চলে যাব। অন্যকিছু উপায় নেই। এই গ্রাম অভিশপ্ত হয়ে উঠছে দিনকে দিন। তোর ওখানে যা হোক গতর খাটিয়ে খাব। আমাদের স্বভূমি আর নিরাপদ নয়।

আনন্দ, যে জন্য তোকে সব কথা লিখলাম। আমি জানি মেজদা চলে আসবে বর্ধমানে। ওখানে থাকতে পারবে না। মেজদা এলে, একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিস। আর মেয়েটার যাতে লেখাপড়া হয় একটু দেখবি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও আমি আমার আমিত্বটা ছাড়তে পারলাম না রে। ক্ষমা করিস।"

মলয়ের চিঠি শেষ হল। আনন্দ দেখল, ঘড়িতে বাজে রাত একটা। সনাতনের দিয়ে যাওয়া চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে কখন। রাতে খাবে কিনা জানতে চেয়েছিল। ওকে বলেছিল, বাইরে খেয়ে এসেছি। একটু চা খাওয়াতে পারিস ? চা দিয়ে গিয়েছিল সনাতন। তারপর কিছুই মনে নেই। ঘুম আসবে না।

চা টা গরম করে খাওয়া যেতে পারে। কাপটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে আনন্দ, চা-টা গরম করে নেবে। ওভেন জ্বালায়। একটা বাটিতে চা টা ঢালে।

সনাতন এসে হাজির হয়। জানতে চায়, কি ব্যাপার ? চা করছ ?

আনন্দ বলে, চা করিনি। তোর দেওয়া চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাই গরম করে নিচ্ছিলাম।

——সরো। বলে সনাতন ওকে সরিয়ে দিল। বলল, যাও। আমি চা করে দিচ্ছি। তোমার জন্য মা-র কাছে মিথ্যে বলে বলে আমার পাপ হচ্ছে। কি যে আরম্ভ করেছ তুমি ? তোমার হাতে ওটা কার চিঠি ?

চিঠিটা হাতেই ধরে ছিল আনন্দ। বলল, মলয়ের।

——মলয় ? যে সেদিন মারা গেল ? তোমাকে চিঠি লিখে গিয়েছিল ? সেই চিঠি এসেছে বাই পোস্টে। সনাতনের গলায় উদ্বেগ।

——তেমন কিছু না।

——দেখ আবার। এই চিঠি নিয়ে পুলিশে ঝামেলা করবে না তো ?

——কাউকে বলিস না।

——বেশ। নাও, চা নাও। রাত হয়েছে। এত রাতে চা খাচ্ছ, ঘুমুবে না ? তোমার ব্যাপার স্যাপার ভাল ঠেকছে না।

আনন্দ সাড়া দিল না। চা নিয়ে ঘরে এল। সনাতন চলে গেল সব আলো নিভিয়ে। মলয়ের চলে যাওয়া প্রায় এক মাস হতে চলেছে। মারা যাওয়ার আগে লিখেছে। তারপর পোস্ট করেছে। কিন্তু আমাকে কেন ? লেখালেখি নিয়ে তো চর্চা করে রবিদা। তাছাড়া রবিদা তো সবার কাছে ওর পরিবারের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করেছে। তাহলে মলয় ওর চলে যাওয়া বুঝতে পেরেছিল ? রবিদাকেও ও ঠিক চিনতে পেরেছিল ? ভাবল আনন্দ।

দু দিন পরে জানা গেল এ তল্লাটের যত বেকার ছেলে মেয়ে, সবাই ভাবছে আলোকের কোম্পানীর দয়ায় সবার বেকারত্ব ঘুচে যাবে। আলোক সবাইকে সত্যিই আলোর পথ দেখাবে।

বিকাশ বলল, ইল্লী আর কি ! জন বিস্ফোরণের সঙ্গে শিক্ষিত বেকারদের ঠেলায় কেন্দ্রের সরকার, রাজ্যের সরকার সবাই শুয়ে পড়ছে আর উনি আসছেন চৈতন্য সাজতে ?

আনন্দ বলল, কি ভাবছেন রবিদা ? আপনি কিছু বলুন ?

——সব শেষ হয়ে যাবে। এই এনজিও রাজই সব খতম করে দেবে। সব শেষ করে দেবে। বলে দুম করে উঠে রবিদা বেড়িয়ে গেলেন। সবাই অবাক হল। আলোচনার মাঝখানে যবনিকা পড়ে গেল। গোটা অবস্থাটা পাল্টে গেল।

আলোক রেগে গিয়ে বলল, করলে করবে। তাতে কার বাবার কী ? এযুগে আসল হল নোট। চাইলে তো কেউ দুটো টাকা দেয় না। প্রতিদিন দুঘন্টা করে সময় দেব। মাস গেলে চার হাজার টাকা কামাই। কে দেয় রে ? এমন ছ-মাস চালাতে পারলে, মাসে দশ হাজার টাকা আটকায় কোন শালা ? পায়ের ওপর পা তুলে খাব। দেখব তোরা তখন কি করছিস ? তোরাও তখন আমাকে তেল লাগাবি। তোদের তো ফেলে দিতে পারব না। কোম্পানী বলেছে, এখন দেবে দু চাকা। তারপর চার চাকা ইন্ডিকায় চেপে ঘুরে বেড়াব। দেখবি সবাই স্যালুট করবে আমাকে। লাইফ হ্যায় তো অ্যায়সা ! এই তো তোদের বিপ্লবী পার্টির কাগজেও ফুলপেজ বিজ্ঞাপন দিয়েছে। বিশ্বাস না হয় তো পড়ে দেখ।

রবিদার চোখের সামনে আলোক কাগজটা খুলে ধরল। বলল, লিখেছে দেখ, দু বছরের মধ্যে এই কোম্পানীর মেম্বার কত বেড়েছে। পুলিশ কমিশনারের বউ, কলেজের অধ্যক্ষের বউ, অমুক নেতার বউ, কে কবে জয়েন করেছে। এখন কত পাচ্ছে। সব ডিটেলস দিয়ে দিয়েছে। মিথ্যে হলে পার্টি ছাপতো ? টেবিল করে দেখিয়ে দিয়েছে, আর দু-চার বছরের মধ্যে কোম্পানীর সদস্যদের মাথা পিছু আয় কার কত বেড়ে যাবে। এমন কি কাকে·কত ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে স-ব হিসেব কষে দিয়েছে।

শ্যামলেন্দু বলল, একবার দেখাই যাক না কীসে কী হয় ?

——দেখ তোরা। ভাল হলে ভাল। বলে আনন্দ উঠে পড়ল। কিন্তু যেতে পারল না। রবিদা ঢুকলেন আবার। এক ঠোঁঙা সিঙ্গাড়া নিয়ে। আলোক উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, ডি লা গ্রান্ডো মাফিস্টোফেলিসো ইয়া !

সবাই সিঙ্গাড়া নিয়ে মেতে উঠল। রবিদাকে মলয়ের চিঠিটা দিল আনন্দ। সিঙ্গাড়া খেতে খেতে রবিদা চিঠিটা শেষ করলেন।

আলোক বলল, পশ্চিমবাংলার মাটিতে বামপন্থী শাসনের তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর মৌলবাদের বীজ বপন করা হল।

রবিদা বললেন, মৌলবাদের একটা বিশাল সুবিধা আছে রে। পার্টিঅফিস লাগে না। ঝান্ডা ফেস্টুন এসব। কিছুই লাগে না। অথচ মানুষের বুকের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সার জল পেলেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

——যে প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মানুষের মধ্যে এই অশুভ শক্তির ভাবনাকে অপসারণ করা যায়, যৌথ খামারের সেই ভাবনা আমরাও তো ভুলে গেছি। ভুলে গেছি যৌথ আন্দোলনের ভরসা, যৌথ আন্দোলন। একসাথে রাস্তায়, মাঠে, দাঁড়িয়ে যে লড়াই সে লড়াই কই ? মুখে বলছি, কাজে করছিনা। গত তিরিশ বছর অনেক ত্যাগের বিনিময়ে এসেছে। আমরা কিন্তু তা ভুলে যাচ্ছি। কোনো ডকুমেন্টেশন হচ্ছে না। এখন ভোগের মধ্যে ক্ষয় শুরু হয়েছে। ভুলে যাস না পঞ্চাশের দশকে বাম সরকারকে ভাঙ্গার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে টাকা দিয়েছিল আমেরিকা। ময়নিহান তার বইয়ে লিখে দিয়েছে সে কথা। আজও কি আমেরিকা বসে আছে হাত পা গুটিয়ে ? আজও তারা গুটি সাজিয়ে যাচ্ছে !

——ওদের কনশাল জেনারেল তো দেখা করল সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে। পশ্চিমবাংলায় এত ইমপর্টেন্ট লিডার সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী ?

তাহলে বুঝতে পারছিস নন্দীগ্রামের লড়াইটা শুধু চাষের জমির নয়, লড়াইটা রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধারের। কমিউনিস্টরা এখন কৃষকের কথা ভাবে না, তারা এখন টাটা বিড়লাদের কথা ভাবে, এমন একটা মিথ্যা প্রচার মানুষ খাচ্ছেও। দিনাজপুরের চাষী, চব্বিশ পরগণার চাষী আবার মেদিনীপুরের চাষী সবাই এক হয়ে যাচ্ছে। সবাই এক ভাবনার শিকার হচ্ছে। কৃষক সংগঠনের ঐতিহ্য, অতীত ইতিহাস সব এক লহমায় ভেঙেচুরে ধুলিসাৎ হচ্ছে। ওই চিন্তা ভাবনার শরিক যারা তারা যেন আজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। আর যারা আসল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তার কৃষকের বন্ধু সেজে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে এত দৈন্যতা এর আগে এত প্রকটভাবে দেখা যায় নি।

——সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। ওদের শক্তিকে সংহত করেছে। মৌলবাদীরা এই শক্তিকে পুষ্ট করছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কিছু মিডিয়া আর খবরের কাগজ। এরা রাতকে দিন, দিনকে রাত বলছে। এমনভাবে বলছে, উচ্চবিত্ত মানুষের এক অংশ, মধ্যবিত্ত মানুষের এক অংশ, বুদ্ধিজীবী, নিম্নবিত্ত মানুষের একটি অংশ নিয়ে জনগণের একটি বিশাল অংশ তা বিশ্বাস করছে।

——একে বলা হয় 'মোহক ভ্যালি ফর্রমুলা'। গুলি চালিয়ে, পিটিয়ে, বল প্রয়োগ করে নয়। জনগণের একটি বিশাল অংশের মানসিকতাকে ক্রমাগত বিভিন্ন কায়দায় প্রচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা। যেমনভাবে সৈন্যবাহিনীতে সেনাদের মানসিকতাকে যুদ্ধের উপযোগী উসকে অর্থাৎ 'রেজিমেন্টেড' গড়ে তোলা হয়। সত্যজিৎ-এর গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিটার কথা ভাব। হাল্লা

চলেছে যুদ্ধে সাজ সাজ ভাব গড়ে তোলা হচ্ছে রাজ্য জুড়ে। রাজা থেকে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের প্রজা সবাই হুম হাম শব্দ করছে, যুদ্ধে যাবে বলে। সমস্ত মানুষকে রেজিমেন্টেড করে তোলা হচ্ছে। ঠিক এরকম করা হয়েছিল দেশ জুড়ে 'জরুরী অবস্থা'র সময়। কিছু মানুষ তৈরি হয়েছিল জরুরী অবস্থা সমর্থন করার জন্য। কিছু মানুষ ভাল ভাল কথা বলছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভ্রান্ত করে দেওয়া। যাতে তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। অবশ্য বেশিদিন মানুষকে এইভাবে ভুল বুঝিয়ে দাবিয়ে রাখা যায় না। কিছুদিনের মধ্যেই সত্য কি তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—বুঝেছি, সাধারণ যুক্তিবোধের গোড়াগুলো দুর্বল হয়ে পড়লে মানুষ সংগঠিত হবে না। যেমন শিশুমৃত্যুর ঘটনাকে মিছিলের সঙ্গে অনর্থক জুড়ে দিয়ে মিছিল সম্পর্ককে মানুষের মধ্যে একটা বিতৃষ্ণা তৈরি করার চেষ্টা চলছে, ধর্মঘটে কর্মনাশ, মিছিলে জানযট হয়, সমাবেশে হয় দূষণ।—এইরকম একটা প্রচার চলছে।

—এইসব যুক্তি অন্ধকারের আড়ালে যারা পুষ্ট করছে তারা আসলে সংগঠিত মানুষের শক্তিকে ভয় পায়। ময়দান থেকে কলকাতা বইমেলা সরে গেলেও সাধারণ বই প্রেমী মানুষ হা হুতাশ করে না। বই সম্পর্কে একটা হতাশা তৈরি হয়েছে। আর সেই হতাশা মানুষকে নিষ্ক্রিয় করেছে।

—হতাশা অবশ্যই তৈরি হয়েছে। যুক্তিবোধ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, মানুষকে সংগঠিত করবার যখন আর কোনো ক্ষমতাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দাঁত নখ এভাবেই হিংস্র হয়ে ওঠে। এখানে সরকার যে শিল্পায়ন করতে চাইছে, কার জন্য? শিল্পপতিরা আসবে। তারা লাভ করবে ঠিক। কিন্তু কর্মসংস্থান হবে কার? এ রাজ্যের ছেলে মেয়েদের।

—তবু করতে দেওয়া হবে না। আর এজন্য কিছু মানুষ আছে। তারা সুপরিকল্পিতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

—তিরিশ বছর ধরে যারা ভূমিসংস্কার করেছে, বর্গারেকর্ড করেছে, কৃষিতে এত উন্নতি করিয়েছে, তারা কৃষকের দুঃখ বোঝে না। এটা বিশ্বাস করবে না মানুষ। কংগ্রেস বিজেপি মৌলবাদী দলগুলো স্বাধীনতার পর কৃষির জন্য কি করেছে মানুষ জানে। পার্লামেন্টের দলিলগুলো উল্টে পাল্টে দেখলেই পরিষ্কার ছবিটা দেখতে পাবে। জমিদারী প্রথা বিলোপের সময়, রাজন্য ভাতা বিলোপের সময় কাদের কি ভূমিকা ছিল? মানুষ কি সব ভুলে যাবে?

—মুশকিল হচ্ছে, ইতিহাস কে উল্টে দেখতে যাচ্ছে? পড়াশোনাটাই

তো কমে গেছে।

——এটাও তো সাম্রাজ্যবাদীদের একটা চক্রান্ত। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে তারা এমনভাবে প্রয়োগ করেছে তার ফল হয়েছে সাধারণ মানুষ লেখাপড়া কমিয়ে দিয়েছে। কাকে বোঝাবি তুই ? বিশ্বায়নের খোলা হাওয়ায় যে পুঁজি ও পণ্য বাজারে আসছে তার জন্য বাজারটাকে তৈরি করছে ওরা। ওদের লক্ষ্য এদেশের ২৫ কোটি মধ্যবিত্ত। এই জনগোষ্ঠীকে চনমনে ক্রেতায় পরিণত করতে এদের মনোজগৎকে নতুন ছাঁচে ঢেলে ফেলার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে ভোগ্য পণ্যের কোম্পানীগুলো, যারা পুঁজির মালিক। উদগ্র ভোগের বাসনা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা এইসব প্রবণতার তাড়নায় বুঝে অথবা না বুঝে মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী আজ দিশেহারা। ফলে দু দশক আগের মধ্যবিত্ত মানস আর আজকের মধ্যবিত্ত মানস সমপূর্ণ ভিন্ন হয়ে গেছে।

——তুমি ঠিক বলেছ। দু-দশক আগে যে রাজনৈতিক সচেতনতা মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিম-শরৎ যে মধ্যবিত্তের গর্ব ছিল, যে মধ্যবিত্ত নিজের জ্ঞানভান্ডারকে পরিপূর্ণ রাখার জন্য পুস্তক, পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করত, যে মধ্যবিত্তের যৌথ পরিবারের একটা ঘরে অথবা তক্তাপোশের পাশে একটা বইয়ের আলমারী দেখতে পাওয়া যেত, যে মধ্যবিত্ত বিয়ে বা জন্মদিনে কাউকে উপহার দেবার সময় বই উপহার দেওয়ার কথা ভাবত——সেই মধ্যবিত্ত আজ কোথায় ?

——আছে। সেই মধ্যবিত্ত আজ ধনী শ্বশুরের একমাত্র কন্যাকে স্ত্রী করে দু কামরার ছিমছাম ফ্ল্যাটে আরাম আয়াসের আয়োজনে সম্পূর্ণ জীবন উপভোগ করছে। সেখানে বই পত্র পত্রিকা ? বলা যায় দু-পাঁচটা বিলেতী মদের বোতল পাওয়া যেতে পারে। তবে বই একেবারে নেই বলব না। হ্যারী পটারের মতো দু একটা খন্ড পাওয়া গেলেও যেতে পারে। ছেঁড়া পোষাকের মতো পাঠাভ্যাসকে ত্যাগ করেছে মধ্যবিত্তরা। দেখছিস না লাইব্রেরীতে পাঠক আসছে না, পাঠক আসছে না বলে সেমিনার হচ্ছে। বলা হচ্ছে, কম্পিউটারের যুগে টাইপ রাইটার অচল। বলা হচ্ছে, গুড বাই গুটেনবার্গস, আগামী দিনের সমাজ, পেপার লেস সোসাইটি। মধ্যবিত্তের সংগ্রামী মনোভাব এসবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

——কিন্তু, এই যুক্তি, এই ব্যাখ্যা তো আত্মঘাতী। এর প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য বামপন্থীদের একটা পলেটিক্যাল মোটিভেশন থাকা উচিত। আপনার কি মনে হয় ?

——কে বিচার করবে ? তুই ? বামপন্থী আন্দোলনের লক্ষ্য এখন বাজার

অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় মানুষকে টিকে থাকার জন্য শক্তিশালী বা ক্ষমতাশালী করে গড়ে তোলা। মানুষকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সক্ষম করে তুলতে, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করতে, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের প্রসার ঘটিয়ে মানসিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম করে তুলতে গুচ্ছ গুচ্ছ কর্মসূচী রাজ্যে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে মানুষ বই পড়ে না, পাঠাভ্যাস থেকে দূরে থাকে সে মানুষ আগামী দিনের লড়াইয়ে মানসিকভাবে দৃঢ় অবস্থান নেবে কি করে ? একবারো ভেবে দেখেছিস ?

——এরা অগ্রণী সৈনিক হয়ে দাঁড়াবে কী করে ? তাই যদি হয় তবে তো "ভুখা মানুষ ধরো বই। এটা তোমার হাতিয়ার।" ব্রেখটের বাণী মিথ্যে হয়ে যাবে। বই না পড়া মানুষ তো মরা মানুষ।

——ওই মরা মানুষরাই একদিন জেগে উঠবে।

——কি করে এত জোরের সঙ্গে বলছ ?

——মানুষ নিজের অভিজ্ঞতায় দেখছে জমি প্রতিদিন খন্ড বিখন্ড হয়ে যাচ্ছে। জমি থেকে আয় কমছে। সার, বীজ, সবকিছুর দাম বাড়ছে। শিল্প না হলে আমাদের পরের প্রজন্ম কি করবে ?

——চাষীর ছেলে চাষী হবে, তাঁতীর ছেলে তাঁতী হবে। রোদে জ্বলে পুড়ে তার ক্ষয় হবে। তারপর তাকে নিয়ে গল্প লেখা হবে অনাহারে মৃত্যু। সেই গল্পে সাহিত্য সিনেমা সমৃদ্ধ হবে। মাল্টিপ্লেক্সে ছবি দেখে সবাই হাততালি দেবে। সেই ছবি আবার বিদেশে পুরস্কার পাবে।বছরের পর বছর এই জিনিষ চলবে তাই হয় নাকি ?

——চাকা এবার ঘুরছে। তা হবে না। চাষীর ছেলে আজ কম্পিউটার শিখছে। তারা এটাও শিখছে মার্কস-এঙ্গলসের পর লেলিন-স্তালিন, ওঁদের পর মাও সে তুং দেখিয়েছেন বিশাল দেশে বিশাল পিছিয়ে পড়া জনগণকে নিয়ে কিভাবে বিপ্লব করতে হয়। আজ প্রযুক্তি এসেছে। সময় এসেছে পরিবর্তনের। পুরনো মূল্যবোধ থাকবে, কিন্তু পুরনো জিনিষ আঁকড়ে থাকলে চলবে না।

——হ্যাঁ। ইটস নট ও ডগমা। ইটস গাইড টু অ্যাকশন, অ্যাপ্লিকেশন। মার্কসবাদের কথা, লেলিনবাদের কথা। বলছে ভিয়েতনাম, বলছে কিউবা, বলছে ভেনেজুয়েলা, বলছে চিলি, বলছে চিন। বলছে নিজের নিজের দেশের মাটি বুঝে এগিয়ে চল। জানিস আমি তারাশঙ্করের গণদেবতা, আরোগ্য নিকেতন আবার পড়লাম। নতুন করে এত ভালো লাগল যে কি বলব। হাঁসুলী

বাঁকের উপকথার জবাব নেই। তারাশঙ্করকেও বামপন্থীরা ভুল বুঝেছিল।

——তারাশঙ্করকে নিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে মতদ্বৈধতা ছিল।

——কিন্তু তারাশঙ্করকে জানতে হলে বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে।

রবিদার কথাগুলো আনন্দর মাথার মধ্যে ধাক্কা মারল। ওর মনে হল রবিদা বলছেন বটে, তবে কথাগুলো যেভাবে বলা উচিত সেভাবে বলতে পারছেন না। কোথাও যেন একটা কাঁটা ফোঁটার ব্যথা আছে।



ভোর হয়ে আসছে। গোটা রাত এক মুহূর্ত চোখের পাতা এক করতে পারে নি আনন্দ। বিপ্লবের সময় বুঝি এমনিই হয়। কিন্তু এখন বিপ্লব কোথায় ? কার স্বার্থে বিপ্লব ? এখন তো শুধু অচেনা অজানা পথে সফর। হেমন্তের গান ভেসে আসে কোথাও থেকে। রবিঠাকুর যা লিখেছিলেন, আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।

সকালবেলায় এত রোমান্টিক গান কে বাজায় ? এখন তো ধূপ ধুনো দিয়ে ঠাকুর দেবতার গান, ভজন টজন শোনে লোকে ? আনন্দ অবাক হল।

কিছুদিন পর দেখা গেল আলোক সত্যিই বুলেট চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলোকের চুলের স্টাইলও পাল্টে গেছে। তার চিরকালীন ড্রেস পাজামা পাঞ্জাবির বদলে গায়ে চেপেছে সাফারি স্যুট। জামাটার দুটো বুক পকেট, তাতে দু দুটো মোবাইল। কি সুন্দর রিংটোন, কী তাদের রঙের বাহার। ওতে নাকি ঘণ্টা খানেকের মুভি ছবি তুলে রাখা যায়। আলোক সবাইকে এগুলো দেখায় আর গান শোনায়। শ্যামলেন্দু একদিন ইয়ার্কি মেরে বলল, দেখি একবার তোর মোবাইলটা ?

——উঁহু। তোর চামড়ার হাতটা আগে সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে আয়। আলোক বলল।

শ্যামলেন্দু উত্তর দিল, তোর মোবাইল কভারটাও তো চামড়ার।

——মোবাইলের কভার কি বলছিস ? বল মোবাইলের কন্ডোম। ভাষাটা শেখ।

আলোকের উত্তর শুনে ওর ভাষাজ্ঞান দেখে আনন্দও তাজ্জব বনে গেল। আলোকের মুখের ভাষার কি দশা ? এই আলোক কি সেই আলোক ? যে কথায় কথায় সুকান্ত, নজরুলকে আবৃত্তি করতো ? একদিন আনন্দকে বলল, এই যে

বঞ্চিত বাঞ্চোতের লিডার, ল তো পাস করলি। এবার কালো কোট গায়ে চাপিয়ে বটতলায় লোকের হাত দেখবি না কপাল দেখবি ? ছ্যা ছ্যা আর কিছু পেলি না ? কথায় বলে, যার নেই কোনও গতি, সে করে ওকালতি। লোককে ফী চাইবি, অর্ধেক দেবে। দিয়ে বলবে, কী মক্ষীচুষ উকিল মাইরি। ঢের ঢের উকিল দেখেছি এরকম নয়। তাই তো বলে, দশটা শকুন মরে একটা উকিল হয়। তুই মাইরি আর কোনো প্রফেশন খুঁজে পেলি না ? উকিল হতে গেলি ?

শুকনো মুখে আনন্দ বলল, কি আর করব বল ? যার যেরকম যোগ্যতা শেষ পর্যন্ত তোর কোম্পানী তো আছেই।

——লাইনে আয়, লাইনে আয়। রাশিয়া তো শিল্প শিল্প করে মায়ের ভোগে চলে গেছে সেই আরলি নাইনটিতে। তোরা কি মানুষকে স্পঞ্জ আয়রণ গেলাবি ?

ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তর্ক যত এগোবে ওর মুখের শালীনতা তত কমবে। ক্রমশ তা নিচের দিকে নামবে। অবশ্য পতন কখনও উর্ধ্বগামী হয় না। আনন্দ চুপ করে যায়। প্রায়ই দেখে আলোক বুলেট চালিয়ে ঝড়ের বেগে চলে যাচ্ছে। কানে গোঁজা আছে মোবাইলের আংটি মানে ইয়ার ফোন। থুতনির কাছে একটা ঝাঁটার কাঠি। ওতেই চলতে চলতে কথা বলছে। বংশীর দোকানে একদিন এমনভাবে কথা বলছিল, আনন্দ তো প্রথমে হকচকিয়ে গেল। বুঝতেই পারেনি কাকে বকাঝকা করছে। প্রথমে ভাবল ওকি পাগল টাগল হয়ে গেল নাকি ? তারপর দেখে সামনের পিটুলি গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলছে। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে বুঝতে পারল, ফোনে ও কাউকে ধমক দিচ্ছে বলছে, তোমাকে দিয়ে হবে না। বুঝতে পারছি, তোমাকে চয়েস করে খুব ভুল করেছি। একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম তোমার অবস্থা ভেবে। তুমি সেটা কাজে লাগাতে পারলে না। এটা তোমার নয় আমার লোকশান। এই লোকশান তুমি পূরণ করতে পারবে ? আরে বাবা ভুল মানুষ ক'বার করে ? না না আর কোনো চান্স দেওয়া যাবে না। ছাড় আমার অন্য কাজ আছে। আমি এখন বারাসাতে আছি। বলে আালোক মোবাইলের সুইচ অফ্ করে দিল।

মোবাইলের এই হয়েছে মজা। যেখানেই থাকুক এই বলছে আমি বর্ধমানে রয়েছি, আবার কাউকে বলছে আমি বাঁকুড়ায়, কাউকে বলছে বীরভূম। আনন্দ বুঝতে পারে আলোক ওর কোম্পানীর জন্য এই মিথ্যে কথাগুলো বলছে। কিছু প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। হয়তো আলোক বিরক্ত হবে। ওদের বন্ধুত্বটা নষ্ট হবে খামোখা।

বংশীর দোকানের ছাদ করোগেটেড টিন দিয়ে ছাওয়া হল। বংশীর দোকান আগের মতো এখন আর ঝুপড়ি নয়। মেঝে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। ঝাঁ চকচকে কাউন্টার। বংশী এখন শুধু চায়ের দোকানী নয়, এখন আলোকের কোম্পানীর এজেন্ট। সে এখন ক্যাশে বসে। শোনা গেল বীথিও বাপের বাড়ি এসে আলোকের কোম্পানীতে জয়েন করেছে। সেও দুবেলা সেজে গুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলোকের বাইকের পিছনেও ঘুরতে দেখা গেছে তাকে।

বীথিকে আনন্দও একদিন রাস্তায় দেখল। আনন্দকে দেখেও যেন বীথি দেখতে পেল না, এমন ভঙ্গী করল। ও কি সত্যিই আনন্দকে দেখতে পায় নি ? না কি আনন্দকে অ্যাভয়েড করে গেল বুঝতে পারল না। মেয়েদের এসব ব্যাপার স্যাপারগুলো কোনদিন ওর ভাল লাগে না। দেখল, বীথি এখন দেখতেও সুন্দর হয়েছে। আগের চেয়ে চেহারাটায় জৌলুষ আরো বেড়েছে। ওর রূপ যেন খুলে গেছে। বিয়ের পর কিন্তু এত আকর্ষণীয় চেহারা ছিল না ওর।

বীথি আনন্দর জীবনে প্রথম মেয়ে যে যেচে এসে ওর সাথে আলাপ করেছে। কথা বলার ইচ্ছেটা অবশ্য আনন্দর ছিল অনেকদিন থেকে। তবে তার সাহসে কুলোয় নি। ভেবেছিল ও যা মেয়ে, ফটর ফটর করে ইংরাজী কথা বলে, যদি পাত্তা না দেয় অপমানিত হবে।

কলেজে আনন্দ তখন বলতে গেলে গ্রামের ছেলে। অঙ্কে অনার্স নিয়ে ভর্ত্তি হয়েছে। কো-এডুকেশন কলেজ। ছেলে মেয়ে সবাই একসঙ্গে পড়ে। গোবেচারা না হলেও ও ছিল একটু ভীতু স্বভাবের। বিশেষ করে অপরিচিত মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে ওর নার্ভাস লাগতো। এটা সবাই জেনে ফেলায় গেঁয়ো বলে অনেকে ওর পিছনে লাগত। ওদিকে ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ছেলেরা মুখিয়ে থাকতো। ওদের সাথে আড্ডা মারার জন্য ছেলেদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা হয়েছে। কেউ কেউ আবার কাঁচা হাতের কবিতা লিখে মেয়েদের খাতার মধ্যে গুঁজে দিয়েছে। আনন্দ দূর থেকে সব লক্ষ্য করতো। দেখতো মেয়েদের প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে এসব ক্ষেত্রে ? তবে ওর কিছু করার মতো সেরকম দুঃসাহস কোনো দিন হয়নি।

মেয়েরা ঠিক সময়ে কলেজে ঢোকে, ক্লাস করে, মন দিয়ে টিচার্সদের নোট নেয়। আবার অফ পিরিয়ডে ওদেরই কেউ কেউ কমনরুমে বা ক্যান্টিনে মধ্যমনি হয়ে হাসি আর গানে সকলকে মাতিয়ে দেয়। গোটা কলেজে চর্চা ওই মেয়েকে নিয়ে, সকলে তার সাথে আলাপ করতে চায়। জানতে চায় তার বাড়ি কোথায় ?

বাবা কি করে ? বাড়িতে আর কে কে আছে ? ওই মেয়ের ছেলে বন্ধুর সংখ্যা হুড়হুড় করে বাড়তে থাকে। বীথি ছিল ওইরকম ধরণের।

আনন্দ দূর থেকে ওর ব্যাপার স্যাপার দেখে। ওর সম্পর্কে একটা কৌতুহল ওর মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করে। ও জানে বীথি রবিদার বোন। ও যখন কলেজ ছাড়ছে, বীথি তখন কলেজে ভর্ত্তি হল। তারপর থেকে যখনই রবিদার সঙ্গে দেখা করতে ওদের বাড়ি যায়, ওর চোখ দুটো কেবল খুঁজে বেড়ায় বীথিকে। বীথি তখন অনেক ডাগর হয়েছে। সুযোগ পেলেই ওর দিকে তাকিয়ে থাকে আনন্দ। বীথির চোখে চোখ পড়ে গেল ওর বুকের মধ্যে কেমন যেন উথাল পাতাল ঢেউ ওঠে। ব্যাস এইটুকুই ছিল।

এভাবে কেটে গেল কলেজের দিনগুলো। কলেজ থেকে বেরিয়ে ল-তে ভর্ত্তি হল আনন্দ। বীথি তখন কলেজে এসেছে। কলেজে এসে বীথি আরো উচ্ছল হয়ে উঠবে তা নয় একটু একটু করে বদলে যেতে লাগল। আগের সেই উচ্ছ্বাস, চপলতা, ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে গেল। সবার সঙ্গে কথা বলাও কমে গেল আগের চেয়ে। কথা বলে খুব নিচু স্বরে। আগে ছিল প্রগলভ, হল নম্র। আনন্দ ভাবে আশ্চর্য ! বয়ঃসন্ধির পরিবর্তন বোধহয় একেই বলে।

এমন কী হল বীথির ? ও ভাবে। কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করবে রবিদাকে, সাহস হয় না। ওর ক্লাস হয় গোলাপবাগে। বর্ধমানের গোলাপবাগ এই শহরের যেন বৃন্দাবন। কৃষ্ণ রাধিকার প্রেম বিরহের বৃন্দাবন নয়, এ হল এই শহরের প্রেমিক প্রেমিকাদের প্রেমের বৃন্দাবন। এই শহরের রাজা রাণী এক সময় প্রেমের তুফান তুলতে সাজিয়েছিল তাদের সাধের গোলাপ বাগান। দুনিয়ার ভাল ভাল গোলাপের চারা এনে তৈরি করেছিলেন এখানে সুবাসিত গোলাপের বাগিচা। আজ এযুগের রাজা রাণীরা লেখাপড়া শিখতে এসে প্রেম করে সুবাসিত করে রাখে প্রেমের সেই গোলাপ বাগিচাকে। গোলাপ বাগে এই শহরের যৌবন স্বর্গীয় সুধা মন্থন করে তুলে আনে গরল। তাকে শুধু পান করার, উপভোগ করার অপেক্ষা। বীথির সাথে আনন্দর প্রেমের ফুল ফুটল এই গোলাপ বাগেই।

এখানেই পরিচয় ঘটল ওর সাথে। বন্ধুদের নিয়ে কৃষ্ণসায়র পার্কে বেড়াতে এসেছিল বীথি। কী বলবে ! বীথির সঙ্গে পরিচয় হতেই মনটা খুশীতে নেচে উঠল আনন্দর। কিন্তু কয়েক দিন পরই হঠাৎ কলেজে আসা বন্ধ করে দিল বীথি। প্রতিদিন প্রতীক্ষা করে আনন্দ। আর হতাশ হয়। পাক্কা একটা মাস বীথি কলেজে এল না। বাড়িতেও দেখতে পায় না আনন্দ। কোথায় গেল বীথি ?

আনন্দর সতৃষ্ণ নয়ন ওকে খুঁজে বেড়ায় কলেজের করিডোরে, কৃষ্ণসায়র

পার্কে, গোলাপবাগের গাছের তলায়, রমনার বাগানে, ফরেস্টের বসবার জায়গাগুলোয়, মেঘনাদ সাহা তারামন্ডলের রেস্তোঁরাতে। কিন্তু কোথাও ওকে খুঁজে পায় না। গোলাপবাগের শান্তিনিকেতনী পরিবেশ ওর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। গাছেরা ওর ব্যথা বুঝতে পারে। কৃষ্ণসায়রের জল ওর সাথে কথা বলে, ওর ব্যথা ভোলাবার চেষ্টা করে। এখানকার গাছগুলো বিশেষ করে বকুল গাছটা ওকে বলে, বীথি আসবে তুমি আরো কিছুদিন অপেক্ষা কর। চারপাশের সবুজ সুরে সুরে কথা বলে। বলে, বীথি আসবে। তুমি ভেবনা। গোলাপবাগে বৃষ্টির জল মাটিতে পড়লেই পিলপিল করে গাছের চারা বের হয়। চারাগুলো বলে বীথি আসবে। মেঘেদের ভালবাসা এখানে বৃষ্টি হয়ে ঝরলেই কৃষ্ণসায়রের গাছগুলো ফিসফিস করে কথা বলে। বলে বীথি আসবে গো আসবে। আকাশ ছাপিয়ে যখন বৃষ্টি আসে বকুল গাছের নিচে দাঁড়ায় আনন্দ। বকুল গাছ তখন বলে, তুমি বীথির কথা ভাবছে, বীথি আসবে ঠিক !

প্রায় একমাস পর বীথিকে হঠাৎ কলেজে দেখল আনন্দ। নতুন সাজে, নতুন ভাবে। নতুন বীথি আরো সুন্দর হয়েছে। একটু যেন রোগা রোগা। কৃশ, তবু অনেক সুন্দর।

——কোথায় ছিলে বীথি ?

বীথি কিছু বলে না। না বলুক। বীথি এসেছে এতেই আনন্দ খুশী।

দুজনের সম্পর্কটা আবার স্বাভাবিক হয়। ছুটির পর দুজনে দেখা করে নির্দিষ্ট জায়গায়।

গোলাপবাগের গাছের তলায় বসে। বসে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। কত কথা হয় মুখে মুখে। কত কথা হয় মনে মনে। আবার ও ফিরে গেলে মনে হয়, আরো কত কথা বলার ছিল বলতে ভুলে গেছে। চিবুকের তলায় ঘাম জমে চিকচিক করে। কৃষ্ণসায়রের গাছের তলায় দুজনে যখন বসে ওকে দেখে আনন্দ। দিনের শেষ সূর্যের আলোয় ওর মনে হয় বীথি যেন পাথরে গড়া একটা মোম মূর্তি হয়ে আছে। তন্ময় হয়ে চেয়ে দেখে ওকে। একদিন কোথা তেকে উড়ে এসে ওদের পাশে বসল এক ঝাঁক সাদা কতগুলো পায়রা। ওর মনে হল ওরা যেন ফুলপরী, ওদের বন্ধুকে দেখতে এসেছে। কৃষ্ণসায়রের জলে জল ভাঙার চুনচুন শব্দ উঠল। তরতর করে রাজহাঁসেরা জলকেটে ওপরে উঠে এল। আনন্দর মনে হল পৃথিবীটা কী সুন্দর, এই পৃথিবীর সবই কাব্যময়। আর ও যেন স্বর্গের পারিজাত বনে পথ হারিয়েছে। বনলতাদের দলে বীথিকে নিয়ে ও বসে আছে। আর জলপরী ফুলপরীর দল ওদের ঘিরে ধরেছে।

বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে ওর হাতের স্পর্শ নেয়। ওকে বড় মায়াবী মনে হয়। ওর চোখে চোখ রাখে। ভাবে, ওকেই তো আমি বিয়ে করব। ওই হবে আমার সন্তানের জননী। ওর ওই বোকার মতো চেয়ে থাকা দেখে বীথি জানতে চায়, অমন হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কেন বলুন তো ?

আনন্দ বলে, এমনি।

——এমনি ? বীথির ভ্রূ কুঁচকে যায়। প্রশ্ন করে আবার, এমনি !

——হ্যাঁ এমনি। তোমাকে দেখি। আনন্দ উত্তর দেয়।

——কেন ? বীথি জানতে চায়। বলে, আমাকে কি নতুন দেখছেন ? না আমি বিশ্বসুন্দরী ?

আনন্দ বলে, তুমি বিশ্বসুন্দরী নও। তবে আমার কাছে সুন্দরী। তোমার মুখে রঙের খেলা দেখতে পাই।

——রঙের খেলা ? সেটা আবার কী ?

——তোমাকে বোঝাব সে ভাষা আমার জানা নেই। আনন্দ মুখ তুলে কৃষ্ণসায়রের জলে অস্তরাগের ছবি দেখে।

বীথি জিজ্ঞেস করে, আপনি কি কবিতা লেখেন ?

আনন্দ হেসে বলে, বাঙালী ছেলে কবিতা লিখব না ?

——পেট গরম হয়েছে। বীথি ব্যাঙ্গ করে। বলে, কাল গ্যাঁদাল পাতার ঝোল নিয়ে আসব খাবেন।

আনন্দ প্রথমে বুঝতে পারেনি বীথি কি বলল। তাই আবার জানতে চাইল, কিসের ঝোল বললে ?

——গ্যাঁদাল পাতার। হেসে উত্তর দিয়েছিল বীথি।

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠেছিল বীথি। আনন্দ সেই হাসিতে শুনেছিল জলতরঙ্গের সুর। ঝর্ণার মতো কলকল ঝরঝর শব্দ উঠেছিল সেই হাসিতে। কতরকম শব্দ ঝরে বীথির হাসিতে। আনন্দর খুব ভাল লাগে।

এক দুপুরে কৃষ্ণসায়র পার্কে বসে আছে। শীতের শুরু। পরযায়ী পাখির দল তখন আসতে শুরু করেছে। ওরা অতিথি পাখি। যখন আসে দলে দলে আসে ওরা। এখানে ওদের ঘর-সংসার হয়। বাচ্চা হয়। বাচ্চারা বড় হয়। তারপর গরমের শুরুতে আবার ওরা ফিরে যায় যে যার নিজের নিজের দেশে। সঙ্গে নিয়ে যায় নিজেদের ছেলে মেয়েদের। কিন্তু আনন্দর এই প্রিয় শহর যেভাবে দিন দিন কংক্রিটে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে তাতে আগামী শীতে ওরা ফের আসবে কিনা ভাবছিল আনন্দ।

পায়ে পায়ে জলের ধারে গিয়ে বসেছিল। কৃষ্ণসায়রের জলে সম্মোহনের টান আছে। বীথি আপত্তি করছিল জলের অত ধারে বসতে। কিন্তু আনন্দ নিশি পাওয়া মানুষের মতো জোর করে গিয়ে বসেছিল। ওকেও সাথে নিয়েছিল। তারপর হঠাৎ টের পেয়েছিল কখন আস্তে আস্তে পুরন্ত গর্ভিনী চাঁদটা উঠে এসেছে আকাশে। জ্যোৎস্না কখন কৃষ্ণসায়রের জলের বুকে অদ্ভুত একটা বর্ণালি বিছিয়ে দিয়েছিল। প্রাক শীতের তাড়িত বাতাস, জলের মধ্যে নানারঙের বর্ণাঢ্য দ্যুতি তৈরি হয়েছিল। ঠিক সেই সময় দূরের থেকে ভেসে আসা একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর সব মিলিয়ে একটা দুর্লভ রসায়ন তৈরি করেছিল আনন্দর মনের মধ্যে। ঠিক যেমনটা হয়েছিল অনেক অনেকদিন আগে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবের সময়, ঠিক সেই রকমমের। এর বর্ণনা দেওয়া যেন আনন্দর পক্ষে কোনো রকমেই সম্ভব নয়। এক অকল্পনীয় অনুভবে ও আর বীথি দাপিত হয়েছিল ওই সন্ধ্যায়। ওদের অন্তর এক ধরণের বিপন্নতায়, বিস্ময়ে, বেদনায়, আন্তরিকতায় ভরে উঠেছিল। এই আবেগের তাড়না ও 'ফেরোসিটি' ওদের বুকে এই শহর নিলাম হবার ঘণ্টি বাজিয়ে দিয়েছিল। সেদিন আনন্দ খুব দুঃখ পেয়েছিল। কিছু সময়ের জন্য বুঝতে পেরেছিল এই সময় খুব দ্রুত শহর থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। শহর কংক্রিটে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। ভবিষ্যতে অমন চাঁদের হাসির উচ্ছলতা কৃষ্ণসায়রের জলের আয়নায় ভেঙ্গে পড়বে না আর।

বীথির আবেশে মাখা সন্ধ্যায় চাঁদনির আবীরে রাঙা হয়ে আনন্দ যখন বাড়ি ফিরছিল দেখল পাড়ার মোড়ে আড্ডা মারা ছেলেগুলো আলোককে ঘিরে গল্প করছে। আলোক আনন্দকে দেখে বাইক চালিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। আনন্দ আশ্চর্য হল এই ভেবে যে আলোক ওকে এড়িয়ে গেল, না দেখতে পায় নি ?

আনন্দ বুঝল পাড়ার মোড়ের আড্ডা মারা ছেলেগুলো এখন আলোকের সাথে বেশ সমীহ করে কথা বলে। আলোকদা আলোকদা করে অস্থির করে তোলে। আলোকও ওদের সাথে বেশ ভারক্কীচালে কথা বলে। ঠিক যেন ওদের বস্। শেষমেষ এমন অবস্থা হল শ্যামলেন্দু, বিকাশ, রবিদা কেউ আলোকের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না। চোখাচোখি হলেই ওদের ভ্রূ কুঁচকে যায়। সন্দেহ হয়। কোথা থেকে কি হচ্ছে বুঝতে পারে না। বংশীর দোকানে ওদের আড্ডা উঠে যাবার দাখিল হল।

বংশীকে একদিন বলল, চিনি দিতে ভুলে গেছিস ? চায়ে একটু চিনি দে। চা টা মুখে তোলা যাচ্ছে না।

বংশী হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল। বলল, এই বলতে চিনি কম দে, চিনি কম দে।

আজ আবার চিনি বেশি দরকার পড়ে গেল ?

ওর কথাটা আনন্দর ভীষণ গায়ে লাগল। চিনি কমের কথা কোনোদিন বংশীকে বলেছে বলে ওর মনে পড়ল না। ওর তো কোনো সুগার প্রবলেম নেই। তাছাড়া বংশী ওদের কারোর মুখের ওপর জবাব দেয় না। আশ্চর্য ! আজ সবার সামনে ও আনন্দর মুখের ওপর জবাব দিল।

দিন দিন কী হচ্ছে এসব ?



এদিকে পাড়ায় নতুন টেনশন উঠেছে। লাগোয়া রেললাইনের পাশে ঝুপড়িগুলো ভাঙ্গা হবে। ওটা রেলের জায়গা। নোটিশ অনেক আগেই দিয়েছিল রেল। এখন ভাঙ্গবে। দুটো বিশাল পে-লোডার, একটা ভারী ক্রেন চলে এসেছে। ঝুপড়িগুলোতে যারা থাকে তাদের বেশিরভাগই রেলের কর্মচারী। সামান্য কিছু আছে হাসপাতাল আর পৌরসভার কর্মী। এরা জমাদার, ঝাড়ুদার, মেথরের কাজ করে।

শহরের উন্নয়নের সাথে রেলস্টেশনের সম্প্রসারণ হচ্ছে। ঐতিহাসিক শহর এখন বড় হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই মডেল স্টেশন হবে। শহরের নাকের ডগায় স্টেশনের পাশেই বস্তী থাকবে এটা কী সহ্য হয় ? কিন্তু বস্তীর লোকেরা বলে, একদিন এই শহরের প্রয়োজনেই তাদেরকে শহরে আনা হয়েছে, এখানে তাদের বাস করার জায়গা দেওয়া হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ এবার নড়েচড়ে বসে। এতটা তলিয়ে তো কেউ ভাবে নি।

অফিসার বলে, এখন বিজ্ঞানের যুগ, প্রযুক্তির যুগ। এখন ওদের কাজ হবে যন্ত্র দিয়ে। সুতরাং.....।

—ঠিক আছে। কই ডর নেহী।

বস্তীর লোকেরা ধীরে ধীরে জিনিষপত্র সরিয়ে নিতে লাগল। কিন্তু মাথা গোঁজার জায়গাটা একেবারে ছাড়ল না। রাত্রে তারা শুয়ে থাকে নিজেদের জায়গাতেই। বিবি বাচ্চাদের অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সবাই সেটা পারে না। যাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই, সংখ্যায় তারাই বেশি। টেনশন তাই বাড়তেই থাকে। প্রতিদিন বস্তী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কমিটির মিছিল বের হয়। প্রথম প্রথম মিছিলে লোক কম হয়। পরে বেশ লম্বা মিছিল হচ্ছে।

বস্তীর মানুষগুলোর ঘর ঝুপড়ি হলে কী হবে ? অনেকের ঘরেই রঙীন টিভি। অনেকের অবস্থা একেবারে খারাপ নয়। তবে এখানে কারো পায়খানা

নেই। সবাই রেল লাইনের ধারের জঙ্গলে যায়। আর বাথরুম বলতে রেলের বিশাল পুকুরটা। এই পুকুর একদিন লোকো ইঞ্জিনগুলোকে জল খাওয়াতো। কয়লার ইঞ্জিন উঠে গেছে কবে। ভাঙা ফুটো ইঞ্জিনগুলো সার দিয়ে পড়ে আছে। জায়গাটায় জঙ্গল ভরে গেছে। কন্ট্রাক্টরের লোকেরা ইঞ্জিনগুলোকে ভেঙে ভেঙে স্ক্র্যাপ করে বিক্রি করে দিচ্ছে। ঝুপড়ির বাসিন্দাদের কেউ কেউ বলল, রেল আমাদের মাথাপিছু পঞ্চাশ হাজার করে টাকা দিয়ে দিক, আমরা উঠে যাব।

মরা পোড়ানোয় রেকর্ডধারী বুচু বস্তীর লোকেদের লিডার হয়ে গেল। মরা পোড়ানোর তার রেকর্ড দুশো পার হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। সংখ্যাটা পৌরসভার খাতায় রেকর্ড করা নেই তাই নইলে 'গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড'সের পাতায় উঠে যেত। শাসক পার্টির স্থানীয় এম.এল.এ-র সঙ্গে ওর ওঠা বসা। ওর বাবা এক সময় পুরনো কংগ্রেসী আমলে অনেক মার দাঙ্গার রেকর্ড করেছিল। সে সব বুচু'বাবু এখন ধুয়ে মুছে সাফ করে নিয়েছেন। তিনি এখন এলাকার শাসক পার্টির লিডার। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেন। ঠোঁট কাটা কেউ কেউ ওকে দেখিয়ে বলে, একসময় ওদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। বুচুবাবু সে অবস্থাটা পাল্টে নিয়েছেন। ওর গলায় এখন সোনার চেন দোলে। ঠিকই তো নিজের নিজের সমাজব্যবস্থাটাই সকলে পাল্টাতে চায়। তা প্রত্যেকে নিজেদের অবস্থাটাকে নিজেরা যদি বদলে নিতে পারে সেই কাজটাই তো সমাজ পরিবর্তনের ভাবনাটাকে এগিয়ে দেয়।

—দেয় না কি ? রবিদার কথায় জানতে চায় আনন্দ। বলে, তাহলে শুদ্ধিকরন, কমিউনিস্ট আচরণ ইত্যাদি নিয়ে এত কথা বলা হচ্ছে কেন ?

রবিদা বলেন, দ্যাখ এটা একটা বিশাল প্রতিক্রিয়া। চট্ করে একদিনে এই পরিবর্তন রাতারাতি হয়ে যাবে এমন ভাবাটা ভুল।

—তাহলে বলছ, বুচুবাবুদের এই পরিবর্তন তোমাদের গুণগত পরিবর্তন ? আনন্দ রবিদাকে প্রশ্ন করে।

—তুই ব্যাপারটাকে আবার অন্যভাবে গুলিয়ে দিচ্ছিস। বিষয়টা হল নৈতিক অনৈতিকতার এটাই তো বলতে চেয়েছিস ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে দ্যাখ, সামগ্রিক এই পরিবর্তনের লক্ষ্যে চলার পথে এই ধরণের মানুষ আসবে। এদের ব্যবহার করতে হবে যাতে এরা নিজেদের শুধরে নেয় এমনভাবে। যদি না তা হয়, তবে তাড়িয়ে দিতে হবে।

—এইভাবে ঠগ বাছতে যে গাঁ উজার হয়ে যাবে। কিন্তু তা হচ্ছে কই ?

——যেমন বললি সেরকম নয়। কিছু হয়তো আছে, তবে সবটা নয়। সমাজে ভাল মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

সনাতন বুচুকে একদম দেখতে পাবে না। বুচু নাকি তার নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিয়েছে। সনাতনের নাম গ্রামের ভোটার লিস্টেও আছে। কিন্তু প্রধানত ও এখানে থাকে, মাঝে মাঝে গ্রামে যায়। এই নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি। শেষে গ্রাম থেকে নাম কাটিয়ে আসায় ওর নাম এখানে ওঠে। কিন্তু সে নামটাও কাটা গেল। এখন সনাতনের ধারণা এর পিছনে বুচু-র হাত রয়েছে। ও বলে, এইসব লোকেদের জন্য পার্টিটার বদনাম হচ্ছে।

দুপুরবেলায় বস্তীর ছেলেগুলো পাড়ার বাড়িগুলোতে দাপিয়ে বেড়ায়। এসময় সব পুরুষেরা বাইরে থাকে। কোনো কোনো বাড়িতে মহিলারাও থাকে না, তারাও আজকাল কোনো না কোনো চাকরি করে। বাড়ি তখন তালা মারা থাকে। ওরা কার গাছে পেঁপে, কার গাছে পেয়ারা, কার গাছে ডাব, নারকেল সব পেড়ে বেড়ায়। ওদের হাতে মোবাইল ফোন, কব্জিতে রিস্ট ওয়াচ, পকেটে গান শোনার যন্ত্র 'এম পি থ্রি' বাজে। এদের অনেকেরই গোঁফ গজায় নি। বাহারে জামা পড়ে সন্ধ্যের অন্ধকারে গলির মোড়ে বস্তীরই কোনো কোনো মেয়ের সঙ্গে পেয়ার মহব্বত করে। পাড়ার লোকেরা বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পায়, তাদের খুব রাগ। পাড়ার ভেতরে এসব অশ্লীল কাজ! পাড়ার আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে। ওদের ছেলে মেয়েগুলো খারাপ হয়ে যাবে। কেউ ওদের শাসন করলে, বস্তীর ছেলেগুলো দূর থেকে ভেংচি কাটে, ঢিল মেরে গ্রিলের কাঁচ ফাটিয়ে দেয়। বাড়ির পোষা কুকুরকে উত্যক্ত করে। নয়তো ফুলের টব ভেঙে দেয়। আবার অন্য বদমায়েসিও করে। সে সব বলা যাবে না।

পালিত বাবু তো রেগে মাথা গরম করে পাড়াই ছেড়ে দিলেন। হয়েছিল কি, তিনি বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন। স্ত্রী-র বয়সটা ছিল বেশি রকমভাবে কম। সবার চোখে লাগতো। রাত্রিবেলা তাঁর শোবার ঘরের জানলার সামনে বস্তীর ছেলেগুলো প্রায়ই বসে থাকতো। পালিতবাবু একদিন দেখে ফেলেছিলেন। সে এক কান্ড। তারপর জানাজানি হল, ছেলেগুলো প্রায় বাড়িতেই নাকি এইসব কান্ড করে বেড়ায়। সকলেই জানে মেয়েদেব স্নানের সময় বাথরুমের ঘুলঘুলিতে পর্যন্ত ওরা উঁকি মারে। নাইট গার্ডের সঙ্গে রাত্রে ওরাও টহল দেয়, ঘরের ভিতরে ইচ্ছে করে টর্চের জোরালো আলো ফেলে। কারোর কিছু বলার নেই। বললেই সবাই মিলে হামলা করবে। বাড়ির আল্গা জিনিষপত্র যা পাবে চুরির পর বিক্রি করে দেখিয়ে দেখিয়ে মজা করে সেই বাড়ির সামনেই খাবে। বস্তীর

লোকেরা সলিড ভোটার, তাই বুচু'বাবুদের বলে কোনো প্রতিকার হয় না।

এখন পাড়ার লোকেরা খুব খুশি। বস্তীটা এবার তাহলে উঠে যাবে।

পুজোর আগে কয়েকদিন ধরে প্রচন্ড বৃষ্টি হল। ঠান্ডাও পড়ে গেল বেশ। বংশীর দোকানে বসে থাকতে থাকতে বেশ শীত লাগে গেল আনন্দর। হাফ হাতা জামা পড়েছিল। চা খাচ্ছে। কারো কোনো পাত্তা নেই। অনেকদিন তো হল, এবার কোর্টে প্র্যাকটিশ শুরু করবে। বংশী আজকাল ওর সাথে কম কথা বলে। উঠে পড়বে, ভাবছে। এমন সময় শ্যামলেন্দু এল হাঁপাতে হাঁপাতে। বলল, যাক তোর সঙ্গে অন্তত দেখা হল। কাউকেই পাচ্ছি না। আমি জামুড়িয়া চলে যাচ্ছি। ওখানে একটা মাইনসে কাজ পেয়েছি। তুই সবাইকে খবরটা দিয়ে দিস। কবে আবার ফিরব জানি না। আগে তো জয়েন করি। পুজোর ক'দিন নিশ্চয় ছুটি পাব, তখন কথা হবে।

শ্যামলেন্দু চলে গেল। মলয় চলে গেছে নাগালের বাইরে। অসীমা গুরুতর অসুস্থ, কোলকাতার হাসপাতালে। বিকাশ সংসার আর কোর্টের ঝামেলায় জেরবার। রবিদা সাহিত্য করে যাচ্ছে। আলোক আবার নতুন মোটরবাইকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

আনন্দ বংশীকে বলল, চললাম।

বংশী কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। আনন্দ যেন গুরুত্বহীন একজন কেউ, ওর চোখের ভাষা সেটাই বুঝিয়ে দিল। বংশী আনন্দর কাছে শ-দেড়েক টাকা চায়ের দাম পাবে। আনন্দ ঠিক করল কালকেই সেটা মিটিয়ে দেবে।

রাত্রে বাড়ি ঢোকার মুখে আনন্দ শুনল——আজ রাতেই বস্তী ভাঙ্গা হবে। শহরের উন্নয়ণে সেপাই সান্ত্রীরা সকলে সেজে উঠেছে। বিকেল থেকে পুলিশের গাড়ি কয়েকবার ঘুরে গেছে। গুডশেড রোডের মোড়টায় পুলিশের একটা ক্যাম্প বসেছে। বুচুবাবুকে ভাল করে না তেলালে, কিছু বলতেই চায় না। এ স্বভাব ওর পুরনো। বহুক্ষণ ধরে বস্তীর লোকেরা ওকে তেলিয়ে যাচ্ছে। জানি না, জানি না বলে ও কেবল দর বাড়িয়ে যাচ্ছে। শেষকালে 'বস্তী রক্ষা কমিটি'র কালিবাবু বুচু-র হাঁটু ধরে ঝুলে পড়ল। বলল, বাবা বুচু, আমি তোর বাপের থেকেও বয়সে বড়, তোর বাবা আমাকে দাদা বলতো। আমি তোর পায়ে ধরে বলছি। কিছু বল ? আমি জানি, তুই সব জানিস। তুই যা বলবি তাই করব। কিছু অন্তত বল ? তুই বললে আমরাই না হয় নিজেদের বাঁশ টিন দরমার বেড়া খুলে নিই ? না হলে বল, 'জি.আর.পি.'র বড়বাবুকে গিয়ে ধরব ? তাতে কি কাজ হবে ? তুই যদি কিছু না করিস তাহলে বউ বাচ্চা নিয়ে রেলে মাথা দিতে হবে।

বুচু এতক্ষণে মুখ খুলল। বলল, কেন রে হারামজাদা? তখন তো খুব বামপন্থী সেজে ফরওয়ার্ড ব্লক মারাচ্ছিলি? এখন যা! তোদের লিডারগুলোকে ডেকে নিয়ে আয়? তারা এসে বাঁচাবে তোদের?

কথাগুলো বুচু সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বস্তীর লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলল। কিন্তু এইভাবে বলতে কালিবাবু হকচকিয়ে গেলেন।

বুচু আবার পাঁচশো পঞ্চান্ন-র এক মুখ থুতু ফেলে বলল, শালা আমাদের মিছিলে এলে....ফাটবে। তারপর পকেট থেকে পাঁচশো পঞ্চান্ন-র নতুন একটা প্যাকেট বার করে বিশেষ কায়দায় দাঁত দিয়ে সেটা ছিঁড়ে পুরোটাই মুখে ঢেলে দিল। বেশ কয়েকবার থুতু ফেলে আবার কিছু বলতে যাবে বুচু....ঠিক সেই সময় কালিবাবু দুহাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন, 'বু-চু বাবু জিন্দাবাদ!'

সবাই চিৎকার করে উঠল, বুচুবাবু, জিন্দাবাদ! বুচুবাবু জিন্দাবাদ! 'বস্তী উন্নয়ণ সংগ্রাম কমিটি——জিন্দাবাদ!'

এক লহমায় 'বস্তী রক্ষা কমিটি'র অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেল। 'বস্তী উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটি——জিন্দাবাদ!' ধ্বনি নতুন শক্তিকে সংহত করল। ক্রমশ একটা মিছিল, তারপর একটা সমাবেশ তৈরি হয়ে গেল।

বুচু পকেট থেকে বিদেশি সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করল। ঝলমলে সোনালী লাইটার তার হাতে গান গেয়ে জ্বলে উঠল। কয়েকবার সিগারেটের লম্বা ধোঁয়া ছাড়ল বুচু। শ্লোগান শেষ হলে জনগণের দিকে ঘুরে সিগারেটটা প্রথমে টোকা মেরে দূরে একপাশে ফেলে দিল। যে ছেলেগুলো নতুন সিগারেট ধরেছে, তারা মনে মনে বলল, অ্যাই বাপ, অতবড় সিগারেটটা ফেলে দিল? একটা বাচ্ছা ছেলে ফেলে দেওয়া সিগারেটটা কুড়িয়ে নেবার ধান্দায় কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে বুচু বলল, যান, সবাই নিজের নিজের ঘরে ফিরে যান। সামান্য ভাঙ্গাভাঙ্গি ছাড়া তেমন কিছু এখন হবে না। আমি কথা বলছি। 'কালিদা' আপনি নামের একটা লিস্টি করুন, সবাই ঘর পাবে।

কালি জ্যেঠু হঠাৎ কালিদা হয়ে যেন ধড়ে নতুন প্রাণ পেলেন। তিনি আরো জোড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বুচুবাবু জিন্দাবাদ'!

জনগণ 'বুচুবাবু জিন্দাবাদ'! 'বুচুবাবু, জিন্দাবাদ'! ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। তারা 'বস্তী উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটি——জিন্দাবাদ!' ধ্বনি দিতে দিতে স্বস্তিতে ঘরে ফিরল। কালিদা কয়েকজনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নামের

লিস্ট করতে।

এইসব তালে গোলমালে রবিদা বংশীর দোকানে আসা বন্ধ করে দিয়েছে খেয়াল হয় নি আনন্দর। খেয়াল হল ষষ্ঠীর দিন। সর্বমঙ্গলা বাড়ি থেকে পূজো দিয়ে পাড়ার পুজো প্যান্ডেলের সামনে রিক্সা থেকে নামল রবিদা আর বুচু মানে বুচুবাবু। সবাই দেখল, দুজনের কপালে সিঁদুরের রক্ততিলক। হাতে পুজোর পেসাদী ফুলের ঝুড়ি। পড়নে ধোপদূরস্ত ধুতি আর গিলেকরা পাঞ্জাবী।

——আয় রে। বলে সকলকে ডেকে দুজনে সর্বমঙ্গলার প্রসাদ খাওয়ালেন।

জানা গেল দুজনে মিলে দশ চাকার ট্রাক কিনেছেন। এই খুশিতে আনন্দ'দের মাংস ভাতের নেমন্তন্ন হল। বংশী বলল, তার উপোষ আছে। মাংস-টাংস খাওয়া চলবে না। শুনে আনন্দ মন্তব্য করল, শালা ! ঢেমনা।

সমস্ত পুজোটা নিবিড় আনন্দে কাটাল আনন্দ। নতুন চাকরি তাই শ্যামলেন্দু আসতে পারে নি। ভোরে শিউলির গন্ধে ওঠে আর রাত্রে হেমন্তের শিশিরে সিক্ত হবার আগেই শুয়ে পড়ে। এমনি করে পুজোটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। বাঁশ ফেলে দশ দিন ধরে রাস্তা বন্ধ। পুলিশ বলে গেছে, প্রতিমা আজ বিসর্জন করতেই হবে নইলে পুলিশই বিসর্জন করিয়ে দেবে।

তাসা পার্টি এসে গেছে। বস্তির ছেলেরা বিকেল থেকে ঠ্যাং নাচাচ্ছে। পার্কাস রোডের মুসলমান পাড়ার ছেলেরাও কম যায় না। ওরাও ড্রেস করে এসে পাল্লা দিয়ে বডি কাঁপাচ্ছে। নতুন শাড়ি পড়া মেয়েগুলো টেরিকাটা পরী হয়ে ওদের চারপাশে ঘুরঘুর করছে। কয়েকজনার বিকেল থেকে দু-চারবার ড্রেস চেঞ্জ হয়ে গেল। ড্রেস চেঞ্জ, মেকাপ চেঞ্জ——শুধু নয়, কারো কারো সঙ্গীও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ড্রেসের সঙ্গে সঙ্গে। বিকালে ঘুরলো চ্যাঙ্কির সঙ্গে যে মেয়ে, সন্ধ্যায় ঘুরছে কালুয়ার সঙ্গে, একটু বেশি রাতে আবার সেই মেয়েই রাকেশের হুড়িবাবার পিছনে বসে পরী হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে শহরময়। ঠাকুর দেখার নাম করে ঘুরছে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে।

দুর্গা পুজো আজ ফিনিস হয়ে যাবে। মা দুর্গা চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি। সবার মন ভীষণ খারাপ। তাই যত পারছে বেশিক্ষণ কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছে। ওদিকে বল সবাই দুর্গা মাই কী জয় বলে চেঁচিয়ে উঠল কেউ। তাসা বেজে উঠল খলবল করে। আর র‍্যাঙা ছেলেগুলো হিলহিলে কোমর দোলাতে শুরু করল। দু-চারটে সিটি বাজল——"হুই হুউ" !

তাসা পার্টির লোকগুলো রাস্তা থেকে কাগজ কুড়িয়ে কুড়িয়ে আগুন

জ্বালছে। ওদের তাসা গরম করতে হচ্ছে। তাসা গরম না রাখলে ভাল রিদম তোলা যায় না। জব্বর ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। বৃষ্টি হওয়ার ফল।

বুচুবাবু আজ রেলা দিচ্ছে খুব। কাঁথা স্টিচের পাঞ্জাবীটা যা ছেড়েছে, সবাই দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারছে মালটার দাম আছে। রেলার চোটে কারো সাথে ভাল করে কথাই বলছে না। পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট বলে কথা! বুচুবাবু আজ দারুণ মুডে। প্যান্ডেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুর দেখতে এসে সকলেই দেখা করে হেসে হেসে কুশল জানতে চাইছে, 'বুচুবাবু, আজ হক্কালে আপনেরে টিভিতে দ্যাইখলাম। হেই পাঞ্জাবীটা আপনারে দারুন লাগসিল। ব-অম্বে থেকে আনাইলেন বুসিই?'

বুচু কাউকে ঘাড় নেড়ে, কাউকে হাসি মুখে উত্তর দিচ্ছে। হাতের মোবাইল, সিগারেটের প্যাকেট দুটোই নতুন ব্রান্ড। গলায় ঝোলানো সোনার চেনটা পাঞ্জাবীর ওপরে দুলছে, মালটা আজই ডেলিভারী নিয়েছে। আলো পড়ে ঝকঝক করছে। পাক্কা পাঁচ ভরির মাল।

থানার বড়বাবু জীপ থেকে নামলেন। হেঁটে এলেন বুচুবাবুর সামনে। 'সাহা দা, আপনি ভাল আছেন?' বুচুবাবু হেসে বিগলিত প্রাণ, যেন বলুন স্যার আপনার জন্য কি করতে পারি? জোড়হাতে একেবারে বড়বাবুর সামনে।

'সাহা দা'! থানার ওসি বুচুবাবু-র শালা না ভগ্নীপতি? বুঝতে পারে না আনন্দ। সে দেখে বড়বাবু বুচুবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু করতে হবে কিনা?

বুচুবাবু বললেন, নো টেনশ্‌ন স্যার। প্লিজ কোনো টেনশন করবেন না। "ওল কোয়ায়েট! কুলকুল"——একদম ঠাণ্ডা আছে।

বড়বাবু হাসলেন। জীপে ওঠবার আগে বললেন, বিজয়ার মিষ্টিটার খুব প্রশংসা করছিলেন আপনার বৌদি। ওর খুব ভাল লেগেছে।

——তাই বুঝি? বুচুবাবু গাল ভর্ত্তি পাঁচশো পচপন্নের হাসি উপহার দিয়ে বললে, বৌদিকে আমার নমস্কার জানাবেন।

দুটো ছেলে পান গুমটির পেছনে অনেকক্ষণ পেট্রল মুখে নিয়ে আগুন প্রাকটিস করছিল। তারা যখন আগুন করছিল, আলো হয়ে যাচ্ছিল গুমটির পেছন দিকটা। বেশ কিছু লোক জড় হয়ে ওদের উৎসাহ দিচ্ছিল টিপস্ দিয়ে। ওদের অনুরোধ করছিল, আরো বড় আগুন করবার জন্য। পুজো প্যান্ডেলের একপাশে বুড়োদের একটা দল তখন তাসের জুয়া খেলছিল। ওই আগুনে ভয় পেয়ে ওরা খেলা বন্ধ করে উঠে পড়ল। যারা হেরে যাচ্ছিল তারা রেগে গেল।

পাড়ার বয়স্ক মহিলারা সিঁদুর খেলার জন্য এসে জড়ো হয়েছে। কিন্তু প্রতিমা এত উঁচুতে যে তার পায়ের নাগাল পাচ্ছে না কেউ। তারা কেউ সিঁদুর ঢালতে পারছে না মায়ের পায়ে। বুচুবাবু এগিয়ে এলেন ওঁদের উদ্ধার করতে। উপরে ওঠার সিঁড়ি জাতীয় একটা বেঞ্চ মুহূর্তে চলে এল পাশের গ্যারেজ থেকে। হুলুধ্বনিতে জমে উঠল মহিলাদের সিঁদুর খেলা।

যে ছেলেদুটো মুখে আগুন প্র্যাকটিস করছিল, তাদের একজন কোমর থেকে চেপ্টা একটা বিলিতী মালের বোতল বের করল। ছিপিটা খুলে চোঁ করে দু-ঢোক মেরে শেষ করে দিল। টুপ করে, আওয়াজ, খালি বোতলটা গিয়ে পড়ল নতুন তৈরী হওয়া একটা লরীর মাথায়। এদিক ওদিক চেয়ে তাসা পার্টির লোকগুলোকে ছেলে দুটো ডাকল হাত নেড়ে। বলল, তোরা কি....এসেছিস যে ওইখানে বসে বসে কুড়কুড় করছিস ?

অন্যজন বলল, মাগনা এসেছিস নাকি বে ? পয়সা লিবি না ? এদিকে আয়, শালা। বাজা। দেখি তোদের ক্যাওড়ার জোড় কত ?

তাসা পার্টির লোকেরা বাজনা জুড়ল, লে ক্যাওড়া.....। পেছনে পাড়ার যত ছেলের দল এক পাল বাচ্চা সমেত এগিয়ে এল। ওদের পিছনে পিছনে এগিয়ে এল উঠতি মেয়েদের দলটা। ফাঁকা জায়গাটা নিমেষে ভরে গেল।

——হাই বেবি ?

ক্যাঁচ-শব্দ করে একটা মোটর বাইক আনন্দর সামনে এসে দাঁড়াল।

আনন্দ দেখল, আলোকের নতুন বাইক, সঙ্গী নতুন একটি মেয়ে। চড়া মেকআপে মেয়েটি নামল বাইক থেকে। চেহারা এমন কিছু নয়, তবু চোখ কাড়ল। একটু মোটা, চোখ মুখ খুবই সাধারণ মাপের। কিন্তু ড্রেস সিনেমার উঠতি নায়িকাদের মতো। সব মিলিয়ে সাজটায় একটা উগ্র চটক আছে।

——এটা কি পুরসভা না পঞ্চায়েত রে ? তোরা কি হিজড়ে পাড়ায় থাকিস নাকি আনন্দ ?

জমা জলের পাশে সাবধানে পা নামাল আলোক। তারপর বলল, কেমন আছিস ?

——ভাল। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল আনন্দ।

এপাড়া ছেড়ে উঠে গেছে আলোক। সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও তুলে নিয়ে গেছে। ওর সাথে বেশি কথা না বলাই ভাল। মেয়েটি গুটিগুটি পায়ে প্যান্ডেলে ঢুকে গেল ঠাকুর দেখতে। পাড়ার ছেলেগুলো ঘুরে দাঁড়াল। কেউ কোনো

আওয়াজ দিল না কিন্তু, যেন আলোকদার জিনিষ। সবার এই সম্ভ্রমে অবাক হল আনন্দ। অন্য কোনো মেয়ে হলে অন্তত দু-চারটে সিটি পড়তোই।

আলোক কিন্তু ঠাকুর দেখতে নামল না। বলল, আমার অফিসে নতুন জয়েন করেছে। নৈহাটি বাড়ি, বর্ধমানের ঠাকুর দেখতে চাইল তাই নিয়ে এলাম।

——ভালই আছিস। বলল আনন্দ।

আলোক হাসল। ঠাকুর দেখে মেয়েটি আবার এসে বসল ওর পিছনে। ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলল, আলোকদা এবার লালটু সংঘ দেখব। ওটা ফার্স্ট হয়েছে। টিভিতে দেখাচ্ছিল, কী বিশাল প্যান্ডেল করেছে। চলুন না ?

আলোক মুহূর্তে বাইকে স্টার্ট দিল।

——বাই। চলি রে।

হুশ করে আলোকের বাইক উড়ে গেল মেয়েটিকে নিয়ে।



কালীপুজোর পর আনন্দ একটা চাকরি পেল দীপ্তিকাকুর সৌজন্যে। দীপ্তিকাকু বললেন, ঠিক আছে, তুই ওকালতি করবি কিনা তুই ঠিক করনা ? এই কোম্পানীতে জয়েন করে দ্যাখ, কাজটা যদি ভাল লাগে করবি, নইলে ছেড়ে দিতে কতক্ষণ ? ভাল মাইনে দেবে। একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছিল। আমি তোর কথা বলাতে, ওরা অ্যাকসেপ্টকরেছে।

কোলকাতার নামকরা জুতোর কোম্পানী। এই শহরে নতুন শোরুম খুলেছে। পুজোয় ভাল বাজারও পেয়েছে। 'ইনসেনটিভ' দিতে হবে বলে পুজোর আগে লোক নেয় নি। পুজোর পরে চারজন লোক রিক্রুট করেছে। বাজেপ্রতাপপুরে ওদের গোডাউন। সেই গোডাউনের স্টোর ম্যানেজারের চাকরি। বেশি পরিশ্রমের নয়, আদপে বলতে গেলে দারোয়ানের চাকরি। গালভরা নাম দিয়েছে, স্টোর ম্যানেজার। খুব হিসেব রাখতে হয়। একটা মেয়ে ওখানে আনন্দর আগেই ঢুকেছিল। কয়েকদিন যেতে না যেতেই দেখে ও আনন্দের গায়ে পড়তে শুরু করেছে। ভেবেছে আনন্দ বোধহয় মালিকপক্ষের কোনো আত্মীয় টাত্মীয় হবে। ম্যানেজেরিয়াল পোস্টে চলে এসেছে সটান ডাইরেক্ট।

প্রথম দর্শনেই নজরে পড়ে মেয়েটির পিঠের ওপর দিয়ে নেমে যাওয়া মস্ত একটা বেণী। ছোট এতটুকু মুখ, মুখের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে বড় বড় দুটো চোখ।

মেয়েটি ওর সঙ্গে খুব মিশবার চেষ্টা করছে। ওর কাজগুলোও করে দিতে চায়। ঘনিষ্ঠ হবার খুবই চেষ্টা করছে। দেখতে খুব একটা মন্দ নয়। শ্যামলা গড়ন, বেণীসংবদ্ধ ছিমছাম চেহারা। তবে একটা উজ্জ্বলতা আছে। হঠাৎ ওর প্রতি তার এমন মনোভাবের কারণ কি বুঝতে পারে না আনন্দ। বুঝতে পারে না মেয়েটি কেন তার রুদ্ধশ্বাস জীবনে খুশির দমকা বাতাস বইয়ে দিতে চাইছে। ওর মনে প্রশ্ন জাগে, একেই কী বলে, প্রথম দর্শনেই প্রেম ? কলকল করে কথা বলে মেয়েটি আর ওই সুরের কলধ্বনিতে সকলকে গলা মেলাতে বাধ্য করে।

আনন্দ একদিন বাড়ি ফিরে শুনল মা'র সঙ্গে আলাপ করে গেছে মেয়েটি। আবার একদিন শুনল, মা'কে প্রণাম করে তাঁতের একটা নতুন শাড়ি দিয়ে গেছে। মেয়েটিকে ওর মার খুব ভালও লেগেছে। ওর মা কথায় কথায় আজকাল মেয়েটির খুব প্রশংসা করে ওর কাছে।

এ দেখছি ভাল গেরো হল ? আনন্দ বিরক্ত হয়। ও এসব ফালতু ঝামেলায় জড়াতে চায় না। ওর সঙ্গে আনন্দর বয়সের ডিফারেন্স অনন্ত দশ বছর। তাছাড়া.....।

আনন্দ মা'কে বলে, মা আমি যে কাজটা করি, সেটা একটা দারোয়ানের চাকরি। তুমি যেন ওই মেয়েটাকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন-টপ্ন দেখো না। আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। এই মাইনেতে বিয়ে করার সাহস দেখানো যায় না মা।

আনন্দ জানল, মেয়েটি ওর মা-কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছে, ও নাকি কোম্পানীর হিসেবপত্র দেখাশোনার কাজ করে। কাজটা ম্যানেজারের। আনন্দ সত্যি কথাটা লুকিয়েছে। বেতন পায় দশ হাজার টাকা।

ওর মা আনন্দকে কোম্পানীর ম্যানেজার ভেবে ভুল বোঝে। ভাবে আনন্দ আরো বেশি বেতন পায়। বাড়িতে কম বলেছে। মেয়েটিকে একারণে আনন্দর খুব বিরক্তিকর বলে মনে হয়। মিথ্যেবাদী মেয়েরা কি ভাল হয় ?

স্টোরকীপারের চাকরি করে বলে মোটেও ওর খারাপ লাগছিল না। গোডাউনের হিসেব রাখা ওর কাজ। কখন কত মাল ঢুকছে, কখন কত মাল বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম বা অন্যত্র গেল কম্পিউটারে সব হিসাব তুলে রাখা হচ্ছে কিনা, সেটা দেখাই ওর কাজ। কম্পিউটারে সব হিসাব লেখার পর আনন্দ 'ও কে' করলে তবেই 'গেট পাস' ইস্যু করা হয়। তবে মাল বাইরে যাবার ছাড়পত্র পায়। এই কাজে দুঃখ হবে কেন ? ও তো জেনে গেছে, ওর কোনো পে

ডিগ্রী নেই। কোয়ালিফিকেশন যাই হোক না কেন, আজকাল পেডিগ্রীও থাকা চাই। মামা থাকা চাই, নইলে চাকরি হয়তো পাবে পোস্টিংটা হবে দূরে।

আনন্দ জেনে গেছে জীবনের আসল সত্য, একজন পাবলিক বাঁচে বা মরে এদুটোর কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু মেয়েটা ওকে কেন ঝামেলায় জড়াতে চাইছে আনন্দ বুঝতে পারে না তা। মেয়েটা দুর্গাপুরে দাদার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। পড়াটা শেষ হয়নি। এর মধ্যেই চাকরিতে কেন ঢুকল বোঝা মুশকিল। হয়তো স্বাধীন হতে চেয়েছে, নইলে চাকরিটা ওর খুব দরকার ছিল কী ? ফর্সা নয়, ছোটোখাট পুতুল পুতুল চেহারা। ডান নাকে মেয়েটা একটা নাকছাবি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। আজকালকার মেয়ে নাকছাবি পড়ে, আনন্দ তো অবাক ! চাকরি করতে এসে পরিচয় মাসখানেক, এরই মধ্যে ও আনন্দর জীবনের অনেকখানি জেনে নিয়েছে। অথচ আনন্দ ওর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না। মেয়েরা বোধহয় এরকমই হয় !

সারাদিন ওরা একই ছাদের নিচে বসে ডিউটি করে। দুজনের ঘর পাশাপাশি। ঘর মানে কিউবিকল। কাঁচের পার্টিশন। দুজনে দুজনকে দেখতে পায়, কথা বলার প্রয়োজন হলে ইন্টারকম ব্যবহার করতে পারে। কম্পিউটার নিয়ে দুজনা দুজনার হাত পা নড়াচড়া মুভমেন্ট লক্ষ্য করে। মাঝে মাঝেই বুঝতে পারে মেয়েটি ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কাজ ফেলে। আনন্দর অস্বস্তি হয়। যখন কেউ থাকে না, মেয়েটি ওকে ভেঞ্চি কাটে, বক দেখায়। আনন্দ বাধ্য হয়ে ধমক দেয় ইন্টারকমে। বলে, এসব কেন করেন আপনি ? কেউ দেখলে কী ভাববে ?

মুখ নিচু করে আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াতে জড়াতে মেয়েটি বলে, বেশ করি। আরো করব। লোকে ভাববে বলেই তো করি।

——কী রকম মেয়েরে বাবা ! এরকম ডেসপ্যারেট মেয়ে আমি দেখিনি। আনন্দ আশ্চর্য হয়। গোডাউনটা বিশাল, ওরা দুজন ছাড়াও গোডাউনে আরও চারজন পোর্টার আছে। মাঝে মাঝে ক্যাজুয়েল আরো পোর্টার নিতে হয়। কোম্পানীর ব্যবসা দিন দিন বাড়ছে। শহরের বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা সিনেমা হল কেনবার কথা চলছে। সিনেমা হলটা কিনে কোম্পানী জুতোর একটা বড় গোডাউন করতে চায়। কথাবার্তা প্রায় ফাইনাল স্টেজে চলে গেছে। প্রতিদিন প্রচুর মাল আসছে। ছুটির পরও আনন্দকে বেশ কিছুক্ষণ থাকতে হয়। মেয়েটা তাতে রেগে যায়। ও ভাবে ওকে অ্যাভয়েড করবে বলেই আনন্দ ইচ্ছে করে বসে থাকে। মেয়েটির ইচ্ছা ছুটির পর আনন্দের সঙ্গে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে একসাথে

ফেরে। স্টেশন পর্যন্ত ওদের দুজনের রাস্তা একই দিকে।

ওদের স্টোরের বাইরে একটা মাঠ আছে। তার এক পাশেই বড় একটা তালপুকুর। কতগুলো তাল গাছ আছে আর একটা বট গাছ ঘিরে পুকুরটাকে। বট গাছে প্রচুর পাখি এসে বসে। ওদের মধ্যে কি একটা পাখি জোরে জোরে শিস্ দেয়। আনন্দর খুব ভাল লাগে শিসটা। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়। দুপুরে পাখিটাকে খোঁজে, খুঁজে পায় না। প্রতিদিন দুপুরবেলা টিফিনের সময় পাখিটাকে খোঁজা ওর একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর মনে হয় পাখিটার মন যেদিন ভারি থাকে সেদিন ওর সুরের মাধুর্য তেমন খোলে না। সেদিন আনন্দর মনটাও ভারি হয়ে যায়।

মেয়েটা এসব দেখে আনন্দকে কবি-কপি-ভীতু-কাপুরুষ এইসব বিশেষ বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করে দুয়ো দেয়। বাড়ি ফেরার পর এখন আনন্দর কাজ টিভির চ্যানেল সার্ফিং করা। কোথাও বের হয় না। প্রয়োজনগুলো বেশির ভাগ টেলিফোনে সেরে নেয়। মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হলে ছুটির দিন বংশীর দোকানে যায়। চুপচাপ গিয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। ওখানেও কেউ আসে না। আড্ডা ফাড্ডা সব বন্ধ হয়ে গেছে। কুন্তী-কুন্তী দত্ত মানে এই মেয়েটি বুঝে গিয়েছিল আনন্দ ওকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। একদিন ছুটির সময় গোডাউনে কেউ ছিল না। নাইট গার্ড ছেলেটা তখনও আসে নি। কুন্তী ওর কাছে এগিয়ে এল। বলল, বাড়ি যাবেন না ?

আনন্দ বলল, যাব। একটু দেরী হবে আমার। ওরা কেউ নেই। আসুক। তারপর যাব।

কুন্তী ওর কাছে এসে বলল, আপনি আমাকে অ্যাভয়েড করেন কেন বলুন তো ? আপনার কি আর্বান মেয়ে পছন্দ নয়, চাই ভিলেজ টাইপ ?

আনন্দ অবাক হয়ে জানতে চাইল, মানে ? আপনি কী বলতে চাইছেন ?

—আহা ! যেন ন্যাকা, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না ! বলে কুন্তী দত্ত আর দাঁড়াল না। আনন্দকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে হনহন করে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

শেষ অবধি পাড়ার লোকের প্রচুর জ্ঞান শুনে আনন্দ সেদিন বাড়ি ঢুকল। ওর মতো ক্যালাস ছেলে নাকি আজকাল হয় না। সনাতন, সে কিনা বাড়ির চাকর। তাকে সঙ্গে নিয়ে ও মাকে পুরী বেড়াতে পাঠিয়েছে।

আসলে ঘটনা হল, পাড়া থেকে একটা বাস ছেড়েছে ভুবনেশ্বর পুরী কোনারক ঘুরে আসবে। তাতে যাচ্ছে সবাই পাড়ারই লোকজন। মাকে এই

সুযোগে পাঠিয়ে দিয়েছে আনন্দ। বুড়ো মানুষ একা যাবে, সনাতনকে তাই যেতে বলল, খরচ একটু বেশি পড়ল। তা হোক। এজন্য সবাই ওকে বলছে, ও নাকি কলিযুগের বোকা রামচন্দ্র। পাড়ার লোকেরাই তো যাচ্ছে সুতরাং ওকে আবার মা'র সঙ্গে পাঠাবার কি দরকার ছিল ?

ঘর খোলা ছিল না বলে কাজের মাসি বকতে বকতে চলে গেছে। সন্ধ্যে থেকে আধঘণ্টা সে নাকি বাড়ির সিঁড়িতে বসে ছিল। এই আধঘণ্টায় সে পাড়ার লোকেদের কাছে ওর সম্পর্কে প্রচুর ভবিষ্যতবাণী করে গেছে। আনন্দর যে পথে বসতে বেশি দেরি নেই, কথাটা পাড়ার লোকেদের সে খুব ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। মাথা খারাপ না হলে কেউ বাড়ির চাকরকে খরচা দিয়ে তীর্থ করতে পাঠায় ? উল্টো দিকের বাড়িতে ভাড়া থাকা মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের রোগা বউটা হলুদ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে আনন্দকে সব রিপোর্ট করল। বলল, কাজের মাসি বলে গেছে, সে আরো দুদিন আসবে না। গাজন দেখতে বাপের বাড়ি যাবে। ওর সঙ্গে দেখা হল না বলে এমাসের মাইনেটা আগাম নেওয়া হল না এই বলে সে আক্ষেপ করছিল।

আনন্দ এতক্ষণে বুঝল কাজের মাসির আসল রাগের কারণটা। আসলে তার টাকা পাওয়া হয়নি। তাই এত রাগ।

এঁটো বাসন মেজে, ঘর ঝাঁটা দিয়ে স্নান করল আনন্দ। তারপর চা খাবে বলে রান্নাঘরে ঢুকল। টুং টাং কলিং বেলটা তখনই বেজে উঠল। এরকম সময় আবার কে আসতে পারে ?

দরজা খুলে ভ্যাবাচ্যাকা খেল আনন্দ।

উল্টোদিকের বাড়ির বৌদি, তার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার। ভদ্রমহিলা বললেন, কোথায় নামাব বলুন ? মাংস আছে। আমি জানি মাসিমা এঁটোকাটার খুব বিচার করেন।

——এসব আবার কেন ?

——কাজের লোক আসেনি বলে না খেয়ে থাকবেন ? রান্নাঘরে কি করছিলেন, চা ? সরুন আমি করে দিচ্ছি।

——না না। ও আমার অভ্যেস আছে। আনন্দ আপত্তি জানায়।

——সরুন তো ? সারাদিন কাজ করে এসেছেন। আপনি বসুন, আমি চা করে খাওয়াচ্ছি।

বোকার মতো বসে পড়ল আনন্দ। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। কিন্তু ও খুব ঘামছে। এক মিনিটের মধ্যে চা হয়ে গেল। বৌদি টেবিলে চা নামিয়ে রেখে

বললেন, টিফিন ক্যারিয়ারটা ধুতে যাবেন না যেন। সিংকে নামিয়ে রাখবেন, আমি নিয়ে যাব। যে ক'দিন মাসীমা নেই দু-বেলা টিফিন বক্সে পার্সেল পাঠাবো, রান্না করবার চেষ্টা করবেন না। চললাম, আমাদের দরজা খোলা আছে।

আনন্দের সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপ। পাশে নামানো স্টিলের টিফিন ক্যারিয়ার। গরম মাংস আর পরোটা ভরা আছে ওতে। সঙ্গে আছে মিষ্টি। বৌদী চলে গেছেন। ওর ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কিন্তু রয়েই গেল।

টেলিফোনটা বাজল সেই সময়। আনন্দ চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে টেলিফোন ধরল। আকাশভাঙা কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আলোকের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হল আনন্দ। আলোক বহুদিন পাড়া ছেড়েছে। শহরের জেলখানার মোড়ে নতুন যে হাইরাইজ বিল্ডিং কাম শপিং কমপ্লেক্স হয়েছে 'বর্ধমান গৌরব'। সেখানকার বারো লাখি ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে বউকে নিয়ে। পাড়া থেকে বেশি দূরে নয়। ওদের পুরনো বাড়িতে এখন থাকে ওর ছোটো ভাই। আলোকের বউ অন্তরা ডেকেছে আনন্দকে। অন্তরা খুব ভাল মেয়ে। আনন্দের পাড়ারই মেয়ে। যদিও ওদের বিয়ে হয়েছে সম্বন্ধ করে। বাড়ি থেকে বের হবার সময় টের পায়নি মেঘ উঠেছে। মাঝরাস্তায় ঝড় উঠল। সেই সঙ্গে নামল বৃষ্টি। কখন থামবে তার ঠিক নেই, অনেকদিন পরে বৃষ্টি নেমেছে। ভাল লাগছিল বৃষ্টিতে ভিজতে, ভিজতে ভিজতে হাঁটছিল ও আর বিকাশ।

অন্তরা ফোনে বলেছে, খুব জরুরী দরকার। পারলে এক্ষুনি আসুন।

কী ব্যাপার কিচ্ছু জানে না। আলোকের সঙ্গে দেখা হয় নি অনেকদিন। আনন্দ তাই ভাবছিল, ওর শরীর খারাপ নয় তো?

এইসব ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল আর বৃষ্টিতে ভিজছিল। অন্তরা বি এ পাশ। আলোক বিয়ের আগে থেকেই ওকে চিনত। আনন্দও চিনত। অন্তরাও চিনত ওদের দুজনকে। তবে বিয়ের আগে কখনও ওরা কথা বলেনি, একসাথে কোথাও বের হয় নি। অন্তরার সাথে কেউ না কেউ থাকত। ওদের বাড়ির শাসন ছিল কড়া, মেয়েদের একা বাড়ির বাইরে ছাড়ত না।

আলোক যে ওকে বিয়ে করতে চায়, তা আনন্দ বা কাউকেই জানায় নি কোনোদিন। ব্যাপারটা হঠাৎ-ই ঘটেছিল। আলোক ওর ভাল লাগার কথা ওর দিদি আর মাকে বলেছিল। তারপর সম্বন্ধ করে বিয়ে ঠিক হয় ওদের।

আলোকের ফ্ল্যাটে ঢোকা মাত্র অন্তরা ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ড্রয়িং রুমের সোফায় আনন্দ দেখে পরপর বসে আছে আলোকের জামাইবাবু, অন্তরার এক কাকা, বয়স্ক আরো একজন যাকে ও এবং বিকাশ চেনে

না। উল্টোদিকের সোফায় বসেছিল একটি কমবয়সী মেয়ে। মেয়েটি কিছুটা জড়োসড়ো বয়ে বসে ছিল। একে কোথায় যেন দেখেছে দেখেছে মনে হল আনন্দর। বিকাশ ইসারা করল সেও দেখেছে। মেয়েটি মাথা নিচু করে ঘরের মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হাতের নখ খুঁটছিল। আলোক নেই, রিমঝিম ওদের ছেলেদুটোকেও দেখতে পেল না। রান্নাঘর থেকে আনন্দ আর বিকাশের দিকে ছুটে এল অন্তরা।

——আপনি জানতেন না ?

——কি জানত না ? অবাক হল আনন্দ।

আলোকের জামাইবাবু অন্তরাকে চুপ করতে বলল। কিছুটা ধাতস্থ হবার পর আনন্দ যা জানতে পারল তা ওর অবাক হবার পক্ষে যথেষ্ট। এই মেয়েটি আলোকের কোম্পানীতে কাজ করে। বেশ কিছুদিন ধরে আলোকের সঙ্গে একসাথে ঘুরছে। আগে এ বাড়িতে আসতো চোরের মতো সন্তর্পণে, মতো আজ এসেছে বুক চিতিয়ে। মুখ তুলে যে মেয়ে কোনোদিন কথা বলেনি, আজ সে মেয়ে বলেছে, সে নাকি প্রেগনান্ট। আর এজন্য দায়ী আলোক।

কী সাংঘাতিক কথা ! মেয়েটি সকালে যখন এ বাড়িতে এসেছে, আলোক তখন ঘুমুচ্ছিল। আলোক ঘুম থেকে উঠে ওকে দেখে তুমুল চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছিল প্রথমে। অন্তরা বকাবকি করাতে, সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। অন্তরা তখন ফোনে আলোকের দিদি জামাইবাবু আর নিজের কাকাকে ডেকেছে। দিদি আসেনি। ওই বয়স্ক ভদ্রলোক কোম্পানীর ম্যানেজার। তিনি দক্ষিণ ভারতীয়, তবে বহুদিন কলকাতায় বাস করছেন তাই বাংলাটা ভালই বোঝেন, বলতেও পারেন ভাঙা ভাঙা। নিজেই অফিসের প্রয়োজনে আলোককে ফোন করেছিলেন। অন্তরা ফোনটা ধরেছিল, সব শুনে ওঁকে বাড়ি আসতে অনুরোধ করে। আলোক ওর কোম্পানীর খুব এফিসিয়েন্ট ফিল্ড অফিসার। তবে কথায় কথায় জানা গেল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ভদ্রলোকটি এই ব্যাপারেই আলোককে ফোন করেছিল। কারণ মেয়েটি তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিল লিখিতভাবে।

গোটা ঘটনায় অন্তরা সবচেয়ে বেশি অবাক ! সে এতদিন কিছুই জানত না, কিছুই সন্দেহ করেনি।

——স্ট্রেঞ্জ আপনারা কেউ কিচ্ছু জানেন না! শ্যামলেন্দুদাকে ফোন করলাম, তিনি এখানে থাকেন না। আশ্চর্য ! আপনারা সব বুজুম ফ্রেন্ড !

——বুজুম ফ্রেন্ড তো বটেই। আমরা সবাই একই পাড়ায় একই সাথে মানুষ

হয়েছি। তবে এখন তো সবাই ছাড়া ছাড়া। যাকগে, এখন কে জানতো কে জানতো না সেটা কোনো ব্যাপার নয়। মেয়েটি পরিস্কার কি বলতে চাইছে? আনন্দ নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইল।

অন্তরার কাকা ওকে সমর্থন করলেন। বললেন, আনন্দ ঠিকই বলছে।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ভদ্রলোক তখন মুখ খুললেন। বললেন, দেখুন আনকেল, এইসব মেয়েদের একটা বড় অংশই ব্ল্যাকমেলার। আপনি কুচ্ছু ভাববেন না। আমি তো দেখছি, কোম্পানী যত বড় হচ্ছে তত এই প্রবলেম আসছে। ইনারা একটা নতুন ক্লাস তৈয়ারি হোয়েছেন। কোম্পানীতে যত নতুন মেয়েরা কাজ করতে আসছেন, তাদের মধ্যে ইনারা ঢুকে পড়ছেন। এটা বোন্ধ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু সব মেল কর্মী নিয়ে যেমন কোম্পানী চোলে না, তেমনি সব ফিমেল স্টাফ নিয়েও কোম্পানী চলে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন, সোব ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে।

আনন্দ বুঝতে পারল উনি এই ধরণের কেস আগেও হ্যান্ডেল করেছেন। কী করে সবটা ম্যানেজ করবেন আনন্দ তা বুঝতে পারে না। সে মেয়েটার কাছে জানতে চাইল, তুমি কী বলতে চাইছ বলতো খুকী?

আনন্দ ওকে ইচ্ছে করে খুকী বলে ছোট করতে চাইল। মেয়েটি কী নির্লজ্জ! প্রশ্ন করার সাথে সাথে নিজের কথা হুড়হুড় করে বলতে শুরু করে দিল। একটু লজ্জা শরম বলতে কিচ্ছু নেই।

আলোকের জামাইবাবু বললেন, পরে প্রবলেম করতে পারে এই মেয়ে।

——প্রবলেম? কাকাবাবু হাসলেন শব্দ করে। জীবনে এইসব ঘটনাও তাঁকে দেখতে হচ্ছে এই বয়সে। তিনিও এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন কিছু টাকা গচ্চা যাবে, তার বেশি কিচ্ছু হবে না। এখন প্রশ্ন সেটার পরিমাণ কত?

আনন্দ উঠে দাঁড়াল। বলল, কীসের প্রবলেম? কোনও প্রবলেম হবে না।

শেষে ম্যানেজার ভদ্রলোক মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেলেন। উনি নার্সিংহোমের দায়িত্ব নিলেন। মেয়েটির মাকে নিয়ে আসার জন্য আলোকের জামাইবাবু ওর বাড়ি গেল।

অন্তরাকে স্তোক বাক্য দেবার মতো করে আনন্দ বলল, এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট ভাবো। এতে তোমাদের দাম্পত্য জীবনের এবং আলোকের ক্যারিয়ারের যেন কোন ক্ষতি না হয়। এটা তোমায় দেখতে হবে।

অন্তরা মাথা নিচু করে কাঁদছিল। ওকে আবার বলল, তোমাদের দুজনের

দূরত্ব এত বেড়ে গেল কি করে ? তোমার এত বয়স কম। আকর্ষণীয় চেহারা——তোমার বড় বড় দুটো ছেলে আছে মনেই হয় না। অথচ..... ।

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল অন্তরা। বলল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না আনন্দদা।

আনন্দ ওকে আশ্বাস দিল। বলল, কেঁদ না। কাঁদলে কোনো সমাধান হয় না। দুনিয়ায় চোখের জলের দাম দেয় না কেউ। ওর সাথে সিরিয়াসলি কথা বল। আমিও বলব। তোমরা একসাথে শোও তো ?

অন্তরা এবার চুপ করল। প্রথমে কোনো উত্তর দিতে চাইল না। তারপর যা বলল, আনন্দ বুঝতে পারল একই ছাদের নিচে বাস হলেও ওরা মনের দিক থেকে দুজনে চলে গেছে শত যোজন দূরে। আরো আন্তরিকভাবে ওর কাছে গিয়ে আনন্দ বলল, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আজকের দিনে শতকরা আশিটা পরিবারে এই সমস্যা। ওকালতি পাস করেছি, আইনজীবী বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি। আমার কথাগুলো সিরিয়াসলি ভাবো। ওর সাথে খোলাখুলি কথা বল। হতে পারে সমঝোতার নতুন কোনো রাস্তা তোমাদের কাছাকাছি এনে দেবে।

চলে আসার সময় বিকাশ জানতে চাইল, তুই কি এজন্যই বিয়ে করলি না আনন্দ ?

——না রে। যাকে চাইলাম, সেই পাখিই তো উড়ে গেল।

আনন্দ-র দীর্ঘনিশ্বাস টের পেল বিকাশ। জানতে চাইল, কার কথা বলছিস ? অসীমা ?

ওকে কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু আনন্দ হাসল।



সাত সকালে বিছানায় উঠে বসেছিল অন্তরা। সারা রাত্রি দুচোখের পাতা এক করতে পারে নি। চোখে মুখে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। চোখের তলায় কালি জমেছে ওর। ঘরের বাইরে বিশ্ব এখন আঁধার মাখা নিস্তব্ধ। শুধু কাকগুলো কা কা করে ডাকছে। অন্তরার মনে হল কাকগুলোও কি ওর সাথে রাত জেগে কাটিয়েছে না একেই কাকভোর বলে ? ওদিকে সূর্য উঠে আসছে উপরে। ওর আসা না আসার এক মোলায়েম দ্যুতি পথঘাটকে দৃশ্যমান করে তুলছে। অন্তরা বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এল। বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পঁয়তাল্লিশে দাঁড়িয়ে আছে। নিতম্ব ছড়ানো চুল সবে একটু একটু করে পাতলা হতে শুরু করেছে।

অবশ্য তা চোখে পড়ার মতো নয়। গত কুড়ি বছরে সময় স্থির হয়ে আছে তার সর্বাঙ্গে। অন্তরা নিজেই ভেবে অবাক হয় দু-দুটো ছেলে তার। ছেলেরা এখন সাবালক হওয়ার পথে। তবু তার শরীরের বাঁধন এত টাইট থাকে কি করে ?

চোখ বন্ধ করলেই সেই দিনগুলো সামনে চলে আসে সিনেমার ছবির মতো। কী ভীষণ দিনগুলো পার হয়ে এসেছে। বিয়ে হয়েছিল যখন তখন তার বয়েস ছিল ষোল। আলোকের পঁচিশ। লেখাপড়ায় ভাল ছেলে, বিশাল বাড়ি। দুই ভাই, একটা দিদি আছে। ওর মায়ের একটু আপত্তি ছিল, মামাদের আপত্তিতে টেঁকেনি।

অন্তরা খুব ভাল গান গাইতো। পাড়ায় সরস্বতী পুজোর ফাংশনে ওর মুখে 'বধূ কোন আলো লাগল চোখে' গানটা শুনেই আলোক ওকে পছন্দ করে ফেলেছিল। তখনই ঠিক করেছিল ওকেই বিয়ে করবে। গান তখন অন্তরার ধ্যানজ্ঞান। গান গায়, গান শোনে, ভাবে গান গেয়েই জীবনটা কেটে যাবে। তরুন মজুমদারের 'দাদার কীর্তি' ছবিতে এই গান সুপারহিট হয়েছিল। অন্তরা যত প্রোগ্রাম করে ওই গানটাই ওকে গাইতে বলে সবাই। কোথাও কোথাও দুবার গাইতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই গানটা ওরও খুব পছন্দের। ও নিজেকে প্রায় অরুন্ধতী হোমচৌধুরী ভাবতে শুরু করেছিল। ওর বাড়ির সকলে ভাবল, গান শুনে যখন আলোক ওকে বিয়ে করতে চাইছে তখন গান নিশ্চয় ওর জীবনভোর সঙ্গী হবে। আলোকের বৃহস্পতি তুঙ্গে। আলোক পাড়ার রাইজিং হর্স। সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম !

বিয়ে করার কিছুদিন পর আলোক বউ নিয়ে বারো লাখি ফ্ল্যাটে উঠে গেল। বিয়ের অনুষ্ঠান হল শহরের নতুন প্রাইম আকর্ষণ সিটি টাওয়ারের ভেস্টিবিউল লিফট্-এ। স্থানীয় খবরের কাগজে ওর বিয়ের ছবি ও খবর ছাপা হল। স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্কে ওর বিয়ের অনুষ্ঠানের ছবি দেখানো হল। এই বিয়ে নিয়ে শহরময় চর্চা। কত গসিপ। আনন্দরা ওদের বিয়ের সাক্ষী। শুনে গর্ব হয় ওদের। চন্দননগর থেকে ক্যাটারার এসেছে। অন্তরাকে সাজাতে কলকাতা থেকে বিউটিশিয়ান এনেছিল আলোক।

সব মেয়েদের যেমন বিয়ে হয় তেমনি অন্তরার বিয়েটাও ছিল অসাধারণ। ফুলশয্যার রাত্রে শাশুড়ি আশীর্বাদ করে বললেন, প্রথম দেখাতেই আলোক তোমাকে পছন্দ করেছে। আমি কিন্তু বংশধর চাই। দশমাসের মধ্যে তোমাকে মা হতে হবে।

অন্তরা এমন কথা শুনে ঘাবড়ে গেল। ফুলশয্যার রাত্রের কত গল্প সে

শুনেছে বন্ধুদের কাছে। ওর মনের মধ্যেও তৈরি হচ্ছিল তেমনিই কিছু রঙীন ছবি। সে সব ছবি চাপা পড়ে গেল শাশুড়ির কথায়। অন্তরার ইচ্ছে ছিল সারারাত আলোকের সাথে গল্প করবে। কিন্তু না। আলোক যখন ঘরে এল খুব টায়ার্ড। পোষাক ছেড়ে সে কেবল আন্ডার গারমেন্টস পরে বিছানায় এল। বলল, আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে। যাও শাড়িটাড়িগুলো তাড়াতাড়ি খুলে এস। আমার আবার ওগুলো ভাল লাগে না। অমন ফুলের বিছানায় সিঁটিয়ে গেল অন্তরা।

ফুলের বিছানায়, ফুলের সাজে সিঁটিয়ে ছিল অন্তরা। ভেবেছিল, আলোক বোধহয় তাকে গান গাইতে বলবে। আকাশে ছিল চাঁদ। মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি চলছিল তার। হেমন্তর সেই শিস্ দেওয়া অসাধারণ গানটা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। সেই সুর তার কেটে গেল। এ কী ধরণের কথাবার্তা ? যৌন অভিজ্ঞতা কি জিনিষ সে জানে না। ওদের বাড়িতে এ ধরণের কথাবার্তায় কেউ অভ্যস্ত নয়। সে চোখে অন্ধকার দেখল। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল। আলোক এগিয়ে এসে তাকে দাঁড় করাল। তার শাড়ি খুলল। জামা ছিঁড়ল। ছিঁড়ল সায়াটাও, শরীরটাও ছিঁড়ল অনেক জায়গায়। দাঁতে দাঁত চেপে সবকিছু সহ্য করতে করতে অন্তরা টের পেল সেই রাত্রে তার শরীরের ভেতরে আর বাইরে যে একটা পর্দা ছিল সেটা ছিন্নভিন্ন করে দিল আলোক। সে বুঝতে পারল ফুলের জলসায় এরই নাম 'শুভ পরিনয়'। এর জন্যই মেয়েদের জন্ম হয়।

তারপর যুদ্ধ শুরু হল অন্তরার। আলোকদের বাড়ির সঙ্গে মানিয়ে নেবার যুদ্ধ। এ বাড়িতে গানের কোনো পাঠ নেই। আলোকের রোজগার ক্রমশঃ উঁচুতে উঠছে। সেই সঙ্গে চলছে ওর ঘোরাঘুরি। প্রতিদিন নতুন নতুন সমস্যার সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে অন্তরাকে। শিখছে জীবনচর্চা কি জিনিষ। সমস্যা কমিয়ে কমিয়ে কিভাবে সবকিছু মেনে চলতে হয় মেয়েদের শিখতে শিখতে একদিন সে দেখল নতুন মানুষ হয়ে গেছে। মধ্যরাতে আলোক বাইরে থেকে ফোন করে জড়ানো গলায় বলে, আজ একটু বেশি খেয়ে ফেলেছি। রাত্রে আর ফিরছি না ডার্লিং। একটু ম্যানেজ করে নিও।

অন্তরা জানায়, তোমার কোনো চিন্তা নেই। এইভাবে প্রথম বাচ্চাটা এসে গেল। দশ মাসের মধ্যে প্রথম সন্তান এসে গেল ও কোলে। বাড়িতে যেন নতুন করে সানাই বেজে উঠলো। শাশুড়ি খুব খুশি। ছেলেকে নিয়ে সারাদিন পুতুল খেলে অন্তরা। রাত্রে আলোক ঘুমুতে এসে ওর কাছে ছেলেকে দেখে বিরক্ত হয়। বলে, ও কেন এখানে ?

——বাঃ থাকবে না ?

—না।

—তুমি ওর বাবা না ?

—কি হয়েছে তাতে ?

—ছিঃ।

—যাও যাও মার কাছে রেখে এস ওকে।

কড়া নির্দেশ দেয় আলোক। অন্তরা জানাতে চায়, কেন ওকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না ?

আলোক বলে, করে কিন্তু এখন নয়। ও যখন বড় হবে, কথা বলতে শিখবে। তখন আমার কাছে আসবে।

—কী বলছ ? আঁতকে উঠেছে অন্তরা।

—হ্যাঁ। ঠিকই বলছি। যাও এখন ওকে মার কাছে রেখে এসো। আমার ঘুম পাচ্ছে।

—না। আমি মেঝেতে শুচ্ছি। তোমার ঘুম পেয়েছে তুমি বিছানায় শোও।

—আঃ ! বিরক্ত করছ কেন ? আমার নেশা কেটে যাচ্ছে। একী তুমি এখনও শাড়িটাড়ি ছাড় নি ?

অপমানিত অন্তরা দ্রুত ঘরের বাইরে গেছে। কাজের মাসীর কাছে গিয়ে ছেলেকে শুইয়ে রেখেছে। ছেলে তখন তার বুকের দুধ খেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অন্তরা মনে মনে বলেছে, আর নয়। আর বাচ্চা যাতে না আসে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু দেড় বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় সন্তান এসে গেল তার কোলে। এবারও ছেলে। শ্বশুড়বাড়িতে অন্তরার হৈ হৈ পড়ে গেল। অন্তরা রত্নগর্ভা।

অন্তরার গান থেমে গেল। এখন গান শুনলেই অন্তরা মনে মনে কষ্ট পায়। ওর কেবলই মনে হয় এক কথা ছিল, আর এক হয়ে গেল। জীবনের অঙ্কটা ভুল হয়ে গেছে। মেলে নি। একে আর ঠিক করা যাবে না। অঙ্কে ও বরাবর কাঁচা। কিন্তু ওর ছেলে দুটো এখন ব্যাঙ্গালুরুর কলেজে ভর্তি হয়েছে। তারা ব্রিলিয়ান্ট।

শরীর শুধু শরীর ছাড়া আর কিছু চাহিদা নেই আলোকের। বেসরকারি কোম্পানীর কাজ, সারাদিন টার্গেট ছুঁতে টোটো কোম্পানী ঘুরতে হয়। সূর্য ডুবলে কাজ বন্ধ, তখন বোতল খোলার পালা। নিয়মিত এই জীবনে সুরার সঙ্গে সাকীও চলে এসেছে তার জীবনে। বহুদিন নিজের স্ত্রীর সঙ্গে শোয়া বন্ধ। টিভিতে উত্তম সুচিত্রার পুরনো ছবি দেখে, ওদের ভালবাসার অভিনয় দেখে দেখে সময় কাটে অন্তরার। অবশ্য বেশ কিছুদিন পর আলোক যখন ওর সাথে

মিলিত হয় তখন ওর খুব ভাল লাগে। আলোকের মদ খাওয়া বেড়েছে। অন্তরা বুঝতে পারে অন্য মেয়েমানুষের কাছে যায় আলোক। তবু মুখে কিছু বলে না। অন্তরা মদ একেবারে সহ্য করতে পারে না। তাই মনে মনে দূরে সরে গেছে। আবার মনকে প্রবোধ দিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই করেছে। মদ খেয়ে দেখবে বলে। এত কিছু সামলে চলছে সে শুধু ওই ছেলেদুটোর মুখের দিকে তাকিয়ে। জীবনের সার এটুকু বুঝেছে যে, লেখাপড়া শিখে যতই পন্ডিত হোক না কেন, মেয়েদের আসল জায়গা হল সংসার, মা হওয়া। জীবনে ভাল রিটার্ন পেতে হলে বিয়ের পরই মেয়েদের মা হওয়া উচিত। খাওয়া পরা আর মাথার ওপরে ছাদ। বিনিময়ে ছেলে উৎপাদন করা এই খড়ির গন্ডীর জীবনে বুক ফেটে জল আসে অন্তরার। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। সে এই জীবনে বাধা পড়ে গেছে।

ওর ছেলেরা ওকে খুব ভালবাসে। ওদের খুব গর্ব, ওদের মা খুব সুন্দর। তাই অন্তরাকে সাজতে বলে। অন্তরা সাজতে চায় না। বলে, আমি এখন মা। এখন আমার আবার সাজা কি রে ?

নিজের আইডেনটিটি দেখাবার জন্য সাজতে হবে——এ আবার কী ? বলে, অন্য কিছুতেও তো তা হতে পারে। এসব কথা যারা বলে, তাদের হচ্ছে পারিবারিক শিক্ষার অভাব। ছেলেরা যখন বড় হয়ে যায়, তখন অল্প বয়সী মা বাবাদের সেজেগুজে ঘুরতে নেই। তাতে ছেলেমেয়েদের মনে প্রভাব পড়ে। তাদের স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। এটা বুঝতে হবে মা বাবাদের।

শান্তি নেই অন্তরার মনে। আলোক রোজ মদ খায়। ওর বারমুখো স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। প্রথম প্রথম মাকে সব বলতো অন্তরা। মা বলতো, সব ছেলেদের স্বভাবই এরকম। কান্নাকাটি করিস না। বাড়িটা তো ভাল। ছেলে হয়েছ, এবার দেখবি পাল্টে যাবে। অলোক এবার ঘুরমুখো হবে।



বিশ্বায়নের এই যুগে বহু মানুষ যেমন কাজ হারিয়ে উপার্জনহীন হয়ে পড়ছে তেমনি আবার নতুন ঝকঝকে ছেলেমেয়েরা অনেক কাজ পাচ্ছে। লেখাপড়া শুধু নয় তাদের চেহারাটাও এখন একটা কোয়ালিফিকেশন হয়েছে। দেখতে চৌকশ হতে হবে। নতুন নতুন সব কোম্পানী গড়ে উঠছে। এইসব কোম্পানীর ক্যামপেন কাজে রোজের হিসেবে উঠতি ছেলেমেয়েদের ভীষণ চাহিদা। বিশেষ করে যাদের চেহারা আকর্ষণীয়। ওদের দিয়ে এই ক্যাম্পেনের

কাজটা করানো সহজ হয়। এ ব্যাপারে কলকাতায় অনেক এজেন্সী তৈরি হয়েছে। তাদের কনট্যাক্ট করলেই একটা মোটা টাকা ফীজ্ নিয়ে তারা সব ব্যাপারটা সামলে দেয়। কিন্তু বর্ধমান শহরে এ ধরণের কোনো এজেন্সী এখনও গড়ে ওঠেনি। আবার কোলকাতা থেকে কোনো এজেন্সীকে বর্ধমানে নিয়ে আসতে গেলে খরচটা বেশি পরে যায়। আলোক এই শহরের কিছু ছেলেমেয়েকে যোগাড় করে তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে কাজটা ভালই চালাচ্ছিল।

আলোকের কোম্পানীতে দুটো দল কাজ করে। একটা দল রোজের হিসেবে বাড়ি থেকে সেজেগুজে এসে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে খদ্দেরকে প্রডাক্টের গুণাগুণ বর্ণনা করে। আর একটা দল, বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রডাক্টের গুণাগুণ দেখিয়ে বেড়ায়। এরা সবাই শিক্ষিত এবং ভাল পরিবারের ছেলে-মেয়ে। এদেরই একজন ওই লতা। আলোকের সঙ্গে ভাল ভাবসাব হয়। দেখতে শুনতে লতা তেমন চৌকশ নয় যদিও। তবে সেল্সের কাজটা তাড়াতাড়ি রপ্ত করে নেয়। আলোক ওকে কোম্পানীর সেল্স এক্সিকিউটিভ করে নিয়েছিল। লতা বুঝতে পেরেছিল, যদি ও আলোকের মর্জির ওপর নির্ভর করে ওর ক্যারিয়ার তৈরি হয়ে যাবে। আলোক ওকে নিয়ে বাঁকুড়া-বীরভূম-পুরুলিয়া ঘুরতে শুরু করেছিল। ফলে জল গড়াতে দেরি হয় নি। দুজনে কাছাকাছি চলে আসে।

কোম্পানীর বিজনেস বাড়ছিল। কোম্পানীর কর্মীদের মধ্যে জেলাসি আছে। ব্যাপারটা তারা লক্ষ্য করছিল। যখন অনেক দূর জল গড়িয়ে গেছে তখন তারা বিষয়টা পাঁচ কান করতে শুরু করল। অবস্থা বেগতিক দেখে মেয়েটিও ব্ল্যাকমেইল সুরু করে দিল।

লতা এইচএস ভালভাবেই পাস করেছে। কলেজে ভর্তিও হয়েছিল। বাবা মারা যাওয়ায় কলেজের পড়াটা শেষ করতে পারে নি। বয়েস পঁচিশের ঘরে। কম বয়সে বিয়েও হয়েছিল ওর। তবে বিয়ের পর বেশিদিন শ্বশুরবাড়ি থাকে নি। অবশ্য শ্বশুড়বাড়ি বলতে ছিল স্বামী আর তার একজন বোন। ওর স্বামী একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করে। বিয়ের আগে লতার একজন প্রেমিক ছিল। তার সাথে কিস টিস হাতে-হাত এরকম একটা প্রেম পর্ব কিছুদিন চালিয়েছিল। কিন্তু পরে ছেলেটি ওকে ফেলে চলে যায়। তারপর লতার জীবনে পুরুষ হয়ে আসে এই স্বামী। এর সাথে আলাপের পরই লতা বুঝতে পারে নোঙর করতে হবে এর কাছেই। এ ছেলে একটু হাত ধরাধরি কিসফিস নয়, একেবারে শরীর দেখতে চায়। তাই লতা খুব সতর্ক ছিল। বিয়ের দিন পর্যন্ত ওকে কিচ্ছু করতে দেয় নি।

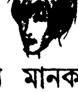
বাসর ঘরে ইচ্ছে করেই বলেছিল, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

ব্যাস! এই ইঙ্গিতটা কাজ করেছিল। তারপর বাপরে! বন্ধুদের কাছে লতাই গল্প করে বলেছে। সে যেন দমবন্ধ হয়ে মারা যায় এমনিই অবস্থা আর কি। বাসর ফাসর মাথায় উঠে ছিল। আর সেদিন থেকেই ভাল লেগে গিয়েছিল মানুষটাকে। বন্ধুদের কাছে বারবার গল্প করেছে। ওর বন্ধুরা ওকে অবাক হবার ভান দেখিয়ে বারবার ওর কাছে ওই গল্পটা শুনতে চেয়েছে। আর ওই গল্পটা লতা নতুন উৎসাহ নিয়ে ওদের বলেছে। উত্তরে ওরা বলেছে, সেকিরে এরকমও হয়? আমাদের না এরকম হয় নি। তোর বর কে অন্ততঃ একদিনের জন্য ধার দিবি?

লতার গর্ব হয়েছিল ওদের কথা শুনে। সে বলেছিল, ধ্যাৎ!

কিন্তু সেই লতাও একদিন আলোকের সঙ্গে ভিড়ে গেল। লতার সঙ্গে আলোকের সম্পর্ক নিয়ে যত কানাকানি হয়, অন্তরার সঙ্গে ওর সম্পর্ক নিয়ে তা হয় না। এটাই স্বাভাবিক। সমাজে যা কিছু অস্বাভাবিক, মানুষ তাই নিয়েই আলোচনা করে। লতার জীবনটা খুবই অদ্ভুত। বিবাহিত অথচ বহির্ভূত প্রেম ও সহবাসের সম্পর্ক তৈরি করেছে অনায়াসে। এ কী শুধু অর্থনৈতিক কারণে? না অন্য কিছু আছে? আনন্দ ভেবে পায় না। বিশ্বায়ন কি মানুষের প্রেম আবেগ ইত্যাদি মানবিক সম্পর্কগুলো সব বিষিয়ে দিচ্ছে?

লতার কাছে অনেক পুরুষই এসেছে। তারা এসেছে সেক্সের জন্য। অর্থের বিনিময়ে সেক্স নিয়ে তারা চলে গেছে। আলোকও সেরকম একজন। অথচ ও বলছে, ও নাকি আলোকের প্রেমে পড়ে গেছে। জীবনে প্রেম কতবার হয়? প্রথম প্রেম বিয়ের আগে। দ্বিতীয় প্রেম বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে। তারপরও প্রেম? আবার এই প্রেমের কথা অন্তরার কাছে এসে বুক ফুলিয়ে বলেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে কোম্পানীর ম্যানেজারকেও। যাতে আলোকের ওপর একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করা যায়। ধন্য এই প্রেম!



আলোক নাকি লতার জন্য মানকরে ঘর দেখছিল। বর্ধমানে চেনা পরিবেশে ওকে নিয়ে থাকতে আলোকের সাহস হয় নি। মানকরের মতো জায়গায় লতার মতো মেয়েকে নিয়ে আলাদা একটা সংসার পাতা আলোকের পক্ষে অসম্ভব। আনন্দ-র বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সামাজিক তিরস্কারের ঝুঁকি

নেওয়া এইরকম একটা মেয়ের প্রেমে পড়ার জন্য ? এত বিশাল একটা সোশাল রিস্ক নেবে আলোক ? মনে হয় না। আশ্চর্য ! প্রেমে পড়লে বলে নাকি মাথার ঠিক থাকে না। ঠিক। তা বলে ঘরে রূপসী স্ত্রী থাকতে মানুষ বাইরের মেয়েছেলের সঙ্গে প্রেম করতে চাইবে ?

আনন্দ এই অঙ্ক মেলাতে পারে না। ওর মনে হয় লতা যে সাহস নিয়ে আলোকের বাড়িতে এসে অন্তরার কাছে মুখ খুলেছে, অন্তরা কি সেরকম ? পারতো না। আলোক তার স্বামী। স্বামীদের অত্যাচার এদেশের স্ত্রীরা মুখ বুজেই সহ্য করে যায়। সম্মাণহানির ভয়ে সবকিছু জেনেও মুখ বুজে সহ্য করে যায়। এদেশের বিয়ের আসল শর্তটাই হচ্ছে সমর্পণের, যৌনকাজে তা নয়। আর সেই কারণেই লতা সব কিছু প্রকাশ করে দিতে পারে, অন্তরার পক্ষে যা কোনো দিন সম্ভব নয়। আসলে এটা লতার প্রেম নয়, প্রেম প্রেম খেলা।

আলোক ছোট থেকেই পেকে গিয়েছিল। বলতে গেলে ক্লাস এইট থেকেই বুঝতে শুরু করে সব। কিছুটা দিদির কাছ থেকে, কিছুটা বন্ধুদের কাছ থেকে। ক্লাস এইটের পর হস্টেলে থেকে চিরকাল পড়াশোনা করেছে। সব ব্যাপারেই কৌতুহল ছিল। ছুটিতে বাড়ি এসে দিদির সঙ্গে আলোচনা করত। ভাইবোনে ওরা ছিল বন্ধুর মতো। ক্লাস এইটেই দিদি-র এক বন্ধু প্রথম ওকে চুমু খায়। সেই চুমুতে প্রথমে ও তো প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই পর্ণগ্রাফী পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। প্রথমবার ওর খুব লেগেছিল। খুব ব্যথা হয়েছিল। আনন্দদের এসে বলেছিল, খুব লাগছে। কি করি বলতো ?

ওরা একচোট হেসেছিল। বলেছিল, ব্যথা লেগেছে, কী বলছিস রে ? বল ভাল লেগেছে। তখন এডস্ এর নাম ওরা কেউ শোনেনি। সিফিলিস, গনোরিয়া এইসব রোগের নাম শুনেছিল। হিন্দি সিনেমার দৌলতে আলোক জেনেছিল, একবার সঙ্গম করলেই বাচ্চা হয়। ইউনিভার্সিটিতে যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, তখন একজনের সঙ্গে ওর প্রথম সঙ্গম হয়। সে কী ভয়। ভয়েই মরে যায় আর কি। বন্ধুরা সাহস জোগায়। বলে, দূর বোকা ! ছেলেদের আবার ভয় কি ? তবে ভাল করে ডেটল কেটল দিয়ে ধুয়ে নিস। কার কি রোগ আছে সে কথা তো বলা যায় না ?

তখন থেকেই একটা ডিপ্রেশন ওর মধ্যে তৈরি হয়েছিল। তার থেকে বের হবার চেষ্টা করছিল। অন্তরা খুব সুন্দরী মেয়ে। ওকে বিয়ে করে সুখী হবে ভেবেছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে ওর কালচারে মিলল না। এই লতার সঙ্গে জড়িয়ে

গেল। লতার সঙ্গে পরিচিত হবার পর আলোক জানতে পেরেছিল যে, লতার একটা খারাপ ফেজ যাচ্ছে। সেটার থেকে লতাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছিল।

হয়তো সেটা মানবিকতা হতে পারে। আর সেটা করতে গিয়েই...। ওদের মধ্যে একটা ভাল লাগা তৈরি হয়ে গেল। নইলে ওই বা অতটা এগোবে কেন ?

তবে লতার সঙ্গে ওর সেক্সটা খুব জমেছিল। যেটা ও অন্তরার কাছে পায় নি। হয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরও অনেক সময় ভাল লাগার রেশটা যেমন থেকে যায়, তেমনিই লতা ছিল ওর কাছে একটা উত্তেজনা শুধু নয় একটা ভাললাগা! অফিসে কাজের মধ্যেও লতার কথা মনে পড়লে ও উত্তেজনা অনুভব করে। নিজেকে ওর তখন খুব সুখী আর সুন্দর মানুষ মনে হয়। অন্তরা নাকি ওকে একদিন বাস্টার্ড বলে গাল দিয়েছিল। বলেছিল তোমার সবটাই খারাপ। জামা কাপড় ছাড়লে একগাদা লোম নিয়ে তোমাকে শুয়োরের মতো দেখায়। 'শুয়োরের বাচ্চা' গালাগালটা আলোকের সেদিন খুব গায়ে লেগেছিল।

পাশাপাশি লতা কিন্তু ওর জীবনে একটা কনফিডেন্স এনে দিয়েছে। ওকেও যে কোনো মেয়ে চায় এমন ভাবনা প্রথম ও লতার কাছেই পেয়েছে। তাই বলেছে, যাকে ভাল লাগে, তাকে ছুঁয়ে দেখব না ? দুজন অ্যাডাল্ট যদি একসাথে মিলতে চায় তাহলে দোষটা কোথায় ? তারা তো জেনেশুনেই মিলিত হচ্ছে। পূর্ব পুরুষরা তো একাধিক বিয়ে করতো। সেক্সটা তো শুধু বাচ্চা হবার জন্য নয়, প্লেজারের জন্যও। তাই সেক্স নিয়ে যদি কোনো বিশেষ চাহিদা মেটে কারো কাছে নেব না ? আর অন্তরা ? ওর কথা বলিস না! অন্তরা সব কিছুতে সন্দেহ করে। স্বাভাবিকভাবে নেয় না। অথচ দ্যাখ, লতা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই নেয়। তাই লতার কাছে যা নিঃসঙ্কোচে চাওয়া যায়, অন্তরার কাছে, তা বলা যায় না। লতা বুঝবে এবং মেনে নেবে, অন্তরা বুঝবে না। সে মাপবে। আমি ছোটলোক, অভদ্র। এইসব বলবে! অলোক বলেছে, তারপর ধর মদ খাওয়া। বাড়িতে একটু আধটু যদি সিনেমার মতো মদ খেতে চাই, ও একদম সহ্য করবে না। আমারও আর এসব ভাল লাগে না। বয়স হয়েছে, ছেলেরাও বড় হয়েছে। রোজ রোজ বাড়িতে অশান্তি কার ভাল লাগে ? আমার মনে হয় এসব সতীপণা লোক দেখানো। কোথায় গেলাসে একটু মদ ঢেলে দেবে, একটু গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে, আমাকে সঙ্গ দেবে, একটু গান শোনাবে, তা নয় গানটা ছেড়ে দিল। বলে, আমি বাঈজী নই। আরে বাবা, আমি কি তাই বলেছি ? বাড়িতেও দেবে না। বাইরে গেলে অশান্তি করবে, এটা কী ?

আলোকের জামাইবাবু বলল, ও ফিরলে আমাকে খবর দেবে। চিন্তার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি, ওর দিদি আছে। ভাববার কিছু নেই। এই কথা বলে অন্তরার পিঠের ওপর আলতো চাপড় মেরে জামাইবাবু উঠে পড়ল।

ব্যাপারটা আনন্দর চোখে লেগেছিল। ভাল লাগে নি। কিছু বলতে পারে নি। কারণ বড়দের কিছু বলতে গেলে সাহস সঞ্চয় করতে হয়, সেটা ওর ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জামাইবাবু বলছিল, জুতো তা সে চামড়ার হোক আর চাঁদিরই হোক, বুঝলে, পায়েই পড়তে হয়। ওটা পায়ের নিচে থাকে।

লতার অ্যাবরসান নিরাপদে ও গোপনে হল। সমস্ত ব্যাপারটায় আনন্দর মনে হল, শ্রমের বিচারে লতা হচ্ছে নগরায়নের ইঁট বওয়া একজন কামিন। অন্তরা সে তুলনায় গ্রামের বীজতলার ধানবোনা সোনাবউ। এদের দুজনের মধ্যে তফাতটা খুব আপেক্ষিক। পাতলা। আলোক রাজমিস্ত্রী রূপে কামিনের কাপড় তুলে নরম জায়গাটায় খবলা মারতে পারছে। তার কারণ মেয়েটি আলোককে এ সুযোগ না দিলে সে কাজ হারাবে। নগরায়ণের এই যুগে কাজ হারাতে কে চায়? কাজ হারালে যে বেঁচে থাকা কঠিন সেটা কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার পড়ে না। সবাই হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। অপর দিকে মেয়েটির স্বামীর যা রোজগার তাতে দুটো বাচ্চাকে ইংরাজী মিডিয়ামে পড়ানো তো দূরের কথা ভাল করে দুটো খেতে দিতে পারবে না। পারবে না ভাল বাড়িতে থাকতে। আলোক তাই তার জোরটা পাচ্ছে সামাজিক অর্থনৈতিক শক্তি থেকে। সে লতাকে চাকরি দিয়েছে। প্রোমোশান দিয়েছে। বেতন বাড়িয়েছে। আবার সেক্সের বিনিময়ে আলাদা টাকাও দিয়েছে। জাস্ট গিভ এন্ড টেক পলিসি। বিশ্বায়নের যুগে এই আলোকের মতো মানুষরাই লাভবান।

উল্টোদিকে লতা ইচ্ছে করলেই আলোকের তলপেটে কষে একটা লাথি মারতে পারতো। আলোক পালাবার পথ পেত না। কিন্তু লতার সেই ইচ্ছেটা কোনোদিন হবে না। কারণ গোটা সমাজটাকে লাথি মারার ইচ্ছেটা সামান্য ব্যাপার নয়।

অন্তরা কিন্তু পারবে। পারবে সেই ধরণের একটা লাথিই আলোককে কষাতে। কারণ সে তার বিবাহিত সমাজ স্বীকৃত স্ত্রী। আলোক একবার ওকে ব্লুফিল্ম দেখিয়েছিল। ওর ভাল লাগেনি, এগুলো ওর অস্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়েছিল। 'বন্ধ কর, বন্ধ কর' বলে ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিল। আলোক

সেদিন খুবই উত্তেজিত ছিল। তাড়া দিয়েছিল ওকে। কিন্তু অন্তরার মুড অফ হয়ে গিয়েছিল। ভাল লাগছিল না। বলেছিল, রোজই তো কর। একদিন নাইবা করলে। আমার আজ ভাল লাগছে না।

——গার্হস্থ্য জীবনে পারমিশন তো নিতেই হবে। বিকাশের এই কথায় আনন্দ বলে, তাই কী ? তুই পারমিশন নিস ?

বিকাশ বলে, দ্যাখ আনন্দ, লতারা সংখ্যায় প্রতিদিন বাড়ছে। এই সমাজ এই সংস্কৃতি প্রতিদিন গোঁড়ামি মুক্ত হচ্ছে। সংস্কার মুক্ত হচ্ছে। আবার দ্যাখ আমাদের শিক্ষিত সমাজে, দেব দ্বিজে ভক্তি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। প্রভু আমার, প্রিয় আমার, আমার কলুষিত জীবনকে তুমি মুক্ত কর। আমি এই সমাজটাকে পাল্টাতে চাই। শুধু নিজেকে পাল্টে নিতে একটু সুযোগ দাও। তুমি শুধু সহায় হও। ছেলে দুটো মানুষ হয়ে যাক তারপর তুমি দেখ। আপাতত আমার সব দোষ মাপ করে দাও। আমাকে ক্ষমা কর প্রভু। আমিন ! আমিন !

আনন্দ বিকাশকে জিজ্ঞেস করল, জেলে যে মেয়েটা তোর সঙ্গে রোজ দেখা করতে যেত তার খবর কি ?

ও হাসল। বলল, ওর কথা আর বলিস না। পাগল মেয়েটা। সোনাগাছিতে থাকে। বলে, তোমার সব খরচ আমি চালাব। আমাকে শুধু একবার বিয়ে কর। পাগল মেয়েটা ! বলে হো হো করে হাসল বিকাশ।

——বলিস কি ? শুধু স্ত্রী-র মর্যাদা চায়। এমন মেয়েও আছে ? তা দিলেই পারতিস। তোর তো কোনও দায় ছিল না।

——না রে। উপরে উপরে মনে হবে কোনও দায় নেই। আসলে সবটাই দায়।

——কীসের দায় ? জানতে চায় আনন্দ।

ও তুই বুঝবি না। বিকাশ বলে।



বিকাশের সঙ্গে আনন্দ ক'দিন আলোকের সন্ধানে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াল। আলোকের খোঁজে ওর অফিসের কিছু তরুণ-তরুণী কলিগের সঙ্গে ওদের পরিচয় হল। ওদের সাথে আলাপ করে এক অন্তর্লীণ অনুভূতির পরিচয় পেল আনন্দ। সবাইকে ওর কেমন দিশাহীন মনে হয়েছে। ভাল ঘরের শিক্ষিত ছেলে মেয়ে এরা, অথচ সামান্য বেতনে বারো তেরো ঘণ্টা কাজ করতে আসছে।

আনন্দ একদিন আলোকের অফিসে গিয়েছিল একটা ছেলে একটা মেয়ে কথা বলছে তার কানে এল। ওদের কথাগুলো খেয়াল করল সে। ছেলেটা বলছিল, কৌশিকী তুই এলি না কেন রে ?

মেয়েটা বলল, বান্টি তুই কিছু মনে করিস না মাইরী, আমার না সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

——কি গোলমাল হয়ে গেল।

——আমার কেমন যেন মনে হল তুই ব্ল্যাক টি-শার্টটা পড়ে আসবি। হ্যাঁরে তুই ওই টি-শার্টটাই পরে এসেছিলি না ?

——তো ? কী হয়েছে তাতে ?

——দেখলি ? কি ইনটুইশন বল ? সত্যিই ভাবা যায় না ! ভাগ্যিস যাই নি !

——যাস নি কেন ?

——তুই বুঝতে পারছিস না ? আমিও তো ভেবেছিলাম ব্ল্যাক টি শার্টটা পড়ে যাব।

——তা আসতিস ? কী হতো তাতে ?

——যাঃ। সব কেমন সেম হয়ে যেত ?

——হতো হতো।

——না, বাবা !

আজকালকার ছেলেমেয়েদের এইসব কথাবার্তার কোনো মনে খুঁজে পেল না আনন্দ। বুঝতে পারে না এরা দেশের কথা, সাহিত্যের কথা, ভাল সিনেমার কথা, ভাল নাটকের কথা কিছু ভাবে কি না। আলোকের সন্ধান কোথাও পেল না। আলোক কোথাও আসছে না। না অফিসে, না বাড়িতে। ওর অফিসের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার একদিন বলল, লতার বাড়িতে গিয়ে একবার দেখুন তো !

নাঃ। সেখানেও খোঁজ পেল না আনন্দ। অন্তরা প্রতিদিন ফোন করে। আনন্দও ফোন করে। আলোকের কোনো খবর নেই। সেই যে সেদিন সকাল সাতটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, তারপর আজ পর্যন্ত কোনো খবর নেই। আনন্দ ভেবেছিল অলোক ভীতু তো, কোথাও বেড়াতে চলে গেছে হয়তো। সেখানে মদ খেয়ে খেয়ে মনের জোর বাড়াচ্ছে। কাছাকাছি মদের ঠেকগুলোয় খোঁজ নিল বিকাশের সঙ্গে। কেউ যদি কোনো খোঁজ দিতে পারে। না এসব জায়গায় ও আসে নি। বংশীর দোকানেও নয়। বংশীও কতজনাকে বলেছে। আলোককে সবাই চেনে, তারাও শুনে অবাক হচ্ছে। আলোক ফোনও করে না

কাউকে কোথাও থেকে।

শ্যামলেন্দুকে জামুরিয়ায় ফোন করল ওরা। ও শুনে অবাক ! কিছুই জানে না। বলল, অন্তরা ফোন করেছিল। ও জানতে চাইছিল ব্যাপারটা কী ? ওকে বিশেষ কিছু বলল না ওরা। শুধু বলল, অন্তরার সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য হয়েছে। কোথাও গেছে, তোর কাছে গেলে খবর দিস।

ও বলল, একটু সেন্টিমেন্টাল তো, ব্যাপারটায় বোধহয় ধাক্কা খেয়েছে। দেখ কয়েকদিন, ঠিক চলে আসবে।

——আসবে তো বটেই। যাবে কোন চুলোয়। অন্তরা বলল।

কিন্তু আলোকের কোনও খোঁজ কোথাও পাওয়া গেল না। বিকাশ আনন্দ দুজনে আলাদা আলাদা করেও বহু জায়গায় খোঁজ করল। সবই বিফলে গেল। যে কোন ফ্লপ লোক নিজের প্রফেশনটাকে ঘেন্না করে। কিন্তু আলোক তো রাইজিং সান। ওর প্রফেশনে ও তো হীরো হয়ে উঠছিল। কলেজে ইউনিভার্সিটিতে বরাবর পড়াশোনায় ও সকলের মধ্যে ভাল ছিল। অধ্যাপক হবার খুব ইচ্ছে ছিল। বলেছিল, এর মতো প্রফেশন আর একটাও নেই। আমৃত্যু লেগে থাকে বিশেষনটা। অবসর নাও তবু লোকে বলবে প্রফেসর অমুক যাচ্ছেন। শ্মশান যাত্রার সময় লোকে বলবে, অধ্যাপক 'অমুক' চলে গেলেন।

কিন্তু না আলোক ফিরল না। থানা-হাসপাতাল-আলোকের কোম্পানীর অন্যান্য সেলস এক্সিকিউটিভ মেয়েগুলো কেউ কোনো খবর দিতে পারল না। কোথাও থেকে কোনো খবর এল না। আশ্চর্য, শেষে শহরের সব হোটেলগুলোতে ঢুঁ মারল ওরা। না, সেখানেও কোনো সন্ধান নেই। আলোকের অন্তর্ধানের বিষটায় প্রথমে যারা হাসি মস্করা করতো, তারাও চিন্তিত হয়ে পড়ল। আলোকের সঙ্গে লতার মুখরোচক গল্পগুলো আস্তে আস্তে থিতিয়ে গেল। সবার এখন একটা কথা ! জলজ্যান্ত লোকটা উবে গেল কী করে ?

আলোকের দিদিও বহু জায়গায় খোঁজাখুঁজি করল। কোনো সন্ধান মিললো না।

যাবতীয় সঙ্কোচ কাটিয়ে আনন্দ একদিন বিকাশকে নিয়ে আসানসোলের লছিপুরে গিয়ে হাজির হল অসীমার সামনে। আলোকের গোপন-ঠিকানা বলতে এটাই বাকী ছিল। কিন্তু অসীমাও অবাক ! চলে আসার আগে অসীমা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, দ্যাখ আলোক কোথায় জানিনা। তবে একটা সময় ভাবতাম ও যদি আমকে একটু ভালবাসে আমি ওর কেনা গোলাম হয়ে

থাকব।....এখন এতদিন পরে তোরা এসেছিস, তোদের যে কোথায় বসতে দিই ? আমার কি সেই দিন আছে ? তোদের সামনে আলোককে আমি যদি বার করে দিতে পারতাম তবে তোদের থেকে বেশী আমি খুশী হতাম। কিন্তু না। আলোক বহুদিন এ পথ মাড়ায় নি রে। এখন আমি অন্য মানুষ। আমার সাথে হেসে কথা বলতে গেলে দাম লাগে।

গত ছ-মাসের মধ্যে আলোক এপথ মাড়ায় নি। এমন কী অসীমার কোনো খোঁজ নেয় নি। এবারে ওদের চিন্তা বাড়ল। বিষয়টা আর সুবিধার মনে হচ্ছে না। অসীমা একটা স্বপ্ন দেখার কথা বলতো প্রায়ই। বলতো এই স্বপ্নটা ও অনেকবার দেখেছে। আনন্দর সাথে ওর নাকি দেখা হয় একটা স্বপ্নের রেলস্টেশনে। সেটাই শেষ স্টেশন, সেখানে সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা শেষ ট্রেন এসে থামে। ট্রেন থেকে নামে একজন মাত্র যাত্রী অসীমা। অন্ধকারে একা সে ট্রেন থেকে নামে। প্ল্যাটফর্মে একটা ল্যাম্পপোস্ট জ্বলে। তার নিচে একটি মাত্র বেঞ্চ থাকে। সেই বেঞ্চে বসে থাকে একজন মানুষ। মানুষটি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। সেই মানুষটি আর কেউ নয়, আনন্দ। অন্ধকারে ওরা দুজনে দুজনকে দেখে তারপর একে অপরের দিকে এগিয়ে আসে। ব্যাস ! তারপরই ঘুম ভেঙ্গে যায় অসীমার। যে ক'দিন স্বপ্নটা দেখেছে, এইটুকুই দ্যাখে। তারপর ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পরে কী ঘটেছে জানতে পারে না।

আনন্দ শুনে বলেছিল, আমি জানি এই স্বপ্নের মানেটা কী ?

——কী ? জানতে চেয়েছে অসীমা। বহুবার জানতে চেয়েছে।

রহস্যময় হাসি হেসে চুপ করে থেকেছে আনন্দ। রহস্যটা ভাঙ্গেনি কোনোদিন।

বিকাশ বলল, শালা ঢপ মারছিস। তুই কিচ্ছু জানিস না।

আলোকের জন্য অফিসের থেকে ছুটি নিয়েছিল দশ দিনের মতো। মাঝে মাঝে সাধারণ ছুটিগুলোতেও ঘুরেছে। আনন্দ এখন সরকারি চাকরি করে। মহকুমা আদালতের জজ অর্থাৎ বিচারক, বিচারকের আসনে বসে। বছরের শুরু সবে জানুয়ারি মাস। নতুন চাকরিতে এত ছুটি পাওয়া যায় না।

অন্তরা ওর এক চেনাশোনা জ্যোতিষীর কাছে যাচ্ছে নিয়মিত। সে ভরসা দেয়, আলোক ঠিক ফিরবে। তবে আরো কিছুদিন পর। সে নাকি কাশী চলে গেছে। সেখানে বিশ্বনাথ দর্শন করছে। তার পদতলে আশ্রয় নিয়েছে। আলোকের ভাই কাশীতে দৌড়ল।

কাকাবাবু বললেন, যত্তসব বাজে বাকোয়াস ! অ্যাবসার্ড ! এ হতেই পারে না। আলোক নাস্তিক ছিল। কোনোদিন ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম করছে দেখিনি। কিন্তু আশ্চর্য ! যাবে কোথায় ?

আলোক ফিরল না। আলোকের স্মৃতি ধীরে ধীরে ধূসর হতে লাগল।

বিকাশ আর আনন্দ মাঝে মাঝে বংশীর দোকানে মিলিত হয়। ওদের আড্ডার বেশীর ভাগ জুড়ে থাকে আলোকের নিরুদ্দেশ হওয়া। বিকাশ-ই বেশি কথা বলে। আসলে বিকাশ ওকে ভুলতে পারে না, আলোক ছিল ওর এক গেলাসের বন্ধু। বিকাশের মদ খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।



হঠাৎ বহুদিন পর আচমকা ফোন পেল আনন্দ। খলবলে গলায় কেউ বলল, চিনতে পারছেন ?

আনন্দ বলল, এ গলা চিনতে না পারার কোনো কারণ নেই। কোনো খবর পেয়ছ কী ?

অন্তরা ওর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, আজ একটু আসতে পারেন ?

——কোথায় ?

——আমাদের ফ্ল্যাটে।

আমাদের ফ্ল্যাটে। আমাদের ফ্ল্যাট মানে আলোক কি ফিরে এসেছে ? আনন্দ তৎপর হল।

বিকাশ কে সঙ্গে নিল।

আসতে পারেন ? বললেই কী সঙ্গে সঙ্গে আসা যায় ? না। অন্তরার ফোন পেয়ে বিকাশকে জানিয়েছিল আনন্দ, কাল সন্ধ্যায় আলোকের বাড়ি যাব। তুই রেডি থাকিস।

সেই মতো দিনের প্রস্তুতি। যখন ছ'টা বাজে তখন আসন্ন সন্ধ্যার আলোকসজ্জায় জনবহুল পথ ধরে ওরা হাঁটছিল। গুমোট গরম। মেঘের গুরু গম্ভীর মাথার উপরে। সেই মেঘে বৃষ্টি না থাকুক বজ্র মানিক লুকিয়ে থাকতে পারে। ওই মেঘ যদি বৃষ্টি নামায়, যদি দৃষ্টি হানে বজ্রের তা হলে সেই আগের দিনের মতো ভিজতে হবে। তারপর শরীর খারাপ হবে। আগের বার বেশ ক'দিন জ্বরে ভুগেছিল। তাই পথে যাতে বিপদে না পড়ে তাড়াতাড়ি হাঁটা দিল ওরা। এই শহরে দূর কে নিকট করার কোনো বিকল্প পথ নেই। এই শহর হৈ চৈ-

এর শহর নয়। এ শহর মানুষে টানা রিক্সা আর মোটর সাইকেলের। এ শহরের ফুটপাত অগুনতি হকার এবং অগুনতি মানুষের হোঁচট খাওয়া পদচারনার বিরক্তিস্থল। শেষ পর্যন্ত আলোকের বারো লাখি ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে হাজির হল ওরা দুজনে।

নেমপ্লেট পাল্টে গেছে। শুধু লেখা রয়েছে 'অন্তরা'। আলোকের নামটা নেই। ড্রয়িংরুমে আলোকের একটা বড় পোট্রেট বাঁধিয়ে মালা চন্দন ধূপ ধুনো দিয়ে সাজিয়ে রাখা। ফটোর ভিতর থেকে আলোক সবকিছু দেখছে। ছেলেদের খবর নিল, ওদের পড়া শেষ হয়ে আসছে। দুজনে আপাতত ব্যাঙ্গালুরুতেই সেটল করবে, এইরকমই ভাবনা চিন্তা। জামাইবাবু সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

অন্তরা একটা খামে কতগুলো ছবি ওদের হাতে দিয়ে বলল, দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা ?

আনন্দ ছবিগুলো মেলে ধরল। রেল লাইনের পাশে পড়ে থাকা কোনো ডেড বডির ছবি। পুরুষ না মহিলা ভাল করে চেনা যায় না। চমকে উঠল দুজনে।

আলোক ?

অন্তরা চারটে গেলাসে হুইস্কী ঢালতে ঢালতে বলল, আপনাদের বরফ দেব ?

চারটে গেলাস কেন ? মনে মনে ভাবছিল আনন্দ। ওরা তো এখানে অন্তরাকে নিয়ে তিনজন ? তাহলে ?

'খুট' করে শব্দ হল। দেখে বাথরুম থেকে জামাইবাবু বের হচ্ছেন। আলোকের জামাইবাবু এ বাড়িতে থাকে ? প্রশ্নটা ধক্ করে জ্বলে উঠল বুকে। বুঝতে পারল এতক্ষণ উনি বাথরুমের ভিতরেই ছিলেন। ঠিক। ওঁকে নিয়ে এখন ওরা চারজন হল।

জামাইবাবু বললেন, দাও দাও। যা প্যাচ-প্যাচে গরম পড়েছে। খেলে ওদের ভালই লাগবে।

——লেটস্ সেলিব্রেট। জামাইবাবু গেলাস তুলে ধরলেন।

——কীসের সেলিব্রেশন ? আনন্দ বলল, আমি খেতে পারব না। চললাম।

——খান তো ? খেয়েছেন তো আগে ? অন্তরা জানতে চাইল মিষ্টি গলায়।

——হ্যাঁ খেয়েছি। তাতে কী হয়েছে ? এখন ভাল লাগে না। বলল আনন্দ।

—আজ একটু খান আমাদের সঙ্গে। আমরা সবাই খাচ্ছি।

আমাদের সঙ্গে? কথাটা কত অনায়াসে বলে ফেলল অন্তরা। ছবিগুলো এমনভাবে দিল, মনে হল বিয়ের কোনো সম্বন্ধের জন্য যেন মেয়েদের ছবি দেখাচ্ছে। আনন্দর মনে হল ঠাস করে একটা চড় মারে ওর গালে।

——ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাহলে জোর করতে হবে না। জামাইবাবু বললেন।

কুলকুল করে ঘামছে আনন্দ। ঘরেতে এসি চলছে। রেললাইনের ধারে পড়ে থাকা এই দেহটা আলোকের? আলোক তাহলে সুইসাইড করল শেষ পর্যন্ত? একটা ভীতু স্বভাবের মানুষ কখনোও সুইসাইড করতে পারে?

ছবি থেকে চোখ সরিয়ে নেয় আনন্দ। অন্তরাকে দ্যাখে।

অন্তরা কি আগেও এত ঘামতো? অন্তরা যেন আরো সুন্দরী হয়েছে। বিয়ের জল পড়লে মেয়েদের যেমন চেহারা খোলে। নাকি ঘামলে এক একজনকে দারুন সুন্দরী দেখায়? আনন্দ ভেবে পেল না।

আলোকের থ্যাতলানো মৃতদেহটা ব্যান্ডেল নৈহাটি লাইনে গরিফা স্টেশনের কাছে পড়েছিল। চলন্ত ট্রেনের যাত্রীরা যখন দেখেছিল তখনও ও বেঁচে ছিল। ব্যান্ডেল জিআরপি প্রথমে খবরটা পায়। এলাকাটা নৈহাটি জিআরপি-র বলে তারা নৈহাটিকে খবরটা দেয়। নৈহাটি জিআরপি আসার আগেই স্থানীয় মানুষ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল আলোককে। অ্যাকসিডেন্ট-পুলিশকেস-চিকিৎসা পদ্ধতির আমলাতান্ত্রিক গতি আলোককে খুব বেশি সময় দেয় নি। ওই হাসপাতালের বারান্দায় সেদিনই আলোক মারা যায়। নৈহাটি জিআরপি আবার ওই ডেডবডি রেললাইনের ধারে নিয়ে এসে ছবি তোলায়। এগুলো সেই ছবি। কাঁটাছেড়া হবার পর আলোক বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়েছিল নৈহাটি হাসপাতালের মর্গে। বেশ কিছুদিন থাকার পর জামাকাপড় ইত্যাদি যা ছিল সেগুলো রেখে পুলিশ বডি পুড়িয়ে দিয়েছে। ভবানী ভবনের মিসিং স্কোয়াড থেকে আলোকের ছবি কাগজে ছাপা হলে ব্যান্ডেল জিআরপি-র নজরে আসে। শেষ পর্যন্ত তারাই যোগাযোগ করে অন্তরাকে খবর দেয়।

কয়েক সপ্তাহ ঘুরে নৈহাটি জি.আর.পি.-র কাছ থেকে এই ফটোগুলো উদ্ধার হয়েছে। বাড়ি থেকে যে জামা প্যান্ট পড়ে বেরিয়েছিল আলোক ওরা সেগুলো পুঁটুলি করে রেখে দিয়েছিল। অন্তরা বলল।

——না। কোনো সুইসাইড নোট পাওয়া যায় নি ওর পকেটে।

আলোক ওই দিকে কেন গিয়েছিল তার কোনো উত্তর নেই। অন্তরার ফ্ল্যাট

থেকে চলে আসার আগে জামাইবাবু বললেন, লতার বাপের বাড়ি নৈহাটি।

——সো হোয়াট ? চিৎকার করে উঠল আনন্দ।

উনি বললেন, কুল কুল, শান্ত হও! অন্তরা জানতে পারলে কষ্ট পাবে। একথাটা এখনও বলিনি ওকে।

——হ্যাঁ। ঠিকই। লতার বাপের বাড়ি নৈহাটি। কিন্তু তাতে কি এসে গেল ? লতা তো ওর স্বামীর সঙ্গে বর্ধমানে বাস করে। বিকাশ আনন্দর হাত ধরে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে থাকে।

'বর্ধমান গৌরব' মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি পশ্ সংস্কৃতির ধ্বজা উড়িয়ে। বিকাশ ওর হাত ধরে আছে। গুডশেড রোডের বস্তীর দিক থেকে হোলীর গান ভেসে আসছিল। বিহারীরা হোলী এক মাস ধরে উদ্যাপন করে। খঞ্জনী এবং ঢোলের বাদ্যি চরম ব্যঞ্জনা তৈরি করে বাজছিল। 'আজ হোলী খেলেঙ্গে হাম.....' গান উচ্চস্বরে বাজছিল। বসন্ত আসছে। বসন্তের আগমন বার্তা ছড়িয়ে পড়ছিল আকাশে বাতাসে। এমনি একটা বসন্তে চলে গেছে মলয়। আনন্দর মনটা তিত হয়ে উঠল। বিকাশকে বলল, আজ একটু মাল খাওয়াবি ?

বিকাশ উত্তর বলল, ওখানে তো দিচ্ছিল। খেলি না কেন ? মালটা দামী ছিল।

——দূর শালা ? বলে বিকাশকে গাল দিল আনন্দ। তারপর বলল, আমি কোনোদিন বেশ্যা বাড়ি যাই নি বুঝলি। দূর থেকে ওদের দেখেছি শুধু। আজ কাছ থেকে দেখলাম ওদের ঘরে গিয়ে!

আনন্দ বিকাশকে নিয়ে একদিন নৈহাটি জিআরপি-তে এল। সংশ্লিষ্ট অফিসারকেও পেয়ে গেল।

——পরিচয় দিয়ে বলল, দেখুন ঘটনাটা যে সিরিয়াস সেটা আপনারাও অস্বীকার করছেন না। আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করছি আপনারা সিরিয়াসলি তদন্ত করুন।

আনন্দর কথায় পুলিশ অফিসার নড়ে চড়ে বসলেন। তিনি সোজাসুজি ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা যে তদন্ত করছি না। সিরিয়াসলি করছি না, সেটা আপনি জানলেন কি করে ?

——একটা লোক বারো মাসেরও বেশি নিখোঁজ ছিল। তারপর তার

ডেডবডি পাওয়া গেল হাসপাতালে। রেল দুর্ঘটনার কেস বলে আপনারা আবার সেই বডি রেললাইনে ফেলে ছবি তোলালেন। বডি কেউ সনাক্ত করতে এল না। জামাকাপড় দেখান হল। আর আপনি আমাকে বোঝাচ্ছেন, এটা ব্যক্তিগত কারণে সুইসাইড কেস এই তো ?

——দেখুন আপনি যদি এভাবে কথা বলেন তো....।

আনন্দর বিরক্ত লাগছিল পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে। তাই উঠে পড়ল। নৈহাটি জিআরপি স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে খোলা হাওয়ায় দাঁড়াল ওরা। বিকাশকে বলল, আলোক তাহলে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করল ? তোর কি মনে হয় ? তুইও কি তাই মনে করিস ?

বিকাশ, কোনো উত্তর দিল না। চুপ করে রইল।

আবার ওকে জিজ্ঞেস করল আনন্দ, কি রে কিছু বল ?

——কী বলব বল ?

——বিকাশ, শুধু শুধু কেউ আত্মহত্যা করে না। আলোক যে বেশ কিছুদিন ধরে ডিপ্রেশনে ভুগছিল এমন নয়। ওর কেসটা যা হয়েছে তা হঠাৎ উত্তেজনা। হঠাৎই। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে মানুষ সুইসাইড করে না।

——আমি জানি না। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। আমায় কিছু জিজ্ঞেস করিস না। বিকাশ চিৎকার করে বলল।

——জামাইবাবুর ব্যাপারটা তোর ভাল লাগছে ? আলোক মদ খেলে, অন্তরার গায়ে লাগতো। সে রাগ করতো, এতে তার প্রবল আপত্তি ছিল। আর এখন ও নিজে মদ ঢালছে, মদ খাচ্ছে। ভাল করে সিঁদুরের টিপ পড়ে না, ঘোমটা দিতে দেখিনি কোনোদিন.....আগে এসব কিছু মনে করিনি। কিন্তু এখন....জেনেশুনে যদি না জানার ভান করিস তাহলে আমার কিছু বলার নেই.....।

——তাহলে তুই বলছিস....

——হ্যাঁ।

——লে হালুয়া ! বিকাশ রাস্তায় বসে পড়ল। বলল, আনন্দ, একবার ভবানীভবনে গেলে হয় না ? মিসিং স্কোয়াড ফাইলটা বন্ধ করে দিয়েছে কিনা খোঁজ করবি ?

——যাব।

এই শহরে পাখির খাঁচার মতো আবদ্ধ থাকা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। প্ল্যাটফর্ম ধরে দুজনে হাঁটছিল তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। সামনে একটা পিটুলি গাছ দেখে, দুজনে ওই গাছের তলায় দাঁড়াল। আশেপাশে কোনো শেড নেই যে দাঁড়ানো যায়। বৃষ্টি এসে ওদের সারা শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছিল। আনন্দর মনে হল ও যেন পবিত্র হল। প্রথমে একটা ঠাণ্ডা ভাব, তারপর কাঁপুনি এল সারা শরীরে। মুষলধারার বৃষ্টিতে ভিজল প্রায় অনেকক্ষণ। কাক ভেজা ভিজে আর দাঁড়াতে পারল না। ভিজতে ভিজতেই দৌড়ল, ঘরে ফিরল। আশ্চর্য! ওরা ঘরে ফেরার কিছু পরই বৃষ্টি কমে গেল। দু-দিন পর শরীর খারাপ হল আনন্দর। জ্বরে পড়ল।

সেই সময় সিঙ্গাপুর থেকে মানসের ফোন এল। ওখানে এক মস্ত হোটেলে মানস এখন কাজ করে। আগে আনন্দের সঙ্গে দুবাইয়ে কাজ করতো। ওকে সমপূর্ণ বায়োডাটা এবং পাসপোর্টের জেরক্স কপি পাঠাতে বলল মানস। ওখানে ক'টা নতুন হোটেল খুলছে, কিছু এক্সপিরিয়েন্সড লোক নেবে খবরটা দিল। মানস তাই চাইছে, আনন্দ ওখানে যাক। ওর হোটেলেই জয়েন করুক। আনন্দ বলল একটু ভাবতে দে, ভেবে দেখি দুটো দিন। সারারাত ঘুমুতে পারল না আনন্দ।

সিঙ্গাপুর! উর্মি সঙ্গীত মুখরিত শ্যামল সমুদ্রতট। সোনালী বালুকাভূমি। সেখানে স্লিম তনু কটি নীল নয়না সুন্দরীদের ভিড়। নীল জলরাশির মধ্যে গাঢ় সবুজ বিন্দুর মতো দ্বীপটা ভাসছে। আনন্দর মনে হল, আবার একটা নতুন আকাশ, নতুন বাতাস, নতুন মানুষদের ভিড় ওর জন্য দুয়ার খুলে দিচ্ছে।

আমার তো কোনোও বন্ধন নেই। কার্জনগেটের মোড়ে 'সাইবারল্যান্ড' নামে যে নতুন সাইবারকাফে খুলেছে, সেখানে সিডি থেকে নিজের বায়োডাটা ডাউনলোড করল আনন্দ। আপ টু ডেট করে প্রিন্ট আউট নিল। হ্যাঁ, ঠিক আছে। পাসপোর্ট স্ক্যান করে তার প্রিন্ট আউট নিল। সবগুলো একটা খামে পুরে মানসকে সিঙ্গাপুরে এয়ারমেল ক্যুরিয়র করল। আর ই-মেলে সব জানিয়ে দিল, লিখল কি হচ্ছে না হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানা। আমার আর এখানে একদম ভাল লাগছে না।

জীবনে কত কীই না ঘটল। ভগবানের কী অসীম করুণা, এই জীবন উপভোগ করে ধন্য হই আমরা। কত নতুন মানুষ, কত নতুন দেশ দেখি আমরা। কোথাও কান্না জড়ানো স্মৃতি থাকে, কোথাও মধুর। রবিদা একদিন

টেলিফোন করলেন আনন্দকে।

——কেমন আছিস ?

——এই চলে যাচ্ছে। আপনারা ?

——ভাল। আর কতদিন হাত পুড়িয়ে খাবি ?

——হাত কেন পুড়বে, সনাতন আছে না ?

——সনাতন এখনও আছে ?

——কোথায় যাবে ?

——বিয়ে না করলে সনাতন কেন, কেঁউ তোর সঙ্গে থাকবে না। সেই মেয়েটার খবর কি ?

——কোন মেয়েটা ?

——তোর অফিসের ?

——মানে ?

——তুই যে কোথায় একটা চাকরি করছিলি, একটা মেয়ে তোকে খুব জ্বালাতন করতো ?

——ওঃ হরি ? তুমি দেখছি কোনো খবর রাখ না ? আমি তো এখন সরকারি উকিলের চাকরি করি। আদালত এখন আমার অফিস।

——তাই বুঝি ? তা হলে সেই মেয়েটা কোথায় গেল ?

——তা জানি না। তবে সেই সময়ই তো সে একজনকে নিয়ে ভেগেছিল। কেন বলতো ? তোমার দরকার ?

——কী যে বলিস ? ভেগেছে ?

——হ্যাঁ।

——চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ?

——বললাম তো জানি না। আচ্ছা রবিদা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব ?

——কি বল ?

——কিছু মনে করবেন না বলুন ?

——না তাড়াতাড়ি বল ?

——কোনো মেয়ের সঙ্গে দুবার হাত ধরাধরি করে, আর একবার চুমু খেলে কি বোঝা যায় পরবর্তী তিরিশটা বছর কেমন যাবে ?

ফোনের ওদিকে রবিদা মনে হয় থমকে গেলেন। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, তুই ভাল আছিস তো আনন্দ ?

——হ্যাঁ। কেন ? আমার কথা কি অসংলগ্ন মনে হচ্ছে ?

——না। এমনি জানতে চাইলাম। একটা কথা তোকে বলা দরকার।

——কী কথা ?

——আজ বিকেল চারটের সময় নন্দীগ্রাম "সন্ত্রাস মুক্ত" হয়েছে। একদিন আয়না। অনেকদিন আমাদের দেখা হয় নি। ভাল থাকিস। বলে রবিদা ঠকাস করে লাইনটা কেটে দিলেন।

টেলিফোনটা রেখে দেবার আগে রবিদা জানালেন, এবারও বসন্তসংখ্যা প্রকাশ হবে। তুই লিখবি ?

যাক নন্দীগ্রাম সন্ত্রাসমুক্ত হয়েছে। মলয়ের মেজদাকে বর্ধমানে চলে আসতে হবে না। আনন্দর মনে পড়ল অসীমাকে জানান হয়নি আলোকের কথা। কোথাও কোকিল ডাকছে। কোকিলের ডাকে সম্বিত ফেরে। আবার বসন্ত আসছে। পত্রিকা প্রকাশ হবে। মলয়কে নিয়ে একটা লেখা লেখা যায়। ওর কথা লেখা উচিত। এটা একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ঘুরে ফিরে ওর কথা মনে পড়ে আনন্দর। বন্ধুদের মধ্যে ওকেই কেন কাছের মানুষ মনে করেছিল মলয় জানা যাবে না কোনোদিন। ওদের আপনজন আর ওদের মধ্যে নেই। নেই অনেকেই। যেমন আলোক। মলয় জানল না সন্ত্রাসমুক্ত নন্দীগ্রামের কথা। মলয় নেই, ভালবাসার খোঁজে হারিয়ে গেছে। প্রতি বছরের মতো এবার বসন্ত সংখ্যা শুধু কবিতা দিয়ে হবে না। তাতে গদ্যও থাকবে। আনন্দ সিদ্ধান্ত নিল, সে লিখবে গদ্য। ওর পদ্য লেখা আসে না। শিল্প-সাহিত্যের চর্চা-ক্রমশই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। সময় একটু নিশ্বাস ফেলার সময় দিচ্ছে না। তবু কিছু লিখবে মলয়কে নিয়ে।

মলয়ের মৃত্যু যেন একজন সৈনিকের মৃত্যু। যে মানতো না জীবন যাপনের বাঁধা ধরা নিয়মগুলো। শুধু মানতো, তার অনেক কথা বলার আছে। সে সব সৃষ্টির কথা। সে কথা আর জানা যাবে না কোনোদিন। কারণ মলয় চলে গেছে, সব শেষ হয়ে গেছে তার সাথে। সময় থেমে গেছে সময় ছিনিয়ে নিয়ে গেছে মলয়কে। এক দোল পূর্ণিমার দিন মলয় চলে গেছে। বাঁচার আকুলতা নিয়েই সে চলে গেছে। জীবনের শেষ পর্বের যুদ্ধে হেরে গেছে মলয়। ওকে হারানোর বেদনার থেকে আজ ওর স্মৃতির তাড়না অনেক অনেক বেশি কষ্টকর আনন্দর কাছে। ওর কাছের মানুষেরা বলে, এ শূণ্যতা কাটিয়ে উঠতে হবে আমাদের। আদর্শের প্রতি সৎ থেকে আত্মহত্যা করে ক্ষয়ে যাওয়া একে কী উত্তরণ বলে ? এই প্রশ্ন আজ আনন্দকে কুরে কুরে খায়। ওর মনে হয় এ এক ধরণের নিজেকে শেষ করে দেওয়া——এই কথাটা বলার জন্যই ও মলয়কে নিয়ে

লিখতে চায়।

সময়ের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ নিয়তিকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। ওর মনে হয় একে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। এ অবধারিত স্থির নির্দিষ্ট। আনন্দ মনে করে, আজ ও যেখানে পৌঁছিয়েছে, এও বোধহয় নিয়তি নির্দিষ্ট। আলোককেও বাদ দেওয়া যায় না। এই গদ্য-রবিদাকে ছাপতে হবে। রবিদা নিজে এক কলম লিখতে পারে না। অথচ পত্রিকা সম্পাদনা করে। কারণ পত্রিকা ওর আগ্রহে প্রকাশ হয়। আচ্ছা, এবারের 'বসন্ত উৎসব'-এ রবিদা কি শান্তিনিকেতন যাবে ? আনন্দ ফোন তুলল।

রাত এখন কত ? রবিদা কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?

একবার চেষ্টা করে দেখি ?

টেলিফোনটা হাতে নিয়ে ডায়াল করে আনন্দ। ওদিকে রিং বেজে যায়। কেউ ধরছে না। তবে কি ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা ? একটু আগে রবিদা তো কথা বলল ? লাইন কেটে দিয়ে আবার রিং করে আনন্দ। মনে হল কেউ যেন রিসিভার তুলল।

——হ্যালো ? কে ? রবিদা ?

——-কে বলছেন ? হ্যালো ? মিষ্টি সোনালী একটা সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে। তারের মধ্যে দিয়ে এ যেন কোনো কণ্ঠস্বর না বীণার ঝঙ্কার তার কানে এল বুঝতে সময় লাগল কিছুক্ষণ। ও দিকের প্রান্ত তখনও জানতে চাইছে, হ্যালো ? কে বলছেন আপনি ? কাকে চাইছেন ?

ঘাবড়ে গেল আনন্দ। জানতে চাইল, এটা কি টু ডাবল ফাইভ থ্রি এইট ফাইভ সেভেন ?

——ইয়েস। কথা বলছি। আপনি কাকে চাইছেন ? আপনি কে বলছেন ?

আবারও ঘাবড়ে গেল আনন্দ। কোনো কথা বলতে পারল না। ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা রয়েই গেল। ওদিকের কণ্ঠস্বর তখনো একটানা প্রশ্ন করে চলেছে, হ্যালো ? আপনি কে বলছেন ? হ্যালো ? হ্যালো ?

——আমি আনন্দ বলছি। আনন্দ টেলিফোনটা শক্ত করে ধরে।

——কে আনন্দ ? ততক্ষণে রবিদা চলে এসেছেন টেলিফোনে।

——রবিদা, তখন বলা হয়নি। আমি সিঙ্গাপুর যাচ্ছি। ওখানে হোটেলে একটা কানেকশন হয়েছে। আবার নতুন করে সব শুরু করতে হবে। নতুন করে....।

——সিঙ্গাপুর ? কেন রে ?

——আবার একটা কাজের অফার পেয়েছি।

——পারবি, পারবি আনন্দ। তুই পারবি।

——পারতেই হবে আমাকে। এখানে আর আমার ভাল লাগছে না।

——তোর মধ্যে শক্তি আছে আনন্দ। মনের জোরে তুই উতরে যাবি। লড়ে যা। আমরা তো কোনো সাহায্য করতে পারব না। তবু শুনে আমাদের ভাল লাগবে।

——রবিদা ! তোমার মনে আছে বিজনদার নাটকের সেই গানটা ? মলয় যেটা মাঝে মাঝেই গাইতো....বাঁচবো রে আমরা বাঁচবো।

——মরা চাঁদের গান। তরুন-তপনদা শিখিয়েছিল। হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। গানটা মনে পড়লে মনের মধ্যে জোর পাওয়া যায়। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তোর হবে, তুই পারবি। তুই চলে যা।

——পারতেই হবে আমাকে।

সিঙ্গাপুর যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। ভিসা-র অপেক্ষা শুধু, বাকি ফরমালিটিস শেষ হয়ে গেছে। ভিসা এলেই ভিসার সঙ্গে আসবে এয়ার টিকিট। প্লেনে চেপে বসব। কলকাতা থেকে কতক্ষণের পথ ! মাত্র একঘণ্টা। তোমাদের ছেড়ে দূরে চলে যাব আবার।

——দূরে কোথায় রে ? দুনিয়াটা এখন হাতের মুঠিতে। দেখিস না টিভিতে....।

——তা যা বলেছ।

সনাতন ঘরে ঢুকল। বলল, কার সঙ্গে কথা বলছ ? বীথিদি।

——না। বীথিদি ফোন করেছিল, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সনাতন বলল।

বীথি ওর সঙ্গে দেখা করতে চায় ? কেন বুঝতে পারে না আনন্দ ? এতদিন পর কি প্রয়োজন থাকতে পারে ?

আনন্দের মনে পড়ল কৃষ্ণসায়রের পারে দুজনে বসেছিল। বসেছিল অনেকক্ষণ। রাত নামছে বলে উঠব উঠব করছিল আনন্দ। ঠিক এমন সময় হঠাৎ ওদের সামনে জলের ধারে ঝপাস করে একটা কিছু পড়ার শব্দ পেয়েছিল। তাকিয়ে দেখেছিল একটা বিশাল সারস। পরিযায়ী সারস ছিল সেটা, নেমেছিল কৃষ্ণসায়রের জলে। আনন্দ বীথিকে দেখিয়ে বলেছিল, দেখ দেখ এদের 'দিঘর' বলে। রাত্রিকালীন খাবারের সন্ধানে জলে নেমেছে। উত্তেজনায় ওরা কথা বলতেই পাখিটা সতর্ক হয়েছিল। উড়ে গিয়েছিল তারপর।

এরা পরযায়ী, উদ্বাস্তু নয়। দেশে দেশে ওদের ঘর আছে। হেথা নয়, হোথা নয় অন্য কোথা। অন্য কোনখানে। আনন্দর মনে হয় ওর জীবনও যেন এমনই পরিযায়ী। বিধাতা পুরুষ হয়তো সেভাবেই এঁকে দিয়েছেন তাঁর জীবন। আবার আসছে সাগর পাড়ের ডাক।

সেবার পুজোর ছুটির আগে গোলাপবাগে বসে ছিল দুজনে বকুল গাছের নিচে। বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের রঙে রাঙা হয়ে বীথি বলেছিল, শরীরটা ভাল লাগছে না কেন বলুন তো ? কেমন শীত শীত করছে। চলুন বাড়ি ফিরি। ছুটির শুরুতে গোলাপবাগ নিরালা ছিল। গাছের তলায় দু চারজন যারা বসেছিল। সবাই একে একে উঠে পড়ছিল। আকাশে বাতাসে চারপাশে তখন 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে' কবিতার শঙ্খধ্বনি বেজে উঠছিল। এসময় শীত শীত লাগাটাই স্বাভাবিক। বীথি পড়েছিল পাতলা জংলা ছাপা শাড়ি। অবাধ্য হিমেল হাওয়ায় তার আঁচল উড়ে যাচ্ছিল। আনন্দ ওকে বলেছিল, আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নাও তাহলে শীত শীত করবে না।

বীথি এমনভাবে ওর দিকে তাকিয়েছিল। যেন ওকে তিরস্কার করছে। ওর শরীরী ভাষা আনন্দকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আজ ওর আঁচল উড়বে, আজ আঁচল উড়িয়ে দেবার দিন। আঁচল উড়েছিল ঠিক। ওর আঁচলের তলায় আনন্দর হৃদয় উড়েছিল। ভাল লাগছিল ওর। সেদিন সন্ধ্যায় বীথিকে ছাড়তে চাইছিল না ওর মন। কিন্তু ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এসেছিল। আর তখনই ওর মনে হয়েছিল ওর সামনে ভেসে আছে দুটো দুধ সাদা থলথলে বিস্ময়। ওর ইচ্ছে হয়েছিল, তাতে কান পাতে। ধুকপুপ শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনে। অন্ধকারে ওর উত্তপ্ত নিশ্বাস ঝড়ে পড়েছিল সেদিন বীথির শরীরে।

——এই কী হচ্ছে কী ? কী করছ তুমি ? বীথি ওকে ঠেলে দিয়েছিল।

বীথি সেদিনই প্রথম ওকে 'তুমি' বলেছিল। আনন্দর হাতের আঙুল তখন গোলাপী বৃন্ত থেকে বাতাবী লেবু ছিঁড়তে চাইছিল।

বলেছিল, তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে বীথি। আজ তুমি আমার হও। আমাকে ভালবাস।

বীথি কোন কথা বলে নি। বাদাম চেরা চোখ দুটো নিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েলি চুপচাপ, কোনো কথা বলে নি।

পাগলের মতো ওকে দেখছিল আনন্দ। মুখটা ধারালো। নাকটা খাড়া। পাতলা তিরতিরে ঠোঁট। বুঝেছিল এইরকম মুখ আর চেহারার আকর্ষণে কে না হারাতে চায় ? কিন্তু বীথি কিছু বলছিল না, সাড়া দিচ্ছিল না বীথি। তারপর

ঘটেছিল সেই কাণ্ডটা। হঠাৎ কিছু বলার আগেই বীথি ওকে দুহাতে গলা জড়িয়ে আকর্ষণ করে ওর ঠোঁটে বেশ ঘন করে একটা চুমু খেয়েই দূরে সরে গিয়েছিল। ওদের দুজনের দ্রুত নিশ্বাস পড়ছিল। আনন্দ বীথির বুকের ওঠানামা স্পষ্ট দেখছিল। অদ্ভুত একটা গলায় বীথি তখন বলেছিল, দোহাই আপনি সরে যান। আপনি সরে যান আমার সামনে থেকে।

বীথির ওই কথা শুনে বড় বড় গাছের নিচে তখন ছায়ারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণসায়রের জলে সন্ধ্যা নামছিল। নিস্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে ছিল জল। আস্তে আস্তে বীথি হাঁটতে শুরু করেছিল।

ওদের মেলামেশা ক্রমশ সহজ এবং ঘনঘন হচ্ছিল তারপর থেকে। যত ঘনঘন ওদের দেখা হয়েছিল। অন্যদের চোখে তত বেশি বেশি করে পড়ে যাচ্ছিল ওরা।

আলোক একদিন আনন্দকে বলেছিল, বীথিকে লটকানো অত সহজ নয় বুঝলি। ওকে ছেড়ে দে, নইলে মরবি।

——মানে ? অবাক হয়েছিল আনন্দ।

——ও অন্য ডালের পাখি। তুই বুঝবি না। ও যে সে ডালে ফট করে বসে না। বসলে ঘাড়ে চেপে বসে। তোকে নিয়ে এখন খেলছে। খবরদার ওর সঙ্গে প্রেম করিস না। প্রেম করলে মরবি। ধাক্কা খাবি।

——এসব কী বলছিস তুই ? চিৎকার করে উঠেছিল আনন্দ।

——চিৎকার করিস না শোন।

আলোক ওকে বীথির কথা শুনিয়েছিল। বলেছিল, ওর একটা নিজস্ব বাঁধা চিড়িয়া আছে। সে ডাক্তারি পড়ছে। তোর মতো হাভাতে গেঁয়ো নয়। বলছি না, ও তোকে নিয়ে খেলছে। তবে ওকে ছেড়ে দে, নইলে গুঁতো খাবি। বুকে ব্যথা হবে। তখন মরে যেতে ইচ্ছে করবে। তোর মতো ছেলে প্রেমে আঘাত পেলে মরে যাবি। তার থেকে বরং ছেড়ে দে, বেঁচে যাবি।

কথাটা কানাঘুষো আনন্দরও কানে এসেছিল। আলোকের কথায় ওর কপালে চিন্তার রেখা ফুটেছিল। বীথি ওর সঙ্গে খেলছে ? বীথিকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে ?

বীথিও বোধহয় এমন কিছু আঁচ করেছিল। পরদিন দুপুরে বকুল গাছের নিচে বলেছিল, আজ আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

আনন্দ ভেবেছিল হয়তো অন্যকিছু বলবে। তাই আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। ওর আরো একটু কাছে গিয়ে ঘন হয়ে বসেছিল। বলেছিল, হ্যাঁ, কি বলছিলে

বল ?

বীথি বলেছিল, আপনি কি আমাকে ভালবাসেন ? বীথি আবার ভাল করে উচ্চারণ করে বলেছিল, বলছি আপনি কি আমাকে ভালবাসেন ?

ওর এধরণের কথায় অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল আনন্দ, কেন ? তুমি বুঝতে পার না ? ভালবাসা কি মুখে বলতে হয় ?

——কিন্তু আমি যে বাসিনা। বীথি একটু দূরে সরে গিয়ে বলেছিল।

——তার মানে ? এতদিন ধরে তুমি আমাকে.....। আনন্দ উত্তেজিত হয়েছিল।

——ইনফ্যাক্ট আপনাকে আমি দাদার মতোই মনে করি। মানে দাদার মতো, প্রেমিক নয়।

——'দাদার মতো' ? কী বলতে চাইছ তুমি ? আজ হঠাৎ কি হল তোমার ? আমার কোনো অপরাধ হয়েছে ?

——মাঝে মাঝে এত বোকার মতো কথা বলেন না !

——ব্যাপারটা ইয়ার্কির নয় বীথি। কথাটা আজ বলতেই হচ্ছে। তাহলে সেদিন যেটা তুমি করলে তার মানে কি ?

——ও সব আমি জানি না।

——আজ বলছ জানিনা। তাহলে আগে বললে না কেন ?

——এই তো বললাম। এখন কি খারাপ লাগছে ?

——তোমার মতো স্পোর্টিংলি নিতে পারি না আমি সবকিছু।

——আমি জানি। জানি বলেই তো কথাটা আজ স্পষ্ট করে বলে দিলাম।

——কোনো কথা ?

——আপনাকে ভালবাসি না। আমাকে ভালবেসে থাকলে ভালবাসা ফিরিয়ে নিন। আমি আপনার ভালবাসার যোগ্য নই।

——সেটা আমি বুঝব।

——সেইজন্যই তো বলছি। আমার পক্ষে আপনাকে ভালবাসা সম্ভব নয়।

——কেন নয় ? আমি গরিব বলে ?

——না তা নয়।

——তাহলে ?

——আমার সব কথা আপনি জানেন না। জানলে একথা বলতেন না। আজ তাহলে সব কথা শুনুন। সব কথা বলব আপনাকে। সব শোনার পরও যদি

আমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে তখন না হয় আবার নতুন করে শুরু করা যাবে।

আনন্দ ওকে বলে, আমার কিচ্ছু শোনার দরকার নেই। আমি শুধু তোমাকে চাই। তুমি আমার হও।

——সেটা সম্ভব নয়।

——কেন নয় ?

——আমি একজনকে ভালবাসি।

——কী যা তা বকছ ?

——যা তা নয়। ঠিক বলছি। সত্যি আমি একজনকে ভালবাসি।

——বীথি, তুমি থামবে ?

——না। আপনি শুনুন। আমি একজনকে ভালবাসি।

——তুমি অন্য একজনকে ভালবাস ?

——হ্যাঁ।

——সে কে ?

——আমাদের পাড়াতেই থাকে।

——আমাদের পাড়াতে ?

অবাক হয়েছিল আনন্দ। পাড়াতে বীথির সঙ্গে প্রেম করবে এমন কাউকেই সেদিন ওর নজরে পড়ে নি। ওর জানার বাইরে এমন কোনো ছেলে থাকতে পারে এমন ওর কল্পনাতীত ছিল। একে একে সবাইকে মনে করেছিল। না, বীথির পাশে বসানোর মতো কাটকেই পায় নি। শেষে জানতে চেয়েছিল, কে বলোতো ?

বীথি বলেছিল, বুঝতে পারছেন না। না ?

——না। বলেছিল আনন্দ।

বীথি বলেছিল, ওর নাম গৌতম। ডাক্তারী পড়ছে। ওর সঙ্গে পরিচয় এক বছর আগে। প্রথম একটু মেলামেশা হয়েছিল। তারপর ঘনিষ্ঠতা হল। অবশেষে প্রেম।

গৌতমকে আমি ভালবেসে ফেললাম। ওর দিক থেকেও সাড়া পেতে দেরি হয় নি। ওর বাড়িতে তেমন কোন রেস্ট্রিকশন ছিল না। আমি হুটহাট গিয়ে হাজির হতাম। ওর আলাদা পড়ার ঘরে আমাদের আড্ডা চলত। ওদের বাড়িতে কেউ কিছু মনে করত না। আমি অঙ্ক করতে, পড়া বুঝে নিতে যেতাম। এমনি

করে মাঝে মাঝে সারাদিন থাকতাম। গৌতমের বাবা ডাক্তার। নিজের নার্সিং হোম আছে। চেম্বার নার্সিং হোম নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি বাড়ির বাইরেই কাটান। দুপুরের খাবারটাও তাঁর পৌঁছে যায় নার্সিংহোমে। গৌতমের মা লায়নস ক্লাব নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন। বাড়িতে থাকবার মধ্যে ছিল এক ঠাকুমা। তিনিও সারাদিন ঠাকুরঘরে ব্যস্ত। গৌতম হৈ হুল্লোড় একদম পছন্দ করে না। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা করেছে। ডাক্তার হবে। ছুটির সময় বাড়িতে ওকে একা পেয়ে আমার মাথায় দুষ্টুমি চেপেছিল। ও ধমক দেয়, ডোন্ট বি সিলি বীথি? লেখাপড়া করার সময় অন্যদিকে মন দিলে লেখাপড়া হয় না।

ওর এসব কথায় বীথির মনে হয়, এ আবার কোন ব্রহ্মচারীরে বাবা!

একদিন সব সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল বীথির। সন্ধ্যায় লোডশেডিং হয়েছিল। ইনভার্টারের আলোয় ওকে অঙ্ক বুঝিয়ে দিচ্ছিল গৌতম। বাইরে বৃষ্টি নেমেছিল। ওইরকম আবহাওয়ায় বীথির মধ্যে আদিম ইচ্ছেটা জেগে উঠেছিল। আলোর সুইচটা অফ্ করে দিয়েছিল বীথি।

——কি হল? বলে গৌতম আবার আলো জ্বেলেছিল।

বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে গৌতম কি বুঝেছিল কে জানে, চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। বীথি আবার আলো অফ্ করে দিয়েছিল। আলো জ্বালবে বলে গৌতম আবার হাত বাড়িয়েছিল। বীথি ওকে পিছন থেকে জাপটে ধরেছিল। কিন্তু গৌতম আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তাই ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল বীথি।

গৌতম বলেছিল, ঠিক আছে আর পড়তে হবে না। চল বারান্দায় যাই।

দুজনে বারান্দায় এসেছিল। বারান্দায় অন্ধকার ছিল। বীথি বারান্দায় আবার ওকে সজোরে জড়িয়ে ধরে ওর মুখটাকে ওর বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিল। এমনি করে ওকে বীথি ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। গৌতমের সব প্রতিরোধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারপর ওরা দুজনে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল।

বাইরে তখন অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। তারপর কখন বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল বুঝতেই পারেনি। কুমারীত্ব বিসর্জন দিয়ে সেদিন বীথি নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছিল। একটা অজানা আনন্দের শিহরনে ভরে উঠেছিল ওর মন। এরপর কী হবে, এসব কথা মাথার মধ্যে আসে নি। তারপর শুধু ভেসে গেল। ভেসে গেল দুজনে। একদিন বুঝতে পারল বীথি যে মা হতে চলেছে। মাথার ওপরে তখন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। ভয়ে কেঁপে উঠল বুক। এখন কী হবে? কী করবে সে? গৌতম যদি সব অস্বীকার করে?

কিন্তু না। ঠাণ্ডা মাথায় সব শুনেছে গৌতম। জানতে চেয়েছে, কী করতে চাও তুমি ?

বীথি বলেছে, আবরশন করবে।

গৌতম বলেছে, আচ্ছা তুমি নিশ্চিত, তুমি যে কাজটা করতে চাইছ সেটা সঠিক ?

বীথি বলেছে, এই প্রশ্নের উত্তরটা যদি আমি না দিই ?

গৌতম বলেছে, দেখো আমি শুধু শুনতে চাইছি প্রত্যেকটা কাজের পিছনে একটা লজিক থাকে। এক্ষেত্রে তোমার লজিকটা কী ?

বীথি বলেছে, আমি এই বাচ্চাটা চাই না।

——কিন্তু কেন ? জানতে চেয়েছে গৌতম।

——কারণ এ সমাজসিদ্ধ উপায়ে আসছে না। বীথির বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয় নি গৌতম। বলেছে, তার তো একটা উপায় আছে। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। মা'কে আমি বলছি।

——না বীথি ওকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আমি চাই অ্যাবরশন। এটাই আমার শেষ কথা।

গৌতম বলেছে, শেষ বারের মতো ভেবে দেখ বীথি ?

বীথি দৃঢ়ভাবে বলেছে, না। আগে এই অবস্থাটার সামাল দাও। বিয়ের কথা পরে ভাববে।

গৌতম কিছুতেই চায় নি। বীথিকে বোঝাতে চেয়েছে বারবার। বলেছে, ভেবে দেখ। আমাদের সৃষ্টিকে ধ্বংস করছো তুমি ? হোক না, না চাইতেই পেয়েছি ওকে ?

——আমি কোন কথা শুনতে রাজী নই। বলেছিল বীথি। বলেছে, আমি যা বলছি ভেবেচিন্তেই বলছি। তুমি সব ব্যবস্থা কর।

গৌতম সব ব্যবস্থা করল।

খোসবাগানের নার্সিংহোমে ওকে নিয়ে গেল। ডাক্তার গৌতমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেও ওকে অনেক বোঝাল। পরামর্শ দিল। কিন্তু বীথি নাছোড়। শেষে ডাক্তার রাজী হল।

অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে বীথি বাড়ি ফিরল। শরীর খুব দুর্বল হয়েছিল। বাড়িতে সবাই জানল, কলেজে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছে। রক্তাল্পতা। ডাক্তার খাওয়া দাওয়া আর বিশ্রাম নিতে বলেছে। তিন চার দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

কিন্তু শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সারতে সময় নিল।

বীথি এরপর গৌতমদের বাড়ি যায়, দেখে ও কেমন ঘোলাটে চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকে। কিছুদিন পর বীথি বুঝতে পারল, গৌতম ওকে সস্তা একজন মেয়েছেলে ভাবতে শুরু করেছে। আগের মতো ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সিনেমায় যায়। ঠিক। সাবধানে সতর্ক হয়ে ওরা দুজনে খেলায় মাতে। কিন্তু সব যেন কেমন যান্ত্রিক। প্রেম নেই। প্রেম শুকিয়ে গেছে, মজে যাওয়া নদীর মতো।

বীথি বুঝতে পারে, ওদের প্রেম শুকিয়ে গেছে। টিঁকে আছে সুধু প্রেমের খোলসটা। বন্ধুত্ব। আর নিজের এই সর্বনাশ ও নিজেই করেছে। এখন আর ফেরার কোন পথ নেই।

এ পর্যন্ত আনন্দকে বলে, বীথি চুপ করেছিল।

আনন্দও চুপ করে ওর কথা শুনছিল। কোন কথা বলেনি।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বীথি তারপর বলেছিল, আসলে দোষটা তো আমারই। আমি গৌতমকে এই খেলায় উত্তেজিত করেছিলাম। ওর মুখের সামনে নেশার পেয়ালাটা আমিই তুলে ধরেছিলাম। আমারই জোরাজুরিতে ও খেলায় মেতেছিল।

আনন্দ বুঝতে পেরেছিল, বীথি অনুশোচনায় ভুগছে। বীথি চোখের জল মুছেছিল রুমালে। মাথা নিচু করে বলেছিল, আমায় খুব খারাপ মনে হচ্ছে না? যাক গে আমার সব কথা বলা হয়ে গেছে। এবার আমি উঠলাম, বাড়ি যাচ্ছি।

বীথি চল্লে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল। পা বাড়াল। আনন্দর মনে হয়েছিল এই মুহূর্তে বীথিকে কিছু বলার দরকার। কিন্তু কী বলবে বীথিকে? বুঝতে পারেনি, আর কিছু বলা হয়নি ওকে।

কিন্তু পা বাড়িয়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বীথি। হয়তো কিছু শুনতে চেয়েছিল। বলেছিল, অবশ্য আপনি চাইলে ওইরকম বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে হতে পারে। তবে প্রেম কখনও নয়।

——কী বলছ বীথি? আনন্দর গলা দিয়ে আর্তনাদ ঝড়েছিল সেদিন।

বীথি হেসেছিল। ওর হাসিতে বেদনা ঝরেছিল সেদিন আনন্দ ওর চলে যাওয়া দেখছিল। জাগতিক যা কিছু ভাল, ভালবাসা-প্রেম সবকিছুকে ফুৎ কারে উড়িয়ে দিয়ে পায়ে দলে চলে গিয়েছিল বীথি। আনন্দ আর কিছু বলতে পারেনি।

কৃষ্ণসায়রের জলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিল, বীথি যেরকম বলল এরকম বন্ধুত্ব ভালবাসার মানুষের কাছে চাওয়া

যায় ? ভালবাসা এতই মূল্যহীন ? এই পৃথিবী কি এতই রূঢ়, এতই বাস্তব হয়ে উঠেছে ? এখানে কি প্রেম মরে গেছে ? এইসব প্রশ্নে কুঁকড়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল বীথি যেন ওর গালে সপাটে একটা চড় মেরে চলে গেল।

শুকনো দামোদরের খটখটে পাড় বেয়ে নিচে নেমে আসে আনন্দ। বীথিকে অনেকবার নিয়ে এসেছে এই জায়গাটায়। শহরের শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে গেছে দামোদর। ঘিঞ্জি শহরের বাইরে নদীর ধারের নিরালা এই জায়গাটা মাঝে মধ্যেই ও বীথিকে নিয়ে এসে বসতো। শেষের দিকে কমে গিয়েছিল একদম। তখন আসতো একা একা। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে জলের ধারে গিয়ে বসতো। পাতলা কাঁচের গাছের ঝোপজঙ্গল। বেনাঘাস আর আকন্দের ঝাড় হাওয়ায় দুলছে। পাড়ের ওপর দিয়ে ডিভিসি-র মোরাম রাস্তা সোজা গিয়ে মিশেছে সদরঘাট ব্রিজের সঙ্গে। এই ব্রিজের নাম কৃষক সেতু। ব্রিজ পার হয়ে রাস্তা চলে গেছে ওদিকে বাঁকুড়া, এদিকে আরামবাগ। বর্ধমান শহরের সঙ্গে যোগাযোগের সেতুবন্ধন এই কৃষক সেতু। দামোদরের জল এখন সরু সুতোর মতো তিরতিরিয়ে বয়ে চলেছে। বীথি ওর সঙ্গে তার জীবনের সেতু ভেঙ্গে দিয়ে চলে গিয়েছে।

আবার সেই বীথি ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কেন ? নিজের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। উত্তর পায় না।

দামোদরের জলের ধারা অনেকখানি বয়ে গেছে পূর্বদিকে। নদীর চড়ে শালিখ পাখির দল স্নান সেরে এসে গায়ের জল ঝাড়ছে। জলের মধ্যে একটা বাঁশ পোঁতা। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাঁশটা। তার ওপরে একটা পানকৌড়ি বসে আছে। সেও ডানামেলে তার ভেজা ডানা শুকিয়ে নিচ্ছে। দূরে অনেক দূরে বালি তোলার ঘাট। চার-পাঁচটা লরীতে বালি তোলা হচ্ছে। নদীতে নৌকায় বালি তোলা হচ্ছে। অনেক মানুষ কাজ করছে নদীর বুকে। বর্ষায় এই নদীর কী ভয়াল রূপ হয়। ভরভরন্ত নদী তখন ঘোলাটে জল নিয়ে ছোটে হুগলী মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডুবিয়ে দিতে। আর এখন সেই নদীর বুক খালি। বিশাল বালির চড় মধ্যিখানে। এই বালির চরের মতোই খাঁখাঁ করছে আনন্দর বুক। ওর বুকের ভেতরটা হু হু করে। মনের মধ্যে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বিরাট এক ধরণের শূণ্যতা সেখানে।

'বীথি....ই' বলে চীৎকার করে ওঠে আনন্দ।

ওর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয় নদীর ফাঁকা চড়ে। নদীর শূন্য বুকে এই

প্রতিধ্বনি যেন খা-খা-খা করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

আনন্দ দুবাই গিয়েছিল একটা কাজের যোগাযোগ হওয়ায়। মাত্র কয়েক-বছরের জন্য। দুবাই ভাল লাগে নি। চলে এসেছে। এবার সিঙ্গাপুর ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রবিদার বাড়ি গিয়েছে। বীথি ওর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওর আর ইচ্ছে করেনি বীথির বিষয়ে মাথা ঘামাতে। মমতা বুঝতে পেরেছে আনন্দ বীথিকে এড়িয়ে চলেছে।



জুডিসিয়ারী পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল আনন্দ। কিছুদিন রবিদার বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়েছিল সে কারণে।

তারপর হঠাৎ খবর পেয়েছিল, বীথির বিয়ে হচ্ছে। কার সঙ্গে ? বুকটা ছাৎ করে উঠেছিল। তারপর ভেবেছিল নিশ্চয় গৌতমের সঙ্গেই বিয়ে হচ্ছে।

আনন্দর ইচ্ছে ছিল বীথির বিয়েতে যাবার। কিন্তু কোনো নিমন্ত্রণ পায় নি। না রবিদার কাছ থেকে, না বীথির কাছ থেকে। তবু মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা করেছে, বীথি যেন সুখী হয়।

পরে জানতে পেরেছে, গৌতমের সঙ্গে বীথির বিয়ে হয়নি। হয়েছে অন্য একজনের সাথে। তখনও মনে মনে বলেছে, যাক ভাল থাকুক বীথি। মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে। কিন্তু ভুলতে পারে নি মনের মধ্যে খোঁচা মারা প্রশ্নটা। রবিদাও কি ওকে ভুলে গেছে ?

বীথির বিয়ের দিন পাড়ায় থাকতে পারেনি আনন্দ। সদরঘাটের নির্জন জায়গায় গিয়ে বসে থেকেছে সারাদিন, যেখানে বীথির সঙ্গে কেটেছে ওর বহু সন্ধ্যা। মনে পড়ে একবার অনেক রাতে ওরা দুজনে এইখানে এসে ওরা বসেছিল। ওদের পিছনে ছিল ঘুমন্ত নগরী। সদরঘাট ব্রিজের ওপর আলোগুলো মালার মতো দুলছিল। হঠাৎ কি খেয়ালবশে বীথি গান গেয়ে উঠেছিল ঃ আমি যে গান গেয়ে ছিলেম। ও যে এত ভাল গান গাইতে পারে জানা ছিল না আনন্দ-র। সেদিন ওর সমস্ত অন্তর গান গেয়েছিল বীথির সাথে। ও গলা মিলিয়ে ছিল। ওর মনে হয়েছিল, এখন যদি দুজনে মরে যায় ; এ মৃত্যুও কাম্য। এ জীবন সার্থক ! পরে এই গান বহুবার শুনেছে। কিন্তু সেদিনের মতো অনুভূতি আর কোনোদিন হয়নি। বিশাল বটগাছের নিচে কালী মন্দির। শান বাঁধানো মন্দিরের চত্বর। মন্দিরের সন্ন্যাসী ওদের চেনেন, তিনি কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছেন,

মন ভাল নেই বাবা ? তাহলে বসে থাকো, মায়ের সামনে। মন ভাল হয়ে যাবে।

আজ আবার সেখানে এল আনন্দ, দেখে সদরঘাট ভীড়ে ভীড়াক্কার।

বসতে চেয়েছিল পরিচিত জায়গাটায় যেখানে বীথি শুনিয়েছিল ওদের ভবিষ্যত জীবনের কত স্বপ্ন। আজ দেখল সেই জায়গাটায় দোকান বসেছে। চপ মুড়ি বিক্রি হচ্ছে। তিন চার দিন আগে বোধহয় পূর্ণিমা ছিল। নদীর বুকে মস্ত বালির চড়ে অনেক মানুষের ভীড়। সন্ধ্যে তখনও হয়নি। নদীর বুকে মানুষের ঢল। ছট পুজো পরব চলছে। ছট এই শহরের হিন্দি ভাষাভাষি মানুষের উৎসব। এই শহরে হিন্দি ভাষাভাষি মানুষের সংখ্যা কম নয়। সুসজ্জিতা সালাঙ্করা বিভিন্ন বয়সী নারীরা চলেছে, ওদের এক একজনের হাতে পিতলের বড় বড় রেকাবি। তাতে এবং ওদের মাথার ঝুড়িতে ধূপ ধুনো ফল-মাকড় প্রদীপ মোমবাতি পুজোর নানা উপকরণে ভর্তি। মেয়েলি সুরে গান গাইতে গাইতে তারা নদীর চড়ে নামছে নদীর কাছে যাবে বলে। তারপর মেয়েরা জলে ডুব দিচ্ছে। চুরির রিনঠিনে, শাড়ির খসখসানির মধ্যে মানুষের সমবেত মন্ত্রোচ্চারণে সমবেত সঙ্গীতের আবহে সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে পূজা হুল্লোড় করতে করতে আসছে, যাদের পুজো হয়ে গেছে, কেউ কেউ ফিরেও যাচ্ছে। এই যাওয়া আসার মধ্যে দ্রুত ধাবমান আলোকবর্তিকার মিছিল ভেসে ভেসে এগিয়ে যাচ্ছে দূরে, আরও দূরে কোনও সুদূর তারাদের দেশে। শঙ্খ ঘন্টাধ্বনির মধ্যে নদীর বুকে সন্ধ্যা নামছে।

লাউডস্পিকারে গান এবং মন্ত্রোচ্চারণ শুনছিল আনন্দ। নতুন নতুন দল এসে ঢুকছে। দূরে কোথাও ভজন গান হচ্ছে। বড় বড় লাইট জ্বলে উঠেছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জলের ধারে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহুদূরব্যাপী আলোক মালার বুটিক আর এদিকের আলোকসজ্জার মধ্যে মানুষের মেলায় ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, ধুনোর গন্ধ—সব মিলিয়ে এক স্বর্গীয় ভাবনার দোত্যক আনন্দর চারপাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। চারপাশে ও কেবল শুনছিল শঙ্খ আর ঘণ্টার ধ্বনি। তারা বাজছিল, কেবলই বাজছিল।

বুঝি অনেকক্ষণ পর নিজের চেতনায় ফিরেছিল আনন্দ। সন্ন্যাসী তাকে ডাকছিলেন, বলছিলেন, অনেক রাত হয়েছে বাবা। বাড়ি যান। বাড়িতে মা ভাবছেন।

দূর থেকে মাইকে একটা গান ভেসে আসছিল।

'তুই আমার গলার মালা

তুই আমার হাতের বালা রে।
করে লে করে লে পীড়িত
সজনী রে' ॥

রাত তখন গভীর হয়েছে। ঘরে ফিরতে হবে, উঠে পড়েছিল আনন্দ। ভালবাসার রাজ্যে যোগাযোগের বিচার থাকে না সত্যিই, কিন্তু এই যোগাযোগের অর্থ কী ? আলোকের কথাগুলো মনে পড়ছিল। ও বলেছিল, বীথি অন্য ডালের চিড়িয়া, ওকে ছেড়ে দে।

মনকে সান্ত্বনা দেয়। দুঃখ কষ্টে ভরা এই পৃথিবীতে সবকিছু আছে বলেই আলাদা আলাদাভাবে আনন্দ কোনটা, দুঃখ কোনটা বুঝতে পারা যায়। শূণ্য থেকে জীবন শুরু করেছে এই শহরে। ওর পুঁজির ভাঁড়ার একেবারে শূণ্য নয়। এই সান্ত্বনায় বাড়ির পথে ফিরে চলছিল। মনে মনে বলছিল, আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।

জুডিসিয়ারী পরীক্ষা দিয়েছিল আনন্দ। চাকরিটা আরো ভালো করতে চায় বলে। আইন পরীক্ষার ভাল ফল ওকে উৎসাহিত করেছিল। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেলেই সবকিছু চলে আসে হাতের মুঠোয়, এরকম ভাবনাকে আগে ঘৃণা করতো সে। ওর মধ্যে তখন এই প্রতিক্রিয়াগুলো কাজ করতো। অর্থকরী প্রতিষ্ঠাই জীবনকে সকলের কাছে গ্রহণীয় করে তোলে, এমন ভাবনাকে একদিন সে ঘৃণা করেছে প্রচন্ডভাবে। আর এখন দেখছে হাতে অর্থ থাকলেই দুনিয়াটা তার বস হয়ে যায়, নইলে নয়। সুতরাং পথের ভিখারীকে সবাই করুনা করবে, কেউ চেয়ে দেখবে না। এই ভাবনার মূলমন্ত্রে ক্রমশ ভাবিত হয়ে পড়ছে আনন্দ।

সিঙ্গাপুরের ভিসা আসছে আসবে বলে ওর মনের ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল, ধৈর্যের পরীক্ষা যাকে বলে। সে মহকুমা আদালতের বিচারক হয়েছে, তাতেও খুশি হয় নি। জুডিসিয়ারি পরীক্ষায় বসেছে, ফলের জন্য অপেক্ষা চলছে। অপেক্ষা চলছে সিঙ্গাপুরের জন্য। মানসের সঙ্গে কথা বলে ইন্টারনেটে টেলিফোনে। মানস জানায়, ও এখনও আশাবাদী ভিসা আসছেই। মানস আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বলছে। তাহলে আসছে সেই বহু প্রতীক্ষিত নীল সাগরের আহ্বান।

কোর্টে যাতায়াত করে। কোর্টে কতরকম মানুষের আনাগোনা। সমাজের জলছবি প্রতিদিন একটু একটু করে ওর চোখের সামনে পর্দা তোলে। এ সমাজ জীবন ওর একেবারেই অচেনা ছিল। এই সমাজ জীবনের কথা সচরাচর ভাবতো না। তাই মাঝে মাঝে হোঁচট খায়, চমকে ওঠে। পৃথিবীতে প্রেম ভালবাসা শান্তি

বোধহয় ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পেশাগত জীবনে যতই জড়িয়ে পড়ে, ততই দেখে বাস্তব জীবন কত বীভৎস। বিকাশ অন্য জেলায় বদলী হয়ে গেছে। দীপ্তি কাকু অসুস্থ। রবিদার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। মলয়ের মেয়ে এখন কলেজে পড়ে। শুধু অন্তরার কোনো খবর পায় না। খবর পায় না অসীমারও। অবশ্য সেটা এখন সম্ভবও নয়। আনন্দর ভিসা আসে না।

জুডিসিয়ারীর ফল প্রকাশ হয়। মহকুমা জজ থেকে জেলা জজ হল আনন্দ।

এই পেশায় অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। নিজের ভাবনা চিন্তা আবেগকে টুঁটি চেপে ধরতে হয় কখনো কখনো। প্রেম, ভালবাসা, আবেগ—আদালতে এসবের কোনো গুরুত্ব নেই। আদালত সব ক্ষেত্রেই আইনের বইয়ের পাতায় লেখা কতগুলো বাঁধা শব্দে চলতে চায়, নয়তো 'এভিডেন্স' চায়। কে মা, কে বাবা, কে সন্তান, কে স্ত্রী—আদালত মান্যতা দেবে শুধু 'এভিডেন্স' অনুযায়ী।

একদিন কোর্টের বটতলায় হঠাৎ দেখতে পেল বীথিকে। প্রথমে চিনতে পারেনি। অনেকদিন পর দেখা একটু মোটা হয়েছে। মুখটা চেনা চেনা লাগছিল, সঙ্গে একজন সুপুরুষ যুবক ছিল। যুবকটিও দেখতে বেশ সপ্রতিভ। ভাবল বীথি ভাল বর পেয়েছে। দুজনে খুব সুখী মনে হচ্ছে। হেসে খলখল করে কথা বলছে। ওকে দেখছিল আর ভাবছিল ওর সঙ্গে যার ঘর করার কথা, সে এখন অন্যের ঘরনী। আর ও সেই নারীকে দেখছে। একেই বোধহয় অদৃষ্ট বলে অথবা বিধিলিপি!

তাই বীথিকে বোন ভাবার চেষ্টা করছিল। আর তখনই ওর মনের মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা ধস্তাধস্তি সুরু হয়ে গেল। কথা বলতে বলতে বীথি একবার ওর দিকে পিছন ফিরল। আনন্দ দেখল ওর পিঠের দিকটাও খুব সুন্দর। চওড়া ভারি কাঁধ। সুন্দর খোঁপা বেঁধেছে। সুগঠিত গলা। হলুদ শাড়ি আর সবুজ ব্লাউজে ওকে দারুন মানিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই আনন্দ ওকে বোন বলে ভাবতে পারল না।

এক একটা মেয়ে থাকে যেন অন্য মশলা দিয়ে তৈরি। নিমেষে আপন করে নেয়। বীথি সেইরকম মশলায় তৈরি। যেখানে রাখবে সেখানে মানাবে। কিন্তু এ এখন পরস্ত্রী। আনন্দ এখনও বিয়ে করেনি। তবু বোঝে, অসুস্থ হলে স্ত্রী-র অভাব কেমন। স্ত্রী-র কাছে যতটা সহজ হওয়া যায়, অন্যের কাছে তা হওয়া যায় না বুঝেছে এতদিনে।

আনন্দ-র বারবার মনে হয় এমন শিশুর মতো সরল আর নিষ্পাপ মুখ যার তার মনে কি করে পাপ থাকে! ও নাকি শহরের কোন হোটেলে আপত্তিজনক অবস্থায় ধরা পড়েছে। বিভিন্ন সরকারি অফিসারদের সঙ্গে ও নাকি

ঢলাঢলি করে। ও নাকি কোনো রাতেই বাড়ি থাকে না। আর যারা এসব আলোচনা করে তারা সকলেই প্রত্যক্ষ্যদর্শী। আশ্চর্য! কিন্তু বীথি কোর্টে এসেছে কেন? এই চিন্তা উদ্বেগ তৈরি করল ওর মনে।

অফিসের বাইরে এল। আর্দালি, কেয়ারটেকার ছুটে আসে। সাহেব বাইরে কেন? কি দরকার? ওদের আশ্বস্ত করে আনন্দ। টাইপিস্ট, মুহুরী, ভেন্ডারদের পাশ কাটিয়ে বীথির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, কী কেমন আছ? চিনতে পারো?

—আরে আনন্দদা যে? একগুচ্ছ হাসিতে গড়িয়ে যায় বীথি। বলে, এই যে, এ হচ্ছে গৌতম। আমার বন্ধু। এর কথা আপনাকে আগে বলেছি। আর গৌতম, এ হচ্ছে আনন্দদা....।

গৌতম নমস্কার করল। অবাক চোখে গৌতমকে দেখল আনন্দ। এই শহরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার গৌতম। আনন্দ ওর নাম শুনেছে। শহরে নামকরা নার্সিংহোম চালায়। বীথির বন্ধু, স্বামী নয়। গৌতমও নিশ্চয় বিয়ে করেছে, স্ত্রী আছে ওর।

আনন্দর মনের কথা বীথি বোধহয় টের পেল। বলল, আনন্দদা, আপনি তো সেই বাড়িতেই আছেন? আপনি এখানে আছেন জানতাম না। কাল যাব একবার আপনার বাড়িতে। আজ খুব ব্যস্ত আছি। চলি।

—এসো গৌতম। বলে সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল বীথি।

শনিবার। আনন্দর ছুটির দিন। বাড়িতে থাকবে কি থাকবে না। তা জানার অপেক্ষা না করেই বীথি চলে গেল। যাবার আগে ফোন নম্বরটা চেয়ে নিল মিষ্টি হেসে।

পরের দিন ঠিক দুপুরবেলায় সত্যি সত্যি ওর আগমন ঘটল। বাড়িতে ও আসবে ভাবতে পারেনি আনন্দ। ঠিক যেমন আগে এসেছে, হাসিতে তেমনি ঝলমল করে আনন্দর ঘরে ঢুকল।

ভাল করে ওকে দেখল আনন্দ। আজও পড়েছে সবুজ সবুজ অন্য ধরনের একটা তাঁতের শাড়ি। গরমে তেতে ওঠা মুখ চিকচিক করছে। ঠোঁটের ঠিক ওপরে বাঁ দিকের তিলটা তেমনিই আছে। সিঁথিতে ছোট্ট করে সিঁদুরের ছোঁয়া, মুখটাকে আরো মিষ্টি করেছে। প্রথমেই গলা শুকিয়ে গেছে বলে জল চাইল।

সনাতনকে জল দিতে বলল আনন্দ। সনাতন এখনও ওর গার্জেন জেনে ও নিজেই রান্নাঘরে চলে গেল দেখা করতে। সনাতন ফ্রিজ থেকে মিষ্টি আর জল

নিয়ে এল।

টেবিলের উপরে রাখা আনন্দর মা-র বাঁধানো ফটোটার দিকে নজর পড়ল বীথির। শুকনো মালাটা খুলে দিল। বলল, ইস্ মাসীমা নেই ভাবতেই পারছি না।

আনন্দর বিছানা, টেবিল, বইয়ের র‍্যাক—দু'মিনিটের মধ্যে গুছিয়ে দিল। তারপর বিছানার ওপরে গুছিয়ে বসল। বলল, এইখানে বসুন।

আনন্দকে ওর পাশে বসতে বলল। বলল, বাড়িটা সেই আগের মতোই ধ্যাড়ধ্যাড়ে কেন ? আপনি তো এখন ভাল চাকরি করছেন। কোনো প্রমোটারকে দিলেই তো তিনতলা ছ-টা ফ্ল্যাট করে দেবে। ইচ্ছে মতো যেকোনো ফ্লোরে থাকতে পারেন। বাকিগুলোর ভাড়া পাবেন।

আনন্দ বলল, কেন ? বাড়িটাতো এখনও ভাল আছে।

—মাসীমা নেই। মানুষের শরীর নিয়ে বড়াই করে কোনো লাভ নেই। যে কটা দিন বাঁচবেন ভাল আলো জল হাওয়া খেয়ে বাঁচবেন তো ? অসুখে পড়লে এই নির্বান্ধব পুরীতে আপনাকে কে দেখবে ?

আনন্দ অবাক হয়ে ওকে দেখছে। সনাতন চলে যেতে চেয়ারে বসতে গেল। ওর হাত ধরে টেনে বিছানায় ওর পাশে বসাল বীথি। হাতটা ছাড়ল না। টেনে ধরে রাখল নিজের দু-হাতের মধ্যে।

আনন্দ বুঝতে পারল বীথির হাতের তালুটা খুব গরম। ওর বাঁ হাতের মধ্যমায় দেখে একটা তামার আংটি পড়েছে। অনামিকায় পড়েছে সীসার আংটি। কনুইয়ের কাছে দেখে বেশ কয়েকটা তাবিজ মাদুলি বাঁধা। ওর মনে হল নবগ্রহের সব গ্রহগুলিই বীথির প্রতি বিরূপ। তাই একসাথে অতগুলো তাবিজ মাদুলি ধারণ করেছে।

ঘরে কেউ নেই। বীথি একেবারে ওর বুকের কাছে। খুব করে চুল বেঁধেছে। বুকের আঁচল সরে গেছে একপাশে। লাল চকচকে ব্লাউজ। চোখ সরিয়ে নেয় আনন্দ। সতর্ক হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বীথি কি যেন ভাবল। তারপর বলল, আপনি এখনও বিয়ে করেন নি কেন আনন্দদা ?

আনন্দদা, এই তো ! আবার সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটাতে চাইছো বীথি ! আনন্দ মনে মনে বলে, তুমি কি পুরনো ঘা-টা নতুন করে জাগিয়ে দিতে চাইছ ? না। সে মুখে বলে, আরে আমার সত্যি কোনো প্রবলেম নেই, সিরিয়াসলি বলছি। বলতে পারো, আমি এক্কেবারে ফ্রি বার্ড। চিন্তা ভাবনা

করবার জন্য ওই সনাতন আছে। ব্যস।

—কোনো লেডি বন্ধু ? নেই আপনার ?

—না !

—বিশ্বাস করি না। চেহারাটা তো এখনও লেডি কিলারের মতো ধরে রেখেছেন ?

—সে দোষটাও কি আমার ?

—বটেই তো !

—বেশ বাবা বেশ ! তুমি কেমন আছ বল ? তোমার স্বামী ? ছেলে মেয়েদের, সংসারের গল্প বল ?

—আমার আবার সংসার ! আছি। বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন চাপা দিতে চাইল বীথি। তারপর বলল, কাল গৌতমের সঙ্গে আমাকে ওভাবে ওখানে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছেন তাই না ?

—হ্যাঁ। মানে শুনেছিলাম অন্য কারো সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। তাকে তো চিনি না। তাই ভেবেছিলাম—

—ঠিকই শুনেছেন। গৌতম আমার স্বামী নয়।

—সে তো বুঝলাম। তাহলে তোমার স্বামী কে ?

—আছে একজন। খুব ভালমানুষ। নিপাট ভদ্রলোক। আমাকে খুব ভালবাসে। যা বলি তাই বিশ্বাস করে, একটুও অবিশ্বাস করে না।

—বাঃ। বেশ বললে ? তোমাকে একটুও সন্দেহ করে না। বলতে পারলে এইকথা ? তার মানে তুমি সন্দেহজনক কিছু করো ? ভালমানুষের সুযোগ নিয়ে একজন ভদ্রলোককে তুমি প্রতারণা কর ?

আনন্দর কথায় বীথি একটুও চমকালো না। বলে, দেখুন আনন্দদা, প্রতারণা যদি বলেন আমি আপনাকে করতে পারতাম অনেকদিন আগে। কিন্তু আমি তা করিনি। করেছি কি ?

আনন্দ বলল, তা করনি। হয়তো তখন গৌতমে মজে ছিলে বলে। কিন্তু তোমার নামে লোকে এত বদনাম করে কেন ?

বীথি এবার টসকালো। আঘাতটা বোধহয় ঠিক জায়গাতেই করে ফেলেছে আনন্দ। বলল, লোকে কেন বলে জানেন ? যে সব মেয়েদের বাইরে রোজগারের জন্য বেরোতে হয় তাদের সম্পর্কে লোকের প্রচলিত যা ধারনা আছে আমি তা হতে পারিনি বলে। আজকাল এসব হাস্যকর কথা। জীবনটাকে ভোগ করুন দেখবেন কত ধানে কত চাল। আপনি তো বিশাল টাকা বেতন পান, একা মানুষ

এসব বুঝবেন কী করে ?

——তোমার কাছে এই উপদেশ মানায় না বীথি। আনন্দ বলে।

——আমি কি আটত্রিশ বছরের বাচ্চা মেয়ে নাকি ? যে একজন নতুন মানুষকে দেখলে তার সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দেবো ? আপনি কী ভাবেন আমাকে ? কুড়ি বছরের পুরনো আমাদের বিবাহিত জীবন।

——তাতে কি হয়েছে বীথি, বিয়ে হলেই কি মেয়েদের সবকিছু শেষ হয়ে যায় ? সবকিছু থেমে যায় ? তারপরে কি আর কিছুই নতুন ভাববার——নতুন করে চিন্তা করবার থাকতে পারে না ? তুমি কি তোমার স্বামীকে তোমার জীবনের গোপন সত্যের কথা বলেছ ?

বীথি কিছুক্ষণ নীরব থাকে। তারপর বলে, না। আমার স্বামীকে আমি আমার জীবনের চরম সত্যিটার কথা বলতে পারিনি। সত্যি সে সাহস আমার হয় নি। কিন্তু এই যে দেখছেন আমার হাতের ছাতা আর পায়ের স্লিপার——এর স্পর্শ বহু লোককেই পেতে হয়েছে।

——কিন্তু একদিন তোমাকে সেই সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে। সেদিন তুমি তোমার জীবনের সেই চরম সত্যকে জানাতে বাধ্য হবে। সেদিন তুমি যদি লজ্জা নিয়ে হাতজোড় করে সকলের কাছে ক্ষমা চাও——সবাই মেনে নেবে তো ? তোমার নোংরামি স্বামীর কানে গেলে সে তোমাকে ক্ষমা করবে ভেবেছ ? তখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তুমি ? কে তোমাকে আশ্রয় দেবে——ওই গৌতম ? তাহলে গৌতমকে বিয়ে করলে না কেন ?

——নোংরামি ? নোংরামি আপনি কাকে বলছেন ? এটাই তো আজকে জীবনের স্ট্যাটাস। লজ্জায় অপমানে বীথি লাল হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আর যার কাছেই যাই না কেন আপনার কাছে নিশ্চয় আসব না। কথাগুলো বলেই ঝড়ের বেগে চলে গেল বীথি।

বীথি চলে গেল। আনন্দ ওর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে নিয়মমাফিক সম্পর্কে আমরা জীবনকে স্বাভাবিক বলে মনে করি। মনে হয় সব কিছু স্বাভাবিক। কখনো বা তার চেয়েও বেশি কিছু। কিন্তু এই সম্পর্কে যখন ফাটল ধরে তখনই যা কিছু বদলাতে শুরু করে। কিছুদিন পর সেটাই আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। মানুষ বিশ্বাস করে সে বোধহয় জীবন যুদ্ধে জীতে গেছে। কিন্তু সে যদি কখনো পিছনে ফিরে তাকায় তা হলে অনুভব করতে পারে যে কিছুই শেষ হয়ে যায়নি। গভীর সমুদ্রে ডুবে যাওয়া 'টাইটানিক' জাহাজের মতো সবকিছুই নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করছে। দাঁড়িয়ে আছে নিজেদের জায়গায়।

কুৎসা রটনার জোরালো কোনো প্রতিবাদ নেই বলে মিত্যাশ্রয়ী গল্প মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে মস্ত আকার ধারন করে। আতঙ্কটা এত বেশী যে গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে কেউ কারোর বাড়িতে যেতে ভরসা পায় না। যে বাড়িতে কোনো মহিলা নেই সে বাড়িতে অন্য কোনো মহিলার বেড়াতে আসাটা যেন খুবই গর্হিত কাজ ! সহজাত সংস্কার মধ্যবিত্ত জীবনকে সন্ত্রস্ত করে রাখে।

কোর্ট চত্বরের অভিজ্ঞতায় আনন্দ সাধারণ মানুষের জীবনের অনেক অদ্ভুত ঘটনাই দেখতে পায়। যা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হলেও সমাজের আপাত-মসৃণ জীবনকে বিচলিত করে তোলে। তাই বীথিকে এতদিন পর ওইভাবে দেখতে পেয়ে ওর পুরাতন সংস্কারভরা মন সাবধান করতে চেয়েছিল। বীথি আবার ওকে আগের মতোই ভুল বুঝল।

এক্সিকিউটিভ সার্ভিসে এসেছেন আনন্দ। জেলা আদালতের বিচারক হয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন। কর্মগুণে ধাপে ধাপে পদোন্নতি হয়ে এই পেশায় বহু মানুষ হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। আনন্দর স্বপ্ন একদিন এইভাবে উচ্চন্যায়ালয়ে যাবেন। জজিয়তী এখন তেষট্টি বছর পর্যন্ত বাঁধা। সুতরাং স্বপ্নটা একেবারে কাল্পনিক নয়। উচ্চন্যায়ালয়ে বসার সুযোগ পাওয়া কম সৌভাগ্যের নয়। অত্যন্ত সম্মানের এই পেশা। মোটা বেতন, মোটা অবসর ভাতা। সরকারের নেকনজরে পড়ে গেলে হতে পারেন কোনো ট্রাইবিউন্যালের চেয়ারম্যান। তখন সরকারি গাড়ি, বাড়ি, টেলিফোন, চাকর-বাকর আরো এলাহি ব্যাপার। সে বড় সুখের সময়, হয়তো সে সময় খুব কাছেই !

কাজে যোগদানের পর থেকেই প্রতিদিন কারো না কারো শুভেচ্ছা পান। একসময় মহকুমা আদালতে জজ হয়ে ঘুরেছেন। তাই আদালতের বহু মানুষ চেনে তাঁকে। প্রতিদিন পরিচিত কারো না কারোর সঙ্গে দেখা হয়। অসুস্থ দীপ্তিকাকু একদিন এসেছিলেন কোর্ট চত্বরে মহকুমা শাসকের অফিসে। ভোটার আই.ডি কার্ডের সমস্যার ব্যাপারে। দেখা হল, ওঁর সাথে। উনি তো অবাক ! ওনার দেখে দেওয়া চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন আনন্দ জানতেন, কিন্তু তিনি কি করছেন এখন জানতেন না। তিনি যে একেবারে বিচারপতি সেজে বসেছেন, কল্পনাও করেননি। তাই বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করে গেলেন।

আনন্দ ওঁকে কুন্তীর গল্পটা বললেন। বললেন, ওই মেয়েটি আমাকে নেতিবাচক হয়ে উৎসাহ দিয়েছিল। ওর জন্যই আমি তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এ মরার চাকরি আর করব না। একটা ভাল চাকরি আমাকে পেতেই হবে। প্রয়োজন হলে আরো আরো বেশি পড়াশুনা করবো, পরিশ্রম করব।

——আর তুই বিচারপতি সেজে বসলি ? বলে দীপ্তিকাকু হো হো করে হাসলেন।

——এটা বলতে পারেন একটা খেলা। এই খেলাটা থেকে আপনি যত মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবেন, তত আপনি এই খেলাটা ভালো করে খেলতে পারবেন।

——যাক বাবা ! তুই বিচারপতি হয়েছিস দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তুই আমার ছেলের মতো। আশীর্বাদ করি আরো বড় হ।

——আমি কি হতে চেয়েছিলাম, সেকথা থাক। কাকিমা কেমন আছেন বলুন ?

——না না না দেখ আনন্দ, তোর প্রবলেমটা কি জানিস ? তুই কিছুতেই পাল্টাস না। আরে বাবা পরিবর্তন, মানে চেঞ্জ——চেঞ্জ তো প্রগতির একটা প্রধান অঙ্গ।

দীপ্তিকাকু খুশী হয়ে আশীর্বাদ করলেন ওঁকে। জজ হয়েছেন শুনে এমনি দেখা করে অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়ে যান আনন্দকে।

ঠিক দশটায় কোর্টে হাজির হন আনন্দ। এটা বহু বছরের পুরনো অভ্যাস তাঁর। দেরি করে অফিসে আসা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। বিশেষ করে যাঁরা দায়িত্বসীল পদে থাকেন। তাঁদের এটা করা মোটেও উচিত নয় বলে মনে করেন। এটা ছুরি ছিনতাইয়ের মতো এক। ধরণের অপরাধ বলে মনে করেন। কোনো উচ্চপদাধিকারীর এটা করাই উচিত নয়।

কোর্ট প্রাঙ্গন প্রতিদিনই লোকে লোকারণ্য থাকে। উকিল মোক্তার মুহুরী ভেন্ডার পুলিশ সব মিলিয়ে কোর্ট যেন হট্টমেলার আসর। কাজ ফেলে রাখেন না বলে আনন্দর অফিসে কাজের চাপ বেশি। কোর্টে কত বছরের মামলা যে ঝুলছে তার কোনো সার্ভে হয় না। নইলে জানা যাবে হয়তো একশো বছরেরও পুরনো কোনো কোনো মামলা এজলাশে ওঠার অপেক্ষায় পড়ে আছে।

আনন্দ একদিন দেখেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন একজন মহিলা। নাম বীথি সেন। বয়স চল্লিশের মতো। নামটা কেমন যেন চেনা চেনা মনে হয়। স্মৃতির পাতা হাতড়ান, মনে পড়ে না কিছু। আসামীর মুখটা ভাল করে দেখবার চেষ্টা করেন। আদালত কক্ষে আলোর বড় অভাব। পুরনো দিনের উঁচু উঁচু ঘর। তার ওপর আশেপাশে অনেক বাড়ি ঘর হয়ে গেছে, বড় বড় গাছপালা আছে। ঘরে আলো কম আসে। টিউব লাইটগুলো ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে। আসামীর মুখ ভাল করে দেখা যায় না বিচারকের আসন থেকে।

মহিলা আবার কাপড়ে মুখ ঢেকে থাকেন সব সময়।

সাক্ষীদের জেরা পর্ব চলে। শুনে যান। হঠাৎই এক দিন আসামীর মুখের আবারণ সরে যায়। তখন ওঁর মুখটা দেখতে পান আনন্দ। স্বল্প আলোয় হঠাৎ ওই মুখ দেখে নিজের অজান্তেই চমকে উঠলেন। মাইগড ! এ তো বীথি !

মুখের বাঁদিকে ঠোঁটের ওপরে তিলটা——তেমনিই আছে।

বীথি আসামী ? আশ্চর্য !

প্রতিদিন রাতে পরের দিনের কোর্টের কজলিস্ট মানে মোকদ্দমার তালিকা দেখে রাখেন আনন্দ। কিন্তু আগের রাতে সেটা করতে পানেননি। গত সন্ধ্যায় জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে খাওয়া দাওয়া এমন কি পানীয়ের ব্যবস্থাও ছিল। আনন্দ পানীয় পছন্দ করেন না। তবু ফিরতে রাত হয়।

আসামী বীথি সেন রাজ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে খুন করেছে। মামলার সাক্ষী বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং কয়েকজন পুলিশ অফিসার। সরকারি পক্ষের উকিলের বক্তব্য শুনে সেদিনের মতো কেস মুলতুবী করে দেন আনন্দ।

বাড়ি ফিরে ঘর লাগোয়া বারান্দায় আনন্দ। বৃষ্টিহীন মেঘলা আকাশ একটা গুমোট ভাব। ঝড় বৃষ্টি হলে ভাল হয়। উৎকট গরম চলছে কদিন ধরে। প্রবল বর্ষণ, কান ফাটানো মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের ঝলক অনেকদিন দেখেন নি। ভাবলেন আজকে সেরকম হলে রাতটা বেশ অন্যরকম হয়।

আদালতের এজলাশ সংলগ্ন চেম্বারে বসে গুরুত্বপূর্ণ এই মামলাটার নোটস্ পড়েন আনন্দ। ওর আগের যিনি জজ ছিলেন তিনি কোনও কারণে এই মামলাটিকে চেপে রেখেছিলেন। খুন হয়েছেন রাজ্যের শাসক পার্টির এক নেতা। অবসর গ্রহণের আগে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ কেস কেউ হাতে নিতে চায় না। আনন্দ আসাতে এই মামলা ওর টেবিলে এসেছে। এই খুনের ঘটনার কথা অনেকদিন আগে আনন্দ কাগজে পড়েছিলেন।

পরের শুনানীর দিন থেকে দেখেন আসামী অনুপস্থিত। আশ্চর্য ! পর পর শুনানীর দিন যায়, আসামী হাজির হয়। বিরক্ত হয়ে আনন্দ একদিন পুলিশকে বলেন, আসামীকে ধরে আনুন। আসামীকে অ্যারেস্ট করে আনবার নির্দেশ দেন আনন্দ।

পুলিশ অফিসার ওর চেম্বারে দেখা করে বলেন, দোহাই ধর্মাবতার, মাফ

করবেন। আমরা বিপদে পড়ে যাব।

আনন্দ জানতে চান, কেন? আপনারা বিপদে পড়বেন কেন?

পুলিশ অফিসার বলেন, আসামী খোদ মন্ত্রীর আশ্রয়ে থাকে স্যার। সেখান থেকে ধরে আনব কী করে স্যার?

——তার মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি?

——ঠিকই বলছি স্যার। আসামী দিনের পর দিন মন্ত্রীর আশ্রয়ে আছেন। মন্ত্রীর বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে এনে, শেষে ছেলেপুলে পরিবার নিয়ে বিপদে পড়ব?

পুলিশ অফিসার আরো যা যা বললেন, তা শুনে ফাইল সরিয়ে রাখলেন আনন্দ। বুঝতে পারলেন মামলাটা এতদিন কেন পড়েছিল।

বীথির এতখানি অধঃপতন হয়েছে জেনে, ওর প্রতি একটা ঘৃণা আনন্দের মধ্যে জেগে উঠল। বীথি একটা মানুষকে খুন করে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে। দেশের আইন ব্যবস্থা এতই ঠুনকো হয়ে গেছে? তাঁর মন খচখচ করে। একদিন এক অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হতে আনন্দ তাঁর কাছে এই মামলার প্রসঙ্গ তুললেন। বুঝতে পারেন আইনমন্ত্রী ভালই জানেন, মামলাটা চাপা আছে। আনন্দ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খুন হওয়া বিধায়ক সতীশ নিয়োগী আইনমন্ত্রীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে চাপ দিলেন। ওষুধে কাজ হল। দেখা গেল, আসামী আবার যথাস্থানে হাজির হচ্ছে।

কাগজ ও মিডিয়াগুলো নতুন করে গালগল্প শুরু করল। বিধায়ক সতীশ নিয়োগীকে ঠকিয়ে বীথি নাকি তাঁর আখের গুছিয়ে নিচ্ছিল। এখন সতীশবাবু নেই, তাই সমবায়মন্ত্রী অহিভূষণের আশ্রয় নিয়েছে। সমবায়মন্ত্রী ওই দলেরই জুনিয়র বিধায়ক ছিলেন। সতীশ নিয়োগী তাঁকে পার্টিতে নিয়ে এসেছিলেন। বলতে গেলে সতীশবাবুই তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষা গুরু। কিন্তু বাম রাজনীতিতে কোটা রাজনীতির সুবাদে অল্প বয়সে অহিভূষণবাবু মন্ত্রী হয়ে যাওয়ায় রাজ্য রাজনীতিতে তিনি বেশি গুরুত্ব পেতে থাকেন।

বিধায়ক তথা পার্টির নেতা সতীশ নিয়োগীর সঙ্গে ঘোরাফেরা করবার সময় বীথি সবার নজরে পড়ে। নজরে পড়ে যায় সমবায়মন্ত্রী অহিভূষণেরও। একদিন নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিয়ে মন্ত্রী চলে যাবেন, মঞ্চের নিচে সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। বীথিও দাঁড়িয়েছিল একপাশে। গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভার অপেক্ষা করছিল। সিকিউরিটির লোকেরা সম্বর্দ্ধনার ফুলের তোড়াগুলো

নিয়ে গাড়িতে রাখছিল। মন্ত্রী গাড়িতে বসতে যাবেন। কী হল ! হঠাৎ মন্ত্রী ঘুরে দাঁড়িয়ে বীথিকে কাছে ডাকলেন, একপাশে ডেকে নিলেন। তার সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন। বললেন, 'তুমি' বলে সম্বোধন করছি বলে কিছু মনে কোর না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। রাজ্য কমিটির নতুন বাড়ি হয়েছে শুনেছ নিশ্চয় ? আমি চাই, ওই বাড়িতে থেকে তুমি পার্টির কাজ কর। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

বীথির হাতে নিমেষে আকাশের চাঁদ নেমে এল। মন্ত্রী তাকে যেচে অফার দিচ্ছেন। পার্টির রাজ্য কমিটির নেত্রী হয়ে সে কাজ করবে পার্টি কেন্দ্রথেকে। গদগদভাবে সে তক্ষুনি বলেদিল, পার্টির কাজ করা এ তো আমার চরম সৌভাগ্য স্যার। আপনি নিজে বলছেন, আমি নিশ্চয় করব।

বীথির কথা শুনে মন্ত্রীর কপাল মোলায়েম হয়ে উঠেছিল। তার চোখের তারা দুটো নৃত্য করতে শুরু করেছিল। বীথির মুখের ওপর চোখ রেখে তার ঠোঁটের কোনায় হাসি উপচে পড়তে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি গম্ভীর হয়ে সে হাসি চেপে রেখেছিলেন। তারপর গাড়িতে উঠে বসেছিলেন।

লোকে বলে অহিভূষণ ষাঁড়ের তুল্য মুক্তপুরুষ। আজ এর ক্ষেতে, কাল ওর ক্ষেতে মুখ দিয়ে বেড়ান। তার প্রথম স্ত্রী ওপরে চলে গেছে। কোনো সন্তান নেই। তাই দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় স্ত্রী-রও কোনো ছেলেপুলে হয়নি। বীজ বপন করার ক্ষমতা তার নেই এটা জেনে গেছে সকলে। অহিভূষণের সাহসও বেড়েছে তাতে। আঘাটা কুঘাটায় ঘুরে বেড়ান নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে। বীথিকে যেদিন প্রথম দেখেছেন, তাঁর মনে হয়েছে বীথি হচ্ছে তার স্বপ্নের নারী। যার দেখা এতদিন পান নি। ছিলছিলে চেহারা, পিচ্ছিল গা এমন নারী শরীর যদি দুহাতে চটকাতে নাই পারলেন, জীবনে করলেন কী ?

তাহলে তার কিসের পুরুষ জীবন ? নিজেকে সেদিন ধিক্কার দিয়েছিলেন এই বলে যে এই বস্তুটি এতদিন কেন তার চোখে পড়ে নি ? মনে মনে সেই দিনই শপথ নিয়েছিলেন মাছটাকে জালে তিনি তুলবেনই।

বাড়িতে দিনরাত লোকজনের যাতায়াত। মন্ত্রী বলে কথা। কাউকে তো আসতে মানা করা যায় না। স্ত্রী চুপচাপ বসে থাকেন গা ভরতি গয়না পরে। খেয়ে দেয়ে তিনি এমন মুটিয়েছেন যে দুজন আয়া রাখতে হয়েছে সর্বক্ষণের জন্য। তারা তাকে ওঠাতে হলে বসাতে হলে সাহায্য করে দু-দিক থেকে তুলে ধরে। হাঁটতে হলে আয়ারা পিছন থেকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায় তাঁকে। বাড়িতে

কাজের লোকেদের পোয়াবারো। তারা নিজেদের মতো লুটেপুটে খাচ্ছে। যা খুশি তাই করছে। দেখবার কেউ নেই। তিনি মন্ত্রী দিনরাত দেশের কল্যাণ, দশের কল্যাণ করে বেড়াচ্ছেন। আর তাঁর বাড়িতেই কিনা....। কথায় বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

নিপুন হাতে ছিপ ফেললেন অহিভূষণ। লটকে গেল বীথি। লটকাতেই হল। এ ছিপে যে কেউ লটকে যাবে এ চারের এমনই মহিমা। বীথি ভাল মাছ। ভাল মাছ তুলতে গেলে খেলিয়ে খেলিয়ে তুলতে হয়। খেপ বা সট করে টান মারলে চলে না। কিন্তু খেলাতে গিয়েই বিপদটা হয়ে গেল। জলটা ঘুলিয়ে গেল। এখন মাছকে ডাঙ্গায় তোলা কঠিন হয়ে গেল।

গতকাল বিকেলে ঝড় উঠেছিল। বৃষ্টি নেমেছিল তারপর। ছাদে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভিজেছেন আনন্দ। বর্ষণে চারদিক অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শরীর খারাপের ভয় ছিল, তবু ভিজতে ভাল লাগছিল তাঁর। কাল বিকেলটা ছিল অন্যরকম।

বীথির জীবনটা ভেঙ্গে গিয়েছে। দুমড়ে মুচড়ে গেছে। কী বাড়ির মেয়ে, এখন কী অবস্থা ! বীথির আশ্রয় জেল হাজত। হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছিল ওর উকিল। সে আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে। সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে তাকে থাকতে হয়, খেতে হয়, শুতে হয়। বিরাট বড়লোকের আদুরে মেয়ে ছিল বীথি তার কিনা এই অবস্থা ! ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছে শহরের সব চাইতে নামী স্কুলে। নাচ শিখেছে, গান শিখেছে। পুরুষানুক্রমে ওদের লোহার ব্যবসা। রডের দোকান ছিল। কাকা জ্যাঠারা ভাগ হয়ে যেতেই ওদের ব্যবস্থা পড়তে শুরু করেছিল। শেষে গণেশ ওল্টাতে সব শেষ। দেশে বিশাল আমের বাগান ছিল। ওর ঠাকুরদা বেঁচে থাকতেই সেটা বিক্রি হয়ে যায়। ওদের বাড়িতে কাজেরই লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ জন। তারা ধীরে ধীরে কমে গেল। বাড়ির পোষা কুকুর না খেতে পেয়ে অসুস্থ হয়ে মরে গেল। লক্কা, নোটন, পাখোরাজ সব পায়রাগুলোর জায়গা নিল যত গোলা-পায়রার দল।



কারোর পৌষমাস হলে, কারোর সর্বনাশ হয়। বীথিদের সেই সর্বনাশের যুগে চাল ব্ল্যাক করা উঠতি বড়লোকগুলো হ্যা হ্যা করতে করতে বড়লোক হয়ে গেল। তারা ওদের বাড়ি ঘর জমি জমা পুকুর বাগান সব কিনে নিয়ে উল্লাসে মত্ত

হল। বীথির বাবাকে উদ্দেশ্য করে ওরা বলতো, শালা মল্লিকের পো, বাপ ঠাকুরদার জমিয়ে যাওয়া ধন পেয়ে সাপের পাঁচ পা দেখেছিলে। এবারে দেখ কত ধানে কত চাল। হঠাৎ বড়লোক হলে বোধহয় সব বড়লোকেরই এই দশা হয়। ধরা কে সরা জ্ঞান করে। অর্থ বলে ধনী হয়, বিদ্যে বুদ্ধিতে পারে না। কিন্তু শয়তানীতে মাৎ করে দেয়।

সেই বীথি আজ কোথায় থেকে কোথায় এসে পৌঁছিয়েছে।

অহিভূষণের চোখের সামনে ভাসে ধোঁয়া ধোঁয়া পার্টি অফিস। তিনি পার্টি অফিসের সর্বময় কর্তা হয়ে বসে আছেন। প্রতিটি নির্বাচনের আগে বিশাল বিশাল জমায়েত হয়। বিশাল বিশাল লাইন দিয়ে রোদে জলে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে মানুষ ভোট দেয় বামপন্থীদের। কোথাও কোনো ঝামেলা নেই। নীরবে ভোট বিপ্লব সমাধা হয়। এইভাবে একটানা তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ গোটা দেশে অনন্য নজীর স্থাপন করেছে, গনতন্ত্রের কেন্দ্রভূমি পশ্চিমবঙ্গ। যার রাজধানী ক্যালকাটা নয়, কলকাতা। সারা পৃথিবীতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, বামপন্থীরা ক্ষমতা ধরে রেখেছে একটানা। বন্দুকের নলের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কোনো রক্তাক্ত বিপ্লব নয়, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল। ক্ষমতার আসল উৎস জনগণ। এখানে ক্ষমতার ভিত্তি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, কৃষির উন্নয়ণ। তাই সরকার এখানে এখন শিল্প করতে চায়।

শুকনো চটচটে ঠোঁটটা বার কয়েক জিভ দিয়ে চেটে নেন অহিভূষণ। বুকের ভেতর থেকে স্বপ্নটা উঠে আসে সরসর করে। দাশুর বউটা বড্ড নরম। আহ্লাদি আহ্লাদি বায়না ধরে কেবল। ওকে আর ভাল লাগেনা। নিজেকে বড্ড খেলো মনে হয়। গোবিন্দপুরের সুবাসী তেমনি দেখা হলেই সবার সামনে গা ঘেঁষে কোমর জড়িয়ে ধরবে। আর ঝগড়া করবে। বলবে, এতদিন আসো নি কেন ? তিনি যেন ওর কত দিনের..... ? সুবাসীটা বড্ড বিচ্ছু। মন্ত্রী হয়েছেন তিনি এখন। যেখানে সেখানে তার কোমর জড়িয়ে ধরা উচিত ? ঝগড়া করে কি যে সুখ পায় ও !

ওদিকে বুড়ো সতীশ খুব মধু খাচ্ছে। আজকাল পার্টির কাজে দূরে কোথা গেলেও পারতপক্ষে রাত্রিবাস করে না। রাত হলেও ফিরে আসে। অহিভূষণ ভেবে পায় না, মেয়েদের ভিতরে কি এমন শক্তি আছে যে এমন পুরুষকে বেঁধে ফেলে খুঁটির মতো। তিনিং তো কত খারাপ পথ বেয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তিনিও কখন যে নিঃশব্দে এই খুঁটিতে বাঁধা পড়ে গেছেন নিজেই বুঝতে পারেননি। এই জন্যই বোধহয় শাস্ত্রে বলে, 'স্ত্রীয়াশ্ চরিত্রম দেবা ন

জানন্তি, কুতঃ মনুষ্যা'।

রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন আসছে। সতীশ নিয়োগীর কনস্টিটিউশন পিঞ্জরাপোল খুব বড় এলাকা নিয়ে। সতীশবাবুকে প্রতিদিন দুটো তিনটে করে মিটিং করতে হয়। যদিও এই অঞ্চলের ভোটে তিনি এবং তাঁর দল যে জিতবেন এ ব্যাপারে বিরোধী পক্ষেরও কোনো সন্দেহ নেই। সবাই জানেন লোকবল এবং অর্থবলে সতীশ নিয়োগী এই অঞ্চলের মুকুটহীন সম্রাট। সতীশবাবু এত নামকরা এম এল এ।

বিধানসভার নির্বাচন শেষ হবার পর প্রতিবারই তাঁর নাম আসন্ন মন্ত্রী তালিকার একেবারে শীর্ষে থাকে। এ পর্যন্ত তিনি চারবার একটানা বিধানসভায় এই আসন থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন। এবার জিতে রেকর্ড সৃষ্টি করবেন। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তিনি মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হন না, এটা একটা রহস্য। বামফ্রন্ট সরকারের বিধানসভায় মন্ত্রীপদে তাঁর আসন যে পাকা এ নিয়ে সংবাদপত্র এবং মিডিয়াগুলো দিনরাত আলোচনা চালাচ্ছে। সম্ভাব্য দপ্তর সম্পর্কেও তারা পূর্বাভাষ দিচ্ছে। সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছে সমবায় দপ্তর।

বীথি তাঁর চব্বিশ ঘণ্টার সহচরী। বীথি এখন পুরোপুরি সতীশবাবুর দেখাশোনা করে। পুরনো পার্টি অফিস সতীশবাবুর ঘরবাড়ি। সেখানে বীথির যাতায়াত ও স্থিতি বেড়েছে। সতী.শবাবুর শরীর খারাপ হলে বীথি সেখানে রাতেও থেকে যায়। কবে কখন কোথায় সতীশবাবুর জনসভা আছে, সেখানে কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য রাখতে হবে। বীথি এখন কম্পিউটারে তুলে রাখে। প্রয়োজন মতো প্রিন্ট আউট বের করে দেয়। কথা চলছে তাকে এবার একটা ল্যাপটপ্ কিনে দেওয়া হবে।

বীথির আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া দেখে বীথির স্বামী দু-চারবার ওর কাছাকাছি হবার চেষ্টা করেছিল। বীথির হৃদয় তাতে গলে না। পুরনো পার্টি অফিসের চৌহদ্দির মধ্যে এইরকম একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে ঘুরে বেড়াতে দেখে পার্টি অফিসের ছেলেরা তাকে কড়া করে কড়কে দেয়। বীথির স্বামী পালাবার পথ পায় না। পার্টির মাস্তানদের ভয়ে বীথির বিয়ে করা স্বামী আর বীথির দখল নেওয়ার চেষ্টা করে না। বরাবরের জন্য, সে কেটে পড়ে। তবে তার অভিমান হয়েছে। তার খুব সখ হয়েছিল একটা মোটর সাইকেল চাপার। বীথি সেটা অনায়াসে মেটাতে পারতো। বীথির ওপর রাগ মেটাতে সে নাকি আবার বিয়ে করতে চায়, তাই আর একজন শাঁসালো শ্বশুর খোঁজা শুরু করেছে।

বীথি পাকাপাকিভাবে সতীশবাবুর ডেরায় অর্থাৎ পুরনো পার্টি অফিসে বাস

করতে শুরু করে। নাটক জমল যেদিন নির্বাচনের ফলাফল বের হল সেদিন রাতে। সতীশবাবু বীথিকে চিনলেন নতুন রূপে। রাত্রে অহিভূষণ পার্টির ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করেছেন। বিজয় মিছিল শেষে স্নান-টান সেরে চুলে শ্যাম্পু করেছিল বীথি। চুলে শ্যাম্পু করলে এই বয়সেও বীথির চেহারার ধার অনেকখানি বেড়ে যায়। একটা ছাপা শাড়ি পড়ে সে আয়নার সামনে চুলের জট খুলছিল।

সতীশ অপলক নয়নে চেয়ে দেখছেন আয়নার বীথিকে। হঠাৎ সতীশবাবুর চোখে চোখ পড়ে যায় বীথির। কপট রাগ দেখিয়ে সে তার আশ্চর্য চোখ দুটি নিয়ে তাকায় প্রৌঢ় সতীশের দিকে। বীথির ওই দাঁড়াবার ঢঙ দেখে তো সতীশের হয়ে গেল। চোখের পলক ফেলতেও ভুলে যান। এক সময় দু-চোখ কপালে তুলে বলেন, বাপরে বাপ! কী সেজেছ তুমি?

বীথি কপট রাগ দেখায়। বলে, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

সতীশ বলেন, তোমাকে দেখে সাথে কি অহিভূষণের বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন?

শুনে ক্ষেপে ওঠে বীথি। চিরুনী রেখে দিয়ে বলে, ওরকম বললে আমি কিন্তু একদম যাব না, বলে দিচ্ছি।

——যাবে যাবে।

সতীশ ইয়ার্কির মাত্রাটা আর একটু চড়িয়ে দেন। বলেন, আরে তুমি না গেলে হয়? অহি এতক্ষণ সেজেগুজে চাতক পাখির মতো বসে আছে। আর তুমি যাবে না বলছ? তুমি না গেলে ওর হার্টফেল হবার দশা হবে। তখন আবার আমাকেই দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। আমার এই বুড়ো বয়সে তুমি কি তাই চাও?

——আপনি থামবেন? আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে বীথি।

সতীশ থতমত খান। দেখেন বীথির চোখের ভাষা বদলে গেছে। তিনি তখন বীথির সামনে এগিয়ে এসে তার অভিমান ভাঙ্গান। বলেন, রাগ হল বুঝি?

——জানি না যান। বলে একপাশে সরে যায় বীথি।

বীথির এই সরে যাওয়ার ভঙ্গি দেখেই সতীশের বুক জুড়িয়ে যায়। একটা অভিমানের পাথর তার বুকের মধ্যে জমাট বেঁধেছিল কিছুদিন ধরে। মুহূর্তে সেটা গলে জল হয়ে যায়।

নির্বাচনপর্ব শেষ হয়েছে। কয়েকদিন পর মন্ত্রীসভা শপথ নেবে। বীথির এখন মহাসুখ। অহিভূষণও মন্ত্রী হচ্ছে, সতীশ নিয়োগীও মন্ত্রী হচ্ছেন। শুধু কে কোন দপ্তর পাবে তাই নিয়ে ট্যাগ অফ ওয়ার চলছে। দু-মাসের একটানা পরিশ্রমে শারীরিক ধকল গেছে খুব। কিছুটা অবসাদে বীথি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল। পায়জামা পাঞ্জাবী পড়নে সতীশ সেই ঘরে স্বল্প মদ্যপান করছিলেন। সম্প্রতি কলকাতার একলব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক তাঁকে নিয়মিত 'রেড ওয়াইন' স্বল্প পরিমানে পান করবার উপদেশ দিয়েছেন। এতে নাকি তাঁর হৃদয়-মন, সুস্থ, প্রফুল্ল এবং সবল থাকবে। তিনি আরো কর্মক্ষণ হবেন। যখন তখন তাঁর হার্টের ব্রেক ডাউন হবার চান্স থাকবে না।

সতীশ চিকিৎসকের পরামর্শ শিরোধার্য করেছেন। প্রতি রাত্রে ঘুমোবার আগে স্বল্প পরিমানে তিনি নিয়মিত পান করে থাকেন।

তাঁর একান্ত অনুগত অহিভূষণ বীথিকে রাজ্য পার্টি অফিসে নিয়ে যেতে চেয়েছে। বীথির ইচ্ছা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সতীশ। বীথি নিজে জানে সে তাঁর চোখের আড়াল হয়ে যাবে এ তাঁর না পসন্দ। বীথি তাঁর বুকের মধ্যে একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। ওকে আচমকা নতুন করে চিনতে পেরেছেন তিনি। বুকের পাশটায় অল্প ছ্যাঁকা লেগেছিল যেদিন ওকে প্রথম দেখেছিলেন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে একটা দুর্বলতা গ্রাস করেছে সতীশকে। এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার সময় হয়েছে বলে তিনি মনে করছেন।

রাজ্য কমিটিতে মন্ত্রীর প্রভাব বেশি। অবশ্য সতীশও এবার মন্ত্রী হবার তালিকায় রয়েছেন। তাছাড়া সিনিয়র লিডার তিনি। তবে বীথির সঙ্গে একবার আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। বীথির কাছে কথাটা কিভাবে তুলবেন সতীশ তাই ভাবছিলেন। সাথে সাথে চলছিল মদ্যপান।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হল দুজন যুবক।

ঘোলাটে চোখে সতীশ দেখলেন তাঁর সামনে দুজন যুবক দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে লম্বা একটা কানপুরী চাকু। যুবক বাঁটটা টিপতেই তার থেকে বের হয়ে এল প্রায় এক হাত লম্বা চাকুর ফলা। পোড় খাওয়া বীথি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। যুবকের মুখোমুখি হয়ে জানতে চাইল, কী ব্যাপার ? কে তোমরা ? এখানে কেন এসেছ ?

——আমরা ভ্রমরা। তোমার মধুপান করতে এসেছি গো।

——ভদ্রভাবে কথা বল। তোমরা কে ?

—তোমার যম। বলে বীথিকে তারা টানতে টানতে ঘরের এককোণে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে এল। তাকে বিছানায় পেড়ে ফেলল।

মাতাল সতীশ বেসামাল হয়ে খাটের নিচে আশ্রয় নিতে চাইছিলেন। দেহরক্ষীরা বাড়ি চলে গেছে। তার হাতের কাছে তার একান্ত প্রিয় রিভলবারটাও নেই। যুবকের চাকুর ফলা তার ঘাড়ের পিছন দিয়ে গলায় নেমে এল। বিছানা রক্তে ভেসে গেল। ভেজা বিছানার রক্ত ছুটল মেঝের ওপর দিয়ে। বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়লেন সতীশ। ছুরির ফলা তার ঘাড়ে গাঁথা রইল। সেই মুহূর্তে বাইরের রাস্তায় পুলিশের গাড়ি থামার আওয়াজ পাওয়া গেল। যুবকের দল দ্রুত গা ঢাকা দিল।

পুলিশ ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখতে পেল সতীশ পড়ে আছেন বিছানায়। তাঁর মাথা বীথির কোলে। বীথি ধরে আছে সেই রক্তমাখা ছুরি, যে ছুরিতে প্রাণগেছে মন্ত্রী হব হব বিধায়ক সতীশ নিয়োগীর। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করতে পাঠিয়ে দিল আর বীথিকে নিয়ে এল থানায়।

খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ, মিছিল, বন্ধ পালিত হল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে একের পর এক বন্ধ ডাকতে লাগল। কোনো দল বলে বারো ঘণ্টা কোনো দল বলে চব্বিশ ঘণ্টা। কেউ বলে আটচল্লিশ, প্রধান বিরোধী নেত্রী বলেন লাগাতার। বাংলা অচল করে দাও। সে বন্ধ কোথাও সফল হল, কোথাও হল না। মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট, রাজ্যপালকে ডেপুটেশন, গোটা রাজ্য সরগরম হতে লাগল। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতেও রাজধানী কলকাতা ঠাণ্ডা হয় না। বয়কট আর ধর্মঘট চলল। বুদ্ধিজীবী সমাজ ভেঙ্গে যায় দুভাবে 'সুশীল' 'দুঃশীল'। কেউ বলে 'আমরা' 'ওরা'।

বীথির বক্তব্য সতীশবাবুর পার্টির লোকেরাই তাঁকে খুন করেছে।

পুলিশ অফিসার অবাক! তিনি বলেন, তা কি করে হয়? পার্টি অফিস থেকেই থানায় খবর দেওয়া হয়েছে যে আপনি সতীশবাবুর ওপর চড়াও হয়েছেন। ইদানীং আপনাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি চলছিল এবং তা প্রকাশ্যে এসেছিল। অহিবাবু এজন্য আপনাকে সতর্ক করেছিলেন। আপনাকে পার্টি অফিস থেকে চলে যেতে বলা হয়েছিল। আপনি যেতে চাইছিলেন না।

বীথি বুঝতে পারে না যে সে ফাঁদে পড়ল, না রাজনৈতিক প্যাঁচের গাড্ডায় পড়ে গেল।

ইদানীং সতীশ তাঁকে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্যানডিডেট করবেন বলে ভাবছিলেন। তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, রাজনৈতিক বইপত্র পড়ার। বীথি সুন্দরী, লেখাপড়া জানে। বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। কোনো পিছু টান নেই। ভাল বক্তৃতা করতে পারে। সংগঠনের কাজে এরকম মেয়ে খুব প্রয়োজন। কিন্তু রাজ্য পার্টি অফিসের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব অহিভূষণ বীথির সঙ্গে সতীশবাবুর এই মাখামাখি পছন্দ করছিলেন না।

খুনের দায়ে ফাঁসী না যাবজ্জীবন ? কী হবে ? এই নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে সর্বত্র।

প্রতিদিন খবরের কাগজ ও মিডিয়া এই মামলা নিয়ে নানাধরণের মুখোরোচক গল্প পরিবেশন করে, আলোচনা চালায়। অবসরপ্রাপ্ত আইনজীবী বিচারকদের নিয়ে এসে তারা আলোচনা চালায়। "ফোন ইন" অনুষ্ঠান করে। দর্শকরাও নানা ধরণের প্রশ্ন করে। আনন্দও মাঝে মাঝে তার কিছু দেখেন, শোনেন।

সাধারণ মানুষ এসব নিয়ে ট্রেনে বাসে তুমুল আলোচনা করে। টিভি চ্যানেলগুলির টিআরপি বেড়ে গেছে এই ক-মাসে বহুগুণ। খবরের কাগজের কাটতিও বেড়েছে সেইসঙ্গে। কয়েকটা জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল তাদের পুলিশ ডায়েরী অনুষ্ঠানে এই মামলার চিত্ররূপ কাহিনী দেখাতে শুরু করেছে।

বীথির সেই এক কথা।

সতীশবাবুকে হত্যা করেছে তার নিজের পার্টির লোক। চেহারার বর্ণনা যেমন দিয়েছে বীথি, তাদের তেমন দু-চার জনকে অ্যারেস্ট করে আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড করিয়েছে পুলিশ। দুজনকে সনাক্ত করেছে বীথি। ছেলে দুটির অতীত ভাল নয়। পুলিশের খাতায় খুন-খারাপির রেকর্ড আছে। আনন্দ দিনের পর দিন সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনে যান। প্রতিদিন সাক্ষীদের সাক্ষ্যে নতুন নতুন তথ্য উন্মোচিত হয় আর মিডিয়া খবরের কাগজগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ময়না তদন্তে, শুলুক সন্ধানে।

বৃষ্টির জমে থাকা জলে চড়ুই কাকেরা স্নান করে। কোথাও সেতার বাজে। বাজনাটা খুব পরিচিত মনে হয় আনন্দের। এই সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে। কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করেন। কিছুতেই মনে পড়ে না। গানের সুর তাঁর মনের সেতারে সুর তোলে, হৃদয়ের ভেতরের তারে বাজে রিনিঠিনি সেই সুর। গানের কথাগুলো মনে না পড়ায় অস্বস্তিকর কষ্টবোধ হয়। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে

যায়, চোখে অন্ধকার নামে।

ডাক্তারবাবু বলেন, আপনাকে একটু শুতে হবে। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে শুয়ে পড়েন আনন্দ। ডাক্তারের চেম্বারে হাল্কা গদীর ছোট্ট শোয়ার জায়গা। ধরাচূড়ো খুলে শুতে হয়। ডাক্তারবাবু খুব নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করেন তার সারা শরীর। জানতে চান, কী মনে হয় আপনার ? বুকের কোন জায়গায় ব্যথা ?

আনন্দ বলে, কী আবার মনে হবে ! গতকাল শেষ রাতে একটা স্বপ্ন দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। ঘুম ভাঙলে মশারীর মধ্যে মনে হল, আমি যেন একটা বরফের পিন্ডের মধ্যে শুয়ে আছি। বাতাসহীন, দমবন্ধ করা আবদ্ধতার মধ্যে আটকে আছি এই আর কি ! আর কিছু নয়।

ডাক্তারবাবু বললেন, আমি ডাক্তার না আপনি ডাক্তার ?

ব্লাড ইউরিন টেস্ট, ইসিজি ইত্যাদি করবার জন্য লিখে দেন ডাক্তারবাবু। নিয়ম করে সেগুলো করাতেও হয়। রিপোর্টগুলো ডাক্তারবাবু দেখেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বলেন, রক্ত চাপ সামান্য ওপরে। তেমন কিছু নয়। তবে ইসিজী রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে একটা ডিপ্রেশনে ভুগছেন। কয়েকদিন কোথাও ঘুরে আসুন, কেটে যাবে। কাউকে সঙ্গে নেবেন, একা যাবেন না। আপাতত আমি দুটো ওষুধ লিখে দিলাম। একটা ভিটামিন ট্যাবলেট আর একটা ডিপ্রেশনের জন্য। এছাড়া সকাল সন্ধ্যায় একটু হাঁটাহাঁটি করুন। সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার এটা। চিন্তার কিচ্ছু নেই। দু-দিনেই কেটে যাবে।

মামলার নথিপত্র বারবার পড়েন আনন্দ। সাক্ষীদের সাক্ষ্য, পুলিশ রিপোর্ট, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সব বিশ্লেষণ করে তাঁর ধারণা হল বিধায়ক সতীশ নিয়োগী খুন হয়েছেন রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু বীথি খুন করে নি। খুনিদের নাম অনিবার্যকারণবশতঃ পুলিশ আদালতকে দেয় নি। হতে পারে এটা ইচ্ছাকৃত ভুল, অথবা প্রকৃত ভুল। সেটা কিন্তু স্পষ্ট নয়।

এই মামলার কাজ করতে বসলেই আনন্দর গলা শুকিয়ে যায়। জল খেতে হয় ওঁকে বারবার। সিগারেট ধরান। ধূমপান ছেড়ে দেবেন ভেবেছিলেন। ছাড়া তো হয় না, উল্টে তা বেড়ে যায়। বাঁ উরুর মাংস চমকে চমকে ওঠে। কী আদালত কক্ষে, কী বাড়িতে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে একটা ভয়। বুকের ভেতরটা থেকে থেকে ধড়াস ধড়াস করে। রক্তচাপ বেড়ে যায়। সহকর্মী প্রিয়জনেরা দেখা হলেই জানতে চায়, কী ব্যাপার, শরীর খারাপ না কি ?

বেশি কিছু বলেন না। এ অবস্থায় পরিচিত জনের সহানুভূতি প্রদর্শনের

কথাবার্তা অনেক সময় বিষণ্ণতা বাড়িয়ে দেয়। আর বাইশ মাস পর তিনি অবসর নেবেন। রাজনৈতিক এই মামলার ফলাফল রাজ্যে কোনো অশান্তির ঝড় বয়ে নিয়ে আসবে কিনা বুঝতে পারেন না। তবে বুঝতে পারেন তাঁর অবসর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠতে পারে। এমন আশঙ্কা আছে। বুকের মধ্যে মড়মড়িয়ে ডাল ভাঙ্গার শব্দ শোনেন। সারা অঙ্গ কখনো কখনো অসার মনে হয়। ভর দুপুরে আদালতের ঘরে হু হু করে হাওয়া ঢোকে। হাজার হাজার কু-গায় মনটা। আদালতের ঘরটাকে মাঝে মাঝে অভিশপ্ত বলে মনে হয়। মনে হয় এ পর্যন্ত যদের শাস্তি হয়েছে তাদের অতৃপ্ত অশরীরী আত্মাগুলো যেন এখানে ঘুরে বেড়ায়। বাতাস ভারী করে। একা থাকলেই তারা যেন তাঁর ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলে।

আইনে খুব স্পষ্টভাবেই বলা আছে। দোষীর উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে শাস্তি দেওয়া যায় না। একদিন, দুদিন, তিনদিন গুম হয়ে সবকিছু ভাবেন আনন্দ। মামলার রায় দিলেন তারপর।

আসামী খুন করেনি। খুন হতে সাহায্য তো নয়ই, খুনের পরিকল্পনার ধারে কাছে তার অবস্থান ছিল না। যেহেতু পুলিশ চার্জশীটে খুনের আসামী হিসাবে একমাত্র বীথি সেনের নাম দিয়েছিল আর কোনো নাম সেখানে ছিল না। তাই আসামীকে খালাস করে দিলেন। পুলিশকে নির্দেশ দিলেন প্রয়োজনবোধ করলে তারা মামলা আবার নতুন করে সাজিয়ে আদালতে পেশ করতে পারে।

আদালত কক্ষ নিস্তব্ধ। একটা পালক ফেললেও বুঝি শব্দ হয়। রায় দান পর্ব শেষ করে নিজের চেম্বারে এসে বসেন আনন্দ। আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বোজেন। সেই বীথির সঙ্গে দেখা এত বছর পর। যাকে জীবনের প্রথম প্রেম নিঃস্বার্থভাবে দিতে চেয়েছিলেন। বীথি সেদিন তার কোনও মর্যাদা দেয় নি। জীবনের একটা ভুলকে আঁকড়ে ধরে বাকী জীবনটা নিজের সঙ্গে শুধু জুয়াই খেলে গেছে। সেদিন ওকে ক্ষমা করতে পারেন নি। হয়তো ঘৃণাই করেছিলেন। কিন্তু আজ ? আজও কি সেই ঘৃণা ওকে করতে পারছেন ?

হাতে সিগারেট ধরানো ছিল, সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে যে কখন অঅঙুলের কাছাকাছি চলে এসেছে টের পান নি। হঠাৎ আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই 'উঃ' বলে চমকে উঠলেন। সিগারেটের টুকরো পড়ে গেল মেঝেতে। কার্পেট থেকে সাবধানে সিগারেটের টুকরো তুলে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। চোখের পাতা ভিজে গিয়েছিল খেয়াল করেননি। টাউনহলের বাগান থেকে অফিসঘরের

জানলা দিয়ে মিষ্টি হাসনুহানার গন্ধের সঙ্গে ভেসে আসে ঢোল আর খঞ্জনীর মিশ্র সংস্কৃতি। মাইকে ভেসে আসে বিহারীদের হোলীর গান। প্রায় একমাস ধরে বিহারীরা হোলী খেলে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওরা ঢোল খঞ্জনী গান করতে বসে।

"হোলী খেলে রঘুবীরা অবোধ মে।
কেকরে হাথে কনক পিচকারী কেকরে হাথে আবীরা
রামজী কে হাথে কনক পিচকারী সীতা হাথে আবীরা।
হোলী খেলে রঘুবীরা অবোধ মে, হোলী খেলে রঘুবীরা অবোধ মে ॥
হোলী খেলে নন্দলালা ব্রজ মে
হোলী খেলে নন্দলালা ব্রজ মে।
কেকরে হাথে কনক পিচকারী কেকরে হাথে আবীরা।
ব্রজ মে হোলী খেলে নন্দলালা ব্রজ মে হোলী খেলে নন্দলালা ॥"

ভাষাটা ভাল বোঝেননা, বাঁকে বিহারীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আনন্দ। বাঁকে বিহারী তাঁর খাস আর্দালী। ও বুঝিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, আমাদের দেশে নতুন জামা কাপড় পড়ে হোলী খেলতে হয়। হোলী দোল উৎসব, 'বসন্তউৎসব' ফাগের রঙে প্রিয়জনকে রাঙিয়ে দেওয়ার উৎসব।

মনের রঙের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ফাগের মধ্যে। তাই 'আজ হোলী খেলব শ্যাম তোমার সনে' গান বাঁধে বাংলার কবি বাউল। বসন্তউৎসব আসছে। মলয় নেই, আলোক নেই, শ্যামলেন্দু কালোমাটির দেশে। বিকাশ কোথায় জানেননা....রবিদা? ট্রান্সপোর্ট ব্যবসার ব্যস্ত কারবারী এখন কড়া কড়া ট্রাঙ্কুইলাইজার খেয়ে পড়ে থাকেন। দিন রাতের ঘুম তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। বৃষ্টি হলেই আকাশের নিচে গিয়ে দাঁড়ায় আর ভিজতে ভিজতে চিৎকার করে বলে, আজ আকাশ আমায় বলল। কাল বাতাস আমায় বলবে। তোমাদের শোনাব সে কথা, তোমাদের শুনতে হবে। হা হা হা করে হাসতে থাকে।

কিন্তু কি বলবে, আর আকাশই বা কি বলেছে, সেটা মনে করতে পারেন না। কিছুক্ষণ পর পর হা হা করে হেসে ওঠেন। পাগলামির লক্ষণ। ওদের বংশে এরকম নাকি আছে। একজন করে পাগল হয়ে যায়। অসীমা? সেও হারিয়ে গেছে জনারণ্যে।

আনন্দ আজ সম্পূর্ণ এ..কা, এই শহরের ব্যস্ত বিচারপতি। পুরনো ট্রেজারী বিল্ডিংটা ভাঙা হয়েছে, ওর সাথে ভেঙ্গে গেছে এই শহরের বহু ইতিহাস, বহু স্মৃতি। লরীতে রাবিশগুলো নিয়ে চলে গিয়েছে। জায়গাটা এখন খালি। বাকি

যেটুকু বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেটাও এমনি একদিন উধাও হবে। তারপর বোঝাই যাবে না এখানে একটা বিশাল বাড়ি ছিল, যে বাড়িটা এই শহরের ইতিবৃত্ত বুকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো। যেখানে একদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর কারো প্রবেশের অধিকার ছিল না। শহর বাসীকে সচেতন করে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্টা বাজত ঢং ঢং করে। রাইফেলধারী পুলিশ পাহাড়ায় থাকতো চব্বিশ ঘণ্টা। সন্ধ্যার পর কেউ যদি ভুল করে ঢুকে পড়ত, সীমানার মধ্যে এলেই প্রহরীর গর্জন শোনা যেত—'হল্ট'। আগন্তুক আর এগোতে চাইলে, প্রহরী পজিশন নিত। হাঁক পাড়ত—'হল্ট, ঔর এক কদম বাড়ায়গা তো গোলি মার দিয়া যায়েগা'। এরপর আগন্তুকের আর এগোনোর সাহস হতো না। সামনে সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে। পা বাড়ালে গোলি খেতে হতে পারে। সুতরাং....। এরপরও যদি কেউ মাস্তানী করতে চাইতো, তাহলে লাস্ট এন্ড ফাইনাল সতর্কতা জানাতো প্রহরী। জানতে চাইতো, আজ কা পাসওয়ার্ড ক্যায়া হ্যায় ? পাসওয়ার্ড বলতে না পারলে, আর এগোবার চেষ্টা করলে অবধারিত গুলি খেতে হবে তাকে। ব্রিটিশ শাসনের বর্দ্ধমান শহর, যে শহরের মাটিতে শুয়ে আছে শের আফগান, কুতুবুদ্দিন। যে শহরের বেগম সুদূর দিল্লীর তখত তাউসকে সমৃদ্ধ করেছে একদিন তার জ্ঞান এবং বুদ্ধি দিয়ে। সেই শহরের দ্বারপ্রান্তে আজ বসন্ত এসেছে।

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, কিন্তু শান্তিনিকেতন...... যাওয়া হবে না। একটা আফশোস আনন্দর বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে ওঠে। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস হঠাৎ কোথাও থেকে ছুটে আসে। চোখে মুখে যেন হাত বোলায়, ভাল লাগে। আলো জ্বলে ওঠছে একে একে। আদালতের ঘরটাকে ভাল লাগে। না, কোথাও কোন ধুলোর আবরণ নেই, নেই ঝুল। আলো ঝলমল করছে চারদিক। সেই বদ্ধ গুমোট ভাবটা একদম টের পান না। বাইরে সন্ধ্যা নামছে। টাউনহলের পুকুরে শহরের জলছবি, আলোকমালায় ভেসে উঠছে। কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, জীবন এখন ছোট নয়, জীবন এখন অনেক অনেক বড়। জীবনটাকে উপভোগ কর তুমি। বাইপাশের ধারে হুল্লোড় ক্লাব হয়েছে, সেখানে যাও। দেখ, এই শহরের জীবন তার গা থেকে মফঃস্বলি গন্ধ একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে।

আনন্দ উঠে পড়েন। ফিরতে হবে। তিনি না উঠলে আর্দালী চাকরবাকর বড়বাবু, কেউ বাড়ি যেতে পারবে না। ড্রাইভার ছুটি পাবে না। আর্দালী তাঁর

জিনিষপত্র গুছিয়ে নেয়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন তিনি। অনেক উঁচু আর খাড়া আদালতের এই সিঁড়ি। বৃটিশ আমলে তৈরি হয়েছিল এই বাড়ি। অনেক কষ্ট, অনেক তিতিক্ষা, অনেক অধ্যাবসায় বেয়ে উঠে এসেছেন এই সিঁড়ি বেয়ে। তাঁর একটা স্বপ্ন ছিল। নিজস্ব একটা জগৎ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, কাজের মধ্যে দিয়ে আরও ভাল হতে চেয়েছিলেন। অনেক বড় হতে চেয়েছিলেন। সুযোগ পাবার পর তিনি সেই ইচ্ছেগুলোকে পূর্ণরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। শিখতে শিখতে, ঠেকতে ঠেকতে এত দূরে এসে পৌঁছিয়েছেন। দুবাই থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর কর্মজীবনের পথ চলা। ওই দেশটা তাঁকে শিখিয়েছে জীবনযুদ্ধে কেমন করে লড়াই করতে হয়। বাইরে না গেলে বুঝতেই পারতেন না জীবনটা কীরকম। আর কিছুদিন পর তাঁর অবসর জীবন শুরু হবে। অবসর জীবন কোথায় কিভাবে কাটাবেন ? এইসব ভাবনায় মাঝে মাঝে পীড়িত হয়ে পড়েন আনন্দ। পাহাড়ের কোলে হিমালয়ে ? না সমুদ্রের ধারে কোথাও ? পুরী কিংবা গোপালপুরে ? না তাঁর প্রিয় এই শহরে ? বর্ধমান এখন বেড়েই চলেছে। এই শহর এখন কত বড় হয়েছে। পার্কিং প্লেস-শপিং মল-হাইরাইজ বিল্ডিং-মেডিকেল হাব-এডুকেশন হাব নিয়ে বর্ধমান এখন ক্রম বর্ধমান। এই শহরই ওর প্রিয় জায়গা। এখানেই অবসর জীবনে কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম তার হিসেব নিকেশ করবেন।

গাড়ি বারান্দার নিচে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়িতে বসতে যাবেন।

—স্যার। বলে কে যেন ডাকল পিছন থেকে।

ঘুরে দাঁড়ালেন আনন্দ।

অন্ধকারে কে যেন এসে প্রণাম করল তাঁকে। তারপর সেও কাউকে ডাকল। আরো একজন এগিয়ে এল। আনন্দ জানতে চাইলেন, কে তোমরা ?

আবছা মুখগুলো সামনে এগিয়ে এল। আলোতে ভাল করে দেখলেন আনন্দ, হ্যাঁ। এদের দেখেছেন বলে মনে হচ্ছে। প্রতিদিন এই ভদ্রলোক আর এই ছেলেটি আদালত কক্ষের এক কোনে সাধারণ বেঞ্চে চুপ করে বসে থাকতো। আজও ছিল। এরা মামলার কাজকর্ম দেখতো। তাঁর কোনদিন কৌতুহল জাগেনি, এরা কারা ? এমন বহু মানুষ, আইনের ছাত্র-ছাত্রী গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানী শুনতে আসে আইনজীবীদের সঙ্গে। তেমনিই ভেবেছিলেন হবে কেউ। বুঝতে পারলেন না এরা তাঁকে প্রণামই বা করছে কেন ?

আধো আলোছায়ার মধ্যে অন্ধকারে মুখ ঢাকা এক মহিলার অবয়ব এগিয়ে

আসে। এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করতে চায়। তাঁকে ভাল করে দেখবেন বলে নাকের ওপর চশমা ঠিক করেন আনন্দ।

——বীথি ?

ব্যাথা ও যন্ত্রণার মূর্তিমতী রূপ নিয়ে বীথি তার সামনে আসে। সন্ধ্যার আকাশে ক্ষণচকিতা সন্ধ্যাতারার মতো দাঁড়ায়। বুকের ব্যথাটা বোধহয় বেড়ে গেল !-বীথি তাঁকে প্রণাম করেন। তাঁর দিকে মুখ তুলে চাইল। অস্পষ্ট স্বরে বলল, ইনি আমার স্বামী অর্ক, আমার গোলাপ ফুল।

——গোলাপ ফুল ?

কতদিন জানতে চেয়েছেন আনন্দ ! জানতে পারেন নি সে কে ? আজ তাঁর সামনে, বীথির সেই গোলাপ ফুল ! এতদিন পরে !

বীথি কাঁদতে কাঁদতে বলে, আপনি অনেকদিন জানতে চেয়েছেন বলিনি। আজ বললাম। আয়, বলে কাউকে কাছে ডাকল বীথি। বলল, আমাদের একমাত্র ছেলে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পাশ করে এবার প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি হয়েছে। ইংরাজীতে অনার্স পড়ে। আশীর্বাদ করুন যাতে আপনার মতো হতে পারে।

——আমার মতো কেন ? আমি তো একটা ভাঙাচোরা মানুষ।

——আমি চাই ও আপনার মতো হোক।

——কোথায় পড়ে বললে ?

——প্রেসিডেন্সীতে ?

——বাঃ। কি নাম রেখেছ ওর ?

——শঙ্খ।

——হাই, গ্লাড টু মিট ইউ মিঃ শঙ্খ ?

হাতটা বাড়িয়ে দেন আনন্দ শঙ্খের দিকে। শঙ্খ তাঁর হাতের সঙ্গে হাত মেলায়। শঙ্খ তাঁর ছেলের মতো। ওর হাতটা আনন্দর হাতের মধ্যে খুব গরম লাগে। খুব ভাল লাগে তাঁর। মনে হয় এমন একটা হাতের ওম্ যেন তিনি অনেকদিন খোঁজ করছিলেন।

শঙ্খ বলল, আই অ্যাম 'সেন'। শঙ্খ সেন স্যার।

——ওঃ ইয়েস।